

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা
ডিপিএড

পেশাগত শিক্ষা

প্রথম খণ্ড

তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

ময়মনসিংহ

ডিসেম্বর ২০১৯

প্রথম সংস্করণ ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪	পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯
লেখক মিসেস মেহেরুননেছা গোলাম কিবরিয়া ড. হ্যাপি দাস ড. অসীম দাস এ বি এম আহসান রকিব শাহরিয়ার শফিক ড. অসীম দাস (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) শাহরিয়ার শফিক (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) ‘একীভূত শিক্ষা’ অংশ পরিমার্জন (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) শাহ্নাজ পারভীন শেখ মোঃ রায়হান উদ্দিন ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মোঃ মুজিবুর রহমান মোঃ মুরশীদ আকতার মনিরা হাসান ‘প্রাক-পাঠমিক শিক্ষা’ অংশ পরিমার্জন (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) রঙ্গলাল রায় মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মোঃ মুরশীদ আকতার আবু হেনা মাস্কুর রহমান মোঃ মাহফুজুর রহমান ইকবাল হোসেন গোলাম কিবরিয়া মোছাঃ মুস্তাকিমা খানম	লেখক অধ্যাপক ড. শারমিন হক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা মোঃ আলমগীর হোসেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ড. মোঃ সাইফুল মালেক তাপস কুমার বিশ্বাস ওয়ালিউল্লাহ মাহফুজুর রহমান জুয়েল মনিরুল ইসলাম মনিরা ইয়াসমিন
বিশেষজ্ঞ পাঠক ড. আবুল এহসান আনিসা হক ড. হ্যাপি দাস	বিশেষজ্ঞ পাঠক অধ্যাপক ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম
পরামর্শক আনিসা হক জেন ডেবুরু	পরামর্শক -
কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার ড. হ্যাপি দাস সিরাজ উল্যা (এপ্রিল ২০১১-ডিসেম্বর ২০১১)	কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার -
কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান প্রফেসর শামিম আহমেদ টিম লিডার ডিপিএড কার্যক্রম	কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান মোঃ আলমগীর হোসেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান
সম্পাদনা প্রফেসর সালমা আখতার ড. আবুল এহসান	সম্পাদনা মোঃ আলমগীর হোসেন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার মানোন্নয়নে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটি সুদীর্ঘকাল উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সটিকে পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিএড এর ৭টি বিষয়ের ১০টি তথ্যপুস্তক ও ইন্সট্রাক্টরদের জন্য ১০টি নির্দেশিকা ছাড়াও শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পিটিআই শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য ৩টি নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি ডিপিএড সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সটি চালু করা হয়। সরকার ডিপিএড কোর্সের চাহিদা মোতাবেক জনবল ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে পিটিআইসমূহে পর্যায়ক্রমে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২৯টি, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৩৬টি, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৫০টি, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬০টি এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস হতে ৬৬টি পিটিআইতে তা সম্প্রসারিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের পর ২০১৯ সালে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচলিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) থেকে ডিপিএড কোর্সটির ধ্যান ধারণাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পিটিআই এর প্রয়োজনে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০১৪ সালে পুস্তকগুলোতে মুদ্রণভ্রান্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ডিপিএড কোর্সের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিবছর পিটিআইসমূহ মনিটরিং করে। নেপ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১০টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত মনিটরিং প্রতিবেদন, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সুপারিনটেনডেন্টগণের সুপারিশের আলোকে ২০১৫ সালে কোর্স সামগ্রী এবং নির্দেশিকা বইগুলোতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা বাস্তব ও মানসম্পন্ন করে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই কোর্সটির টিম লিডার এবং গ্রুপ লিডারগণ মনিটরিং রিপোর্টের তথ্য ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত ডিপিএড সামগ্রীগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন

করেছেন। সফলভাবে পরিমার্জনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল হাসান খান, মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, টিম লিডার প্রফেসর শামিম আহমেদসহ গ্রুপ লিডার, লেখক এবং সম্পাদকবৃন্দকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে নেপ অনুযায়ী সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিপিএড কোর্সের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা (নেপ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সেপ্রেক্ষিতে আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে ১০টি ডিপিএড কোর্স সামগ্রী-তথ্যপুস্তক এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১০টি নির্দেশিকা পরিমার্জন করে। এক্ষেত্রে এনসিটিবি এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাথে ডিপিএড এর বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সংকল্পের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে ডিপিএড এর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আই.ই.আর কর্তৃক নির্বাচিত লেখকবৃন্দ, রিভিউয়ারগণ এবং ডিপিএড টিম যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আই.ই.আর এর পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার এবং ডিপিএড কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. শারমীন হক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয়, কোর্ডিনেটর ও ডিপিএড টিম এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয় ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় এই পুস্তকগুলোর কাজক্ষিত মান অর্জন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত পুস্তকগুলো পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা দিয়ে কোর্সটির কাজক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ শাহ আলম

মহাপরিচালক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

ময়মনসিংহ।

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা ২০১৯

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবেন বলে আশা করা যায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইইআর এ কার্যক্রমের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্ত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আইইআর ডিপিএড কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জন অন্যতম।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ডিপিএড মানোন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত চাহিদা নিরূপণ (Need assessment)। পরিমার্জনের প্রথম ধাপটি ছিল বর্তমানে প্রচলিত ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পর্যালোচনা। চাহিদা নিরূপণ থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ও পুস্তক মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে পর্যালোচনার বিষয়ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞ পর্যালোচকগণ নির্ধারিত সূচকসমূহের আলোকে শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

ডিপিএড-এর প্রতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম, তথ্য পুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, নেপ এর অনুযায়ী সদস্যবৃন্দ, পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এবং ডিপিই এর কর্মকর্তাগণ কাজ করেছেন। প্রতিটি বিষয়ের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, চাহিদা নিরূপণ গবেষণার ফলাফল এবং পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একটি নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ওপর অর্পিত পরিমার্জনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তিকালে বিভিন্ন স্তরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই পরিমার্জিত সংস্করণে পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খণ্ড) তথ্যপুস্তকটিতে যে পরিবর্তনগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো শিক্ষা ও শিক্ষক যোগ্যতা সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা, শিশুর বিকাশের ধারণা, শিশু বিকাশের বিভিন্ন ডোমেইন বা ক্ষেত্র, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এর বিস্তারিত ধারণা (যেমন শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, আবশ্যিকীয় শিখনক্রম), শিক্ষার্থীর ভিন্নতা, একীভূত শিক্ষার ধারণা ও নীতি, জেডার সংবেদনশীল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

‘পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯’-এ যে সকল সংযোজন-বিশোধন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করছি। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইইআর-এর প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল খান ও অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং আইইআর এর অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যারা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর বর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, ‘পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯’ ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শারমিন হক
কো-অর্ডিনেটর (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল মালেক
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	শিক্ষার ধারণা ও শিক্ষক যোগ্যতা	
১	শিক্ষার ধারণা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার উপাদান শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব শিক্ষক যোগ্যতা	
	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ	
২	শিশু কে? শিশু একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা শিশু সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস শিশুর বৈশিষ্ট্য শিশুর বিকাশে মস্তিষ্কের ভূমিকা শিশুর বিকাশের নীতি ও ধারণা বিকাশের নীতি বিকাশের ধারণা শিশুরবৃদ্ধি পরিনমন বা পরিপক্বতা (Maturity) বিকাশ ও বৃদ্ধির নিয়ামক শিশু বিকাশের স্তর (বয়ঃক্রম) গর্ভকাল (Intra-uterine embryo and fetus) নবজাতক (Infancy) প্রাক-শৈশব (Toddler or Babyhood) বাল্যকাল (Early Child Childhood) বাল্যকাল/প্রাইমারি (Late Child Childhood) বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোর (Puberty or Pre-adolescent period) তরুণ বয়স (Adolescent period) বিকাশের বিভিন্ন ডোমেইন বা ক্ষেত্রসমূহ শারীরিক বিকাশ (Physical development) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ (Social and Emotional	

	development) সামাজিক বিকাশ আবেগিক বিকাশ ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ (Language& Communicati development) ভাষার উপাদান যোগাযোগ অভিযোজন /আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ (Self-help) খেলা (Play Skill development) অভিভাবক ও শিক্ষকের করণীয় বিলম্বিত বিকাশের লক্ষণ ও করণীয় লেভ ভিগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব (Soio-cultural theory) ব্রনফেনব্রেনারের বাস্তুসংস্থান তত্ত্ব (Ecological System Theory)	
	বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	
৩	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম মেট্রিক্স প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন পরিবেশ (Learning environment) প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিখন-শেখানো কাজে শিখন সামগ্রী ও উপকরণ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম কয়েকটি বিশেষ শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড	
	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা	
৪	প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য	

	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রান্তিক যোগ্যতা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শিখনক্রম ও আবশ্যকীয় শিখনক্রম শিখনফল	
	একীভূত শিক্ষা	
৫	একীভূত শিক্ষার ধারণা - দর্শন ও যৌক্তিকতা একীভূত শিক্ষার বিকাশ একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল ঝুঁকিগ্রস্ত শিশু নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু শারীরিক, বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা ও অটিজম শিখন সামর্থ্যের ভিন্নতা- অতিঅগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শিশু (শিক্ষক ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার/অংশীজন) ভিন্নতাকে গ্রহণ করার মনোভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একীভূত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে একীভূত শিক্ষার আলোকে অভিযোজন	
৬	শিক্ষায় জেডার প্রসঙ্গ	
	জেডার ধারণা জেডার সংবেদনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেডার সংবেদনশীল শিখন-শেখানো কার্যক্রম	

শিক্ষার ধারণা ও শিক্ষক যোগ্যতা

১.১ শিক্ষার ধারণা

একটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মাধ্যমে মাতৃগর্ভ থেকে একজন শিশু পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে আগমন করে এই শিশুই একদিন পরিণত ও পূর্ণ বিকশিত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পূর্ণ বিকাশের সময়টিতে শিশু কি কেবলই শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধি অর্জন করে? এর ভিতর মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিকাশও ঘটে নিশ্চয়ই! কিন্তু কী প্রক্রিয়ায় এই বিকাশ সাধিত হয়? শিশুর এই বিকাশের মূলে আছে শিক্ষা। মূলত শিক্ষা নামক একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানবশিশু ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। এখন দেখা যাক 'শিক্ষা' বলতে মূলত আমরা কী বুঝি? শিক্ষা পৃথিবীর সকল দেশেই অতি পরিচিত একটি ধারণা। তবে শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন একটি ধারণা সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। শিক্ষা চিন্তাবিদগণের দর্শন, অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গঠনে ভিন্নতার কারণে শিক্ষার ধারণা হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। আবার সময়ের সাথে সাথে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনের ধারার সাথে শিক্ষার বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

১.১.১ শিক্ষার বুৎপত্তিগত অর্থ

'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শাস' ধাতু হতে। 'শাস' ধাতুর অর্থ হচ্ছে শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দান করা, উপদেশ দান করা ইত্যাদি। শাব্দিক অর্থে 'শাস' কথাটিতে একটি আরোপিত ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। ভাবগত বিচারে আমরা শাস বা শাসনকে নমনীয় দৃষ্টিতে (যেমন দিক-নির্দেশনা হিসেবে) দেখতে পারি। এ বিবেচনায় ব্যক্তির নিজের, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য ব্যক্তির আচরণ কেমন হবে তা শিক্ষার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ হতে। ল্যাটিন ভাষায় Education সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়- "Educare, Educere এবং Educatum"। এই শব্দগুলো সমার্থক হলেও এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান, (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৭)। Educare শব্দের অর্থ হচ্ছে to rear up বা লালন পালন করা, to bring up বা প্রতিপালন করা এবং to nourish বা পরিচর্যা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষা শিশুকে আদর যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। Educere শব্দের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে to lead out, to draw out অর্থাৎ বের করে নিয়ে আসা বা ভিতরের জিনিসকে বাইরে নিয়ে আসা। প্রশ্ন হচ্ছে কী বের করে আনবে? এখানে বের করতে হবে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বা সুপ্ত সম্ভাবনাকে। অর্থাৎ Educere শব্দটি শিক্ষার মাধ্যমে মানব শিশুর বিকাশ ও

সম্ভাবনার রূপায়ণের ওপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। Educatum শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষণ কার্য (Teaching) বা প্রশিক্ষণ (Training) সংক্রান্ত। এটি বাইরে থেকে নির্দেশনার ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির দক্ষতায় উন্নয়ন আনা।

উপরিউক্ত শব্দ তিনটির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় অর্থাৎ Educare ও Educatum শব্দ দুটির অর্থ কিছুটা সংকীর্ণ। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থাৎ Educere শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার ব্যুৎপত্তি হিসেবে Educere শব্দটিকে গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি "যা অন্তর্নিহিত গুণাবলী বা সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায় তাই শিক্ষা" (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৭)। তবে এটা লক্ষণীয় যে, শিশুর সুপ্রবৃত্তি- যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর তার বিকাশ সাধন আমাদের কাম্য। শিশুর কুপ্রবৃত্তি- যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর নয়, তার বিকাশ সাধন কখনই আমাদের কাম্য নয়।

১.১.২ সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

পূর্বে শিক্ষা অর্থে বোঝান হত শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা বা শাসন করা। অর্থাৎ শিশুর আচরণকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে শিক্ষা মনে করা হত। অনেকে শিক্ষা ও বিদ্যার্জনের সমার্থক মনে করতেন। শিশুকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে বিদ্যা দান করার যে পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তাকেই শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা হত। শিক্ষা এই অর্থে বিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু হত এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করার সাথে সাথে শেষ হত (ঢালী, ২০১৫)।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা। তাই আমরা যখন কাউকে বলি 'লোকটি অশিক্ষিত' তখন আমরা শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করি। এর ফলে যে কৃষক চাষাবাদ করেন, যে ধোপা কাপড় কাঁচেন, যে তাঁতি তাঁত বোনের, যে ড্রাইভার গাড়ি চালান তাঁর নিজ নিজ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দক্ষতার অধিকারী হলেও শুধু অক্ষর জ্ঞান না থাকার কারণে তারা অশিক্ষিত বলে গণ্য হন (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৭)। প্রকৃত অর্থে তারা তো নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করেছেন। সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- (ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্জিত জ্ঞান বা কৌশলই শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষা সংগঠিত প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক।
- (খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক।
- (গ) শিক্ষা একটি কাঠামোভিত্তিক প্রক্রিয়া।
- (ঘ) শিক্ষার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক।

শিক্ষাবিদ Mackenzie শিক্ষার ব্যাপক অর্থ সম্পর্কে বলেন- শিক্ষা হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহায়তা করে। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী শিক্ষকের কাজ হলো শিশুকে যথোপযুক্ত জীবন বিকাশে নির্দেশনা দিতে সাহায্য করা। শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থকে ভিত্তি করেই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৭)। এগুলো হচ্ছে:

- শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজন।
- শিক্ষা হল একটি মানবীয় প্রচেষ্টা।
- শিক্ষায় চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনের বিকাশ সাধন।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা মানুষকে সঙ্গতি বিধানে সহায়তা করে।
- শিক্ষা সমাজের রীতি, নীতি, মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করে; একইভাবে শিক্ষা এগুলো পরিবর্তন আনয়ন করে।
- শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার ব্যাপক ও বিশেষ অর্থের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ	শিক্ষার বিশেষ অর্থ
ক) শিশুর সকল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ হল শিক্ষা।	ক) জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা।
খ) শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিত, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধন করা হল শিক্ষা।	খ) পুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষা।
গ) শিক্ষা মানুষের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।	গ) বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ।
ঘ) জ্ঞান ও দক্ষতা আনুভূমিক ও উল্লম্ব অর্থাৎ বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়।	ঘ) জ্ঞান ও দক্ষতা উল্লম্ব ধারায় বিকশিত হয়।
ঙ) কোন ব্যক্তি নিরক্ষর হয়েও শিক্ষিত হতে পারেন।	ঙ) সাক্ষরতাই শিক্ষার মাপকাঠি। যিনি নিরক্ষর, তাকে অশিক্ষিত বলা হয়।
চ) শিক্ষা শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা এবং চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা।	চ) নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক শিক্ষা।
ছ) শিক্ষা অনানুষ্ঠানিকভাবে বেশির ভাগ অর্জিত হয়; পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ইত্যাদি এ শিক্ষার উপাদান।	ছ) শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জিত হয় বলে এটাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা চলে।
জ) শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট কোন পরিমণ্ডল নেই।	জ) শিক্ষাক্রম সুনির্দিষ্ট।

১.১.৩ শিক্ষার স্বরূপ: মনীষীদের বক্তব্য

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার যে স্বরূপ চিত্রায়িত করেছেন নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো-

১. সক্রেটিস এর মতে- “শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।”

২. প্লেটোর এর মতে- “Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment.” অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা।
৩. এরিস্টটল এর মতে- “Education is the creation of a sound mind in a sound body.” অর্থাৎ সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষা।
৪. জঁ জ্যাক রুশো এর মতে- “Education is child’s development from within.” অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতন্ত্র আত্মবিকাশ।
৫. জন ডিউই এর মতে- “Education is the process of living through continuous reconstruction of experiences.” অর্থাৎ ক্রমাগত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপনই হচ্ছে শিক্ষা।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মতে- “The best education is that which does not give us information but makes our life in harmony with all existence”. “অর্থাৎ সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা, যা আমাদের শুধু তথ্যই পরিবেশন করে না বরং সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে”।

এভাবে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মূলত শিক্ষার পরিসর অনেক বিস্তৃত। আবার কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র শিক্ষাকে কীভাবে দেখে তার ওপর নির্ভর করে তার ব্যাখ্যা কেমন হবে। ফলে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার জন্য সীমিত কয়েকজনের ধারণা বা ব্যাখ্যাকেই সর্বজনীন ভাবার অবকাশ নেই, বরং সময় ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার ধারণা পরবর্তনশীল। নিচে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করে না তবে এ বইয়ে আমরা এ সংজ্ঞাটি ব্যবহার করবো।

শিক্ষা হলো একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যেখানে সাধারণত (সকল ক্ষেত্রে নয়) শিক্ষক যুক্ত থাকেন এবং যার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা (Nola & Irzik, 2005)।

১.২ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার ধারণার ন্যায় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমাজ পরিক্রমায় বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা লাভ করেছে। কিন্তু শিক্ষার একক কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, সেটা হওয়া ও সম্ভব নয়। শিক্ষার ধারণার মধ্যেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মর্মকথা নিহিত হয়েছে। কাল, সমাজ বাস্তবতা এবং ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণ অথবা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। মানুষের জীবন ও

সমাজ চাহিদার নিরিখে শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। নতুন নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে তা আবার পরিবর্তিত হয়। শামসুল হক এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

‘সকল যুগে সকল দেশে সকল সমাজে জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ এক থাকেনি। যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিবেশ ও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে নিজ জীবনাদর্শের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে’ (হক ১৯৮৩; ২)। শিক্ষার একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করে লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

কোন একটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে দেশের জাতীয় আদর্শ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য হলো গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, পক্ষান্তরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদের প্রচার ও প্রসার। জীবন ধারণের প্রয়োজনে সমাজ গড়ার পথে মানুষ যতই এগিয়ে গেছে শিক্ষাও ততই বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। সে সাথে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেরও বিবর্তন হয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রায় দু’বছর কাজ শেষে এ কমিশন ১৯৭৪ সালের মে মাসে রিপোর্ট প্রদান করে। এ কমিশন দেশের সংবিধানের আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। কুদরাত -এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ছাড়াও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব কমিশন ও কমিটি সংবিধানের নির্দেশনা বিবেচনায় রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, দর্শন ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে। এ অংশে স্বাধীনতার পরে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বর্ণিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো।

১.২.১ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলাকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জনের আশাবাদও ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’ এ বর্ণিত শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনামবোধের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সংজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চারিত করার ব্যবস্থা করা।
৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা পদান করা।
৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিষ্ঠিত মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।
১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।
১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।
১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।
২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।
২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।
২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

১.৩ শিক্ষার উপাদান

শিক্ষা একটি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া জীবনব্যাপী। এর একটি সুসংহত সত্তা আছে যা সামগ্রিকভাবে কাজ করে। কতকগুলো উপাদানের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সাধিত হয়। উপাদানগুলো হচ্ছে- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, পরিবেশ, বিদ্যালয় এবং পরিবার ইত্যাদি (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৭)। এগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো-

১.৩.১ শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীই শিক্ষার প্রধান উপাদান। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুস্বম বিকাশের জন্য এবং সামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্যই শিক্ষা। শিশুর জীবনে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বংশগতি হল এমন জিনিস যা ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি এবং যা সে তার উত্তরাধিকারীকে কিছুটা দিয়ে যায়। শিশু বংশগতি নিয়েই তার জীবন-পরিক্রমা শুরু করে। সে জন্মাবার পর নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এসব অভিজ্ঞতা সে তার পরিবেশ হতে অর্জন করে। এগুলো সবই অর্জিত অভিজ্ঞতা। পরিবেশিক শক্তিগুলোর সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতি বিধান করবার ওপর শিশুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। পরিবেশ শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে তার জন্মগত গুণাগুণের পরিবর্তন সাধন করে। শিশু প্রথম হতেই শিক্ষার্থী। এই চির পরিবর্তনশীল ও জটিল জগতে বাঁচবার ক্ষমতা সে করে নেয় শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষা লাভ যে কোন জীবের বিশেষত্ব বা জীবমাত্রাই শেখে। আবার জীবের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি শেখে। মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা সহজাত। এর ফলে শিক্ষার্থী পুরাতন আচরণ ত্যাগ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন আচরণ আয়ত্ত্ব করতে পারে। শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপাদান। শিক্ষার্থী তার জীবন পরিক্রমের প্রতি স্তরে নতুন চিন্তা, ধারণা, কর্মপদ্ধতি অর্জন করে এবং এগুলো তাকে আরও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষা প্রক্রিয়া সর্বদাই উদ্দেশ্যমূলক এবং এটি সর্বদাই আগ্রহের পরিতৃপ্তি ঘটায়।

১.৩.২ শিক্ষক

শিক্ষা প্রক্রিয়ার আরেকটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষককে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু শেখা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী যে পরিবেশ হতে শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষক সেই পরিবেশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। শিশুর এই সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য শিক্ষার উপাদান হিসেবে শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটে। প্রথমে পিতা-মাতা ও সমাজের বয়োবৃদ্ধরাই শিক্ষকের কাজ করতেন। পরে

প্রথাগত শিক্ষা দেখা দিলে সমাজে শিক্ষক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। শিক্ষার্থী যে পরিবেশ হতে শিক্ষালাভ করে, শিক্ষার্থী সেই পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পরিবেশ নিয়ন্ত্রক বলা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কেবল জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেন না, তিনি একাধারে শিক্ষার্থীর সহায়ক বন্ধু, পরামর্শদাতা, অভিভাবক, হিতৈষী ও পথপ্রদর্শক। শিক্ষার্থীর জীবনদর্শন গঠনে তিনিই হলেন প্রধান সহায়ক। শিক্ষকই শিক্ষার্থীর মনে পাঠ্য বিষয়ে অনুরাগ বা প্রেরণা জাগান। বিদ্যালয় সমাজের নেতা হয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত করেন। ফলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সুনামগরিক হতে পারে। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা প্রক্রিয়ার শিক্ষক হচ্ছেন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করে না।

১.৩.৩ শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশ। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত শিক্ষাক্রম বলতে কয়েকটি পঠিতব্য বিষয়ের তালিকা বুঝাত। বর্তমানে শিক্ষাক্রম বলতে বিদ্যালয়ের নির্দেশাধীনে শিক্ষার্থীদের সমস্ত অভিজ্ঞতা বুঝায়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষাক্রমের উপর। শিক্ষকের ভূমিকাও অবশ্য এক্ষেত্রে কম নয়। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ এবং শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় আচরণ সাধারণত এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এতে কেবল ভাষাভিত্তিক বিষয়গুলোর স্থান থাকে না, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে যা পরে জীবনকেন্দ্রিক হতে পারে।

১.৩.৪ পরিবেশ

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ শিক্ষার উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

• ভৌগোলিক পরিবেশ

শিশুর শিক্ষার অন্যতম উপাদান হল ভৌগোলিক পরিবেশ। ভৌগোলিক পরিবেশের আওতায় আসে গাছপালা, জীবজন্তু, নদী-মাঠ, প্রান্তর ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন রকম আচরণ করে। শিশুর সংবেদন-প্রত্যক্ষকরণ ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশের বিষয়বস্তু শিশুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শিশুর স্মৃতির ওপরেও পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। সে যে জিনিস ভালোবাসে সে সব ভালোভাবে মনে রাখে। ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই শিশুতে শিশুতে আবেগের ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা যায়।

• সামাজিক পরিবেশ

ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের ভৌত কাঠামো ও সুবিধাদি এবং লোকাচার, আদর্শ, নিয়মকানুন, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে নিয়ে তার সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশের দু'টি দিক- একটি বাইরের এবং অপরটি ভেতরের। বাইরের পরিবেশ বলতে ব্যক্তির বাসগৃহ, যানবাহন এবং অন্যান্য ভৌত সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি বুঝায়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হল সামাজিক সংগঠন, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। সংক্ষেপে, যাকে আমরা সমষ্টিগত সামাজিক ঐতিহ্য বলে থাকি। সামাজিক পরিবেশের এই দিকটি ব্যক্তির নিকট খুব মূল্যবান। কারণ এই পরিবেশেই তার শিক্ষা-দীক্ষা, এই পরিবেশেই সে অভ্যস্ত। এই পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়।

১.৩.৫ পরিবার

শিক্ষার্থীর জীবনের ওপর পরিবারের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের মধ্যেই সে জন্মগ্রহণ করে, পরিবারের মধ্যে তার জীবন-পরিচর্যা শুরু ও শেষ হয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষার সূচনা পরিবারেই ঘটে থাকে। শিক্ষার প্রতি শিশুকে উদ্বুদ্ধকরণ, শিশুর শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন এবং শিশুর শিক্ষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার প্রধানতম ভূমিকা পালন করে।

১.৩.৬ বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। হাজার হাজার বছর পূর্বে পিতামাতার হাত থেকে লেখাপড়া বা শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেখানে যা কিছু মানুষ আহরণ করেছে সেগুলো বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছে। বিদ্যালয়ে কেবল শিখন শেখানো কার্যক্রমই পরিচালিত হয় না, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধন হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক, আবেগিক, সামাজিক ও মানবিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ স্থান। এজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার প্রধানতম উপাদান। শিক্ষা জীবনব্যাপী বলে শিক্ষার উপাদানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উপাদানগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই উপাদানগুলোর মধ্যে যদি অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তা হলে সুষ্ঠু শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

১.৪ শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১.৪.১ শিক্ষক শিক্ষা

শিক্ষকতা কেবল একটি পেশা নয়, এর চেয়েও বেশি কিছু। একজন সফল শিক্ষক হওয়ার জন্য কেবল বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান এবং শিখন শেখানো পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। বিষয়গত জ্ঞান ও শিখন শেখানো পদ্ধতি জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও জানা দরকার। জানা দরকার কারা শিক্ষার জন্য কাজ করছে, কিভাবে কাজ করছে, কী ধরনের কাজ করছে এবং শিক্ষা

সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও কৌশলগুলো কী। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। স্বল্প সময়ের কোনো প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার মাধ্যমে এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় না। আর সেজন্যই প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষা।

শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষা এমন হবে, যা শুধু শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার পড়াশোনার পরিধি হবে ব্যাপক। তার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আগ্রহ থাকবে, থাকবে চিন্তা ও বিবেচনাবোধ। শিক্ষার্থীদের বোঝা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষকের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হবে। যে ধরনের শিক্ষা আয়োজন শিক্ষককে সামগ্রিকভাবে এসব বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ করে তা-ই শিক্ষক শিক্ষা। শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্ব দেয়া হয় টেকসই জ্ঞান, চিন্তা ও অনুসন্ধান এবং এসবের প্রতিফলন ঘটে এমন চর্চা। এজন্য যেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয় তা নিম্নরূপ :

- শিক্ষক কে?
- শিক্ষকতা বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষার অর্থ কী?
- শিখন শেখানো বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

সাথে সাথে শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার, শিক্ষক আজীবন শিক্ষার্থী এবং চিরকাল জ্ঞানের সন্ধানী। তিনি তাঁর পেশায় ভালো করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাবেন (লতিফ, ২০০৭)।

শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ধারণা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষক শিক্ষার আয়োজন। এ কার্যক্রমে বিষয় জ্ঞান (Subject Knowledge), শিখন শেখানো পদ্ধতি জ্ঞান, শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব, দর্শন, মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, শিক্ষার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার অনুশীলন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ এটি একটি সামগ্রিক আয়োজন। শিক্ষক শিক্ষার জন্য সাধারণত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থাকে এবং এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার পেশাগত ডিগ্রি প্রদান করে। বাংলাদেশে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট/অনুষদ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান, যারা শিক্ষা বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান), ১ বছর/ ২ বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে এ ধরনের পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, যেখানে ১ বছর মেয়াদি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকটিতে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত এসব পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও ডিগ্রি প্রদান করে, যেখানে শিক্ষা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা ও দক্ষতা দেয়ার পাশাপাশি তার অনুশীলন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো এতদিন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিবেচিত হতো। তবে সম্প্রতি এর কার্যক্রমে পরিবর্তনের আনার মাধ্যমে পেশাগত শিক্ষা বা পেশাগত ডিগ্রি প্রদানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এতদিন এখানে এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো, যা প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে বর্তমানে কার্যক্রম ও এর শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন সংক্রান্ত বড় ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেড় বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এখানে কেবল প্রশিক্ষণের পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষকদের সামগ্রিক পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এই ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন ডিগ্রির সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

১.৪.২ প্রশিক্ষণ

আমরা যে যে ধরনের কাজই করি না কেন এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। আমরা দুটি উপায়ে আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করে থাকি—শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। ইতোমধ্যে আমরা শিক্ষার ধারণা পেয়েছি। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এবং জীবনে চলতে গিয়ে নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করি। কখনো দেখে, কখনো ঠেকে, আবার কখনো স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। মূলত এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের স্বল্প পরিসরে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে স্বল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করার প্রয়োজন হয়। যেমন— তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা নেই এমন শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে যদি তথ্য-প্রযুক্তি উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং তা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন শিক্ষককে স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা আয়ত্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। মূলত এ ধরনের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে এবং স্বল্প সময়ের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা সরবরাহের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা—ই প্রশিক্ষণ (লতিফ, ২০০৭)।

প্রশিক্ষণ মূলত স্বল্প সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদান করা হয়। সাধারণত যেখানে শিক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট দক্ষতা সরবরাহ করা সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আবার কখনো কখনো ঐ বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুবিধা না থাকলেও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। আবার জরুরি কোনো বিষয়ে তাৎক্ষণিক দক্ষতা সরবরাহের প্রয়োজন হলেও প্রশিক্ষণ দরকার হয়। যেমন ধরা যাক, হঠাৎ করে কোনো বিশেষ ধরনের রোগ ধরা পড়ল, যার শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে নেই। এক্ষেত্রে ডাক্তারদের জরুরি ভিত্তিতে ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। কেননা এর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে বিভাগ খোলা, বইপত্র সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ করা, শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, যা করতে গেলে জরুরি চিকিৎসা ব্যবহৃত হবে।

১.৪.৩ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সরবরাহের জন্য স্বল্পকালীন আয়োজন। এর সাথে মিল রেখে আমরা বলতে পারি, শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা বা দক্ষতা সরবরাহের জন্য স্বল্পকালীন আয়োজনই হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ। শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষক যেন আবশ্যিক শিক্ষণ দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারেন তাতে সমর্থ করে তোলা। স্বল্প সময়ে কোনো বিষয়ে দক্ষতা সরবরাহের প্রয়োজন হলে তখন প্রশিক্ষণ দরকার হয়। আবার কখনো কখনো নতুন একটা বিষয়ে শিক্ষকদের তাৎক্ষণিক দক্ষতা সরবরাহ করার প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। যেমন সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। যেমন—বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি (মালেক ও অন্যান্য, ২০০৯)।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। যেহেতু এটি স্বল্পকালীন, তাই এ বিষয়ে কাজ করে এবং দক্ষতা রয়েছে এমন যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে পেশাগত ডিগ্রি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর সার্টিফিকেট কোর্স এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে বিবেচিত হতো। এছাড়া নানা সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নেপ ও পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের অধীনে শিক্ষকদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তাদের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ওপর তাদের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলোতে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১.৫ শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্যের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষ করে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজ উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করে থাকেন। আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সুনাম শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বিদ্যমান থাকে এমনটি নয়। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মানব সৃষ্টির শৈল্পিক কারিগর। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দেশনা এবং আদর্শ, স্থান, কাল, পাত্র, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদের উর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণে ব্যাপ্ত হয়। তাই বলা হয় ব্যক্তি মানব এখানে অর্থহীন কিন্তু ব্যক্তি শিক্ষক সকলের শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্র। শিক্ষকের শিক্ষাদর্শন সার্বজনীন কল্যাণকর। একে নির্ধারিত ফ্রেমে আবদ্ধ করা যায় না। কাজেই শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্যকে শুধুমাত্র বিদ্যালয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তিনি সমাজ এবং রাষ্ট্রের পর্যায়েও বহুবিদ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করে থাকেন। তাই আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্যকে নিচের কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। যেমন-

- শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য
- সমাজ সংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য
- সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য

১.৫.১ শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য (Professional Duties and Responsibilities of Teachers)

শিক্ষকের মূল কাজ হলো তার পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাঁকে কঠিন, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মহান দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা: আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম প্রধান পেশাগত দায়িত্ব হল নিয়মিত যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্য সম্পন্ন করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ

বিকাশ ঘটানো শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বভুক্ত। এজন্য তিনি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করানোর লক্ষ্যে পাঠ পরিচালনা করবেন।

- **শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ:** শিক্ষকের আধুনিক পেশাগত দায়িত্ব কর্তব্যের মাঝে অন্যতম হল শিক্ষার্থীদের শিখন নিয়মিত মূল্যায়ন করে ফলাবর্তন প্রদান করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা/সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজের মান উন্নয়ন হবে।
- **পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অনুশীলন:** শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষকের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সময়মতো এবং নীতি মেনে পালন করবেন।
- **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন:** শিক্ষক পেশাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। একইসাথে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।
- **পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের অঙ্গীকার:** শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে সবসময় তার নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অঙ্গীকার প্রদর্শন করবেন এবং সচেষ্ট থাকবেন।

একজন শিক্ষকের উপরে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ যাতে ভালভাবে পালন করতে পারেন সে জন্য ডিপিএড শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের অর্জনের জন্য শিক্ষক মান ও শিক্ষক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মান ও শিক্ষক যোগ্যতাসমূহ এ অধ্যায়ের শেষের অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১.৫.২ সমাজ সংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duties and Responsibilities as a Social Reformer)

একজন আদর্শ শিক্ষক একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক। তিনি তাঁর শিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত করে থাকেন। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে সমাজের কর্ণধার হয়ে সমাজ সংস্কার করে। সেদিক হতে বলা যায়, আদর্শ শিক্ষকের সমাজ সংস্কারক হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন, যেমন- সমাজ থেকে নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, মানুষের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা জাগ্রতকরণ ইত্যাদি।

১.৫.৩ সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duties and Responsibilities as a Social Role model)

শিক্ষক সমাজেরই একজন প্রভাবশালী সচেতন প্রতিনিধি। সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদান, সংগঠিত মনোভাব সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান আদর্শ শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব। আদর্শ শিক্ষককে সমাজ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সামাজিকতা, জনসচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক বিভিন্ন কাজে নেতৃত্বদান, জনমত

গঠন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সামাজিক বিবাদ-মীমাংসা, অপরাধপ্রবণতা রোধে করণীয় নির্ধারণ এবং সামগ্রিক উন্নয়ন অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি ভূমিকা পালন করতে হয়।

সর্বোপরি একজন আদর্শ শিক্ষক এমন গুণের অধিকারী হবেন, যা তাকে তার দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পেশা থেকে অনন্য করে তুলবে (লতিফ, ২০০৭)। একজন আদর্শ শিক্ষক পেশাগত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন। তিনি তাঁর পেশার প্রতি সৎ, দায়বদ্ধ ও দায়িত্ব সচেতন হবেন। শিক্ষক হবেন অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী। তাঁর এই দক্ষতা ও কুশলতার ব্যবহার করে তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করবেন, তাদেরকে ভাবতে এবং খুঁটিয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। তিনি হবেন ধৈর্যশীল, বিনম্র ও ইতিবাচক জীবনবোধের অধিকারী। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে বরং ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। তাদের ভেতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেবেন। শিক্ষকের দায়িত্ব বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বলা আছে, ‘শিক্ষার্থীদের মনে সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন; কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য’।

১.৬ শিক্ষক যোগ্যতা

শিক্ষককে তার পেশাগত দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। এসকল কাজের জন্য শিক্ষকের যথাযথ পেশাগত দক্ষতা থাকা আবশ্যিক। শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার মধ্যে তাঁর পেশা ও বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান, পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন এবং এ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ থাকা অপরিহার্য। মূলত এই তিনটি বিষয়ে সমন্বয়েই শিক্ষক হিসেবে কে কতটা সফল বা যোগ্য তা বিবেচিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সচেতনভাবে শিক্ষক যোগ্যতার ব্যবহার অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আসছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় এসটিম প্রকল্প সর্বপ্রথম বাংলাদেশে শিক্ষক যোগ্যতা নিয়ে কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় এর পরিমার্জন, পুনঃচিন্তন শিক্ষক যোগ্যতাকে একটি নতুন আঙ্গিক ও অবয়ব প্রদান করেছে। শিক্ষকের চাহিদা নিরূপণ করে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং একাডেমিক তত্ত্বাবধানসহ শিক্ষক শিক্ষার মৌলিক কোর্স ডিপিএড- এ শিক্ষক যোগ্যতা ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষক যোগ্যতার তিনটি ক্ষেত্রের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো যা পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষকমান মূল্যায়ন ছকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে:

১.৬.১ পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি (Professional Knowledge)

১. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য বিষয়জ্ঞানের পরিকল্পনা;
২. প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পূর্ণ পরিধি কার্যকর ও আস্থার সঙ্গে শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষণ বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের পরিকল্পনা;
৩. জাতীয় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রমের কাঠামো, বিষয়, যোগ্যতাসমূহ এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা;
৪. কার্যকর ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিশুবিকাশ ও শিক্ষণ তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা;
৫. শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবহৃত বিধিবিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত থাকা।

১.৬.২ পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice)

১. শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে পৃথক পৃথক শিক্ষণতত্ত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠ পরিচালনার সক্ষমতা থাকা;
২. সকল শিক্ষার্থীর উচ্চ-প্রত্যাশা উপলব্ধি করতে পারা;
৩. যোগাযোগ দক্ষতা- সকল শিশু যাতে শিখনের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সে জন্য উপস্থাপন করতে পারা;
৪. যোগাযোগ দক্ষতা- বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা ও যথাযথ প্রশ্ন করার কৌশল জানা, এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাধ্যমে একটি শিখন পরিবেশ (scaffold of learning) তৈরির সক্ষমতা থাকা;
৫. নিরাপদ, যত্নশীল, সৃজনশীল, উদ্ভুদ্ধকরণ ও চ্যালেঞ্জিং এবং একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা থাকা;
৬. পাঠসংশ্লিষ্ট ও কার্যকর এবং ICT-সহ শিক্ষোপকরণ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবহারের দক্ষতা থাকা;
৭. শিক্ষার্থীদের শিখন এবং একীভূত শিক্ষা সম্প্রসারণে সমর্থন ও সহায়তাদানে পরিকল্পনা জ্ঞান ও মূল্যায়ন পরিচালনা দক্ষতা থাকা।

১.৬.৩ পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন (Professional Values / (Relationship)

১. শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সংগে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দায়বদ্ধ থাকা;
২. শিক্ষক অনুচিন্তন অনুশীলন ও ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দায়বদ্ধ থাকা;

৩. শিক্ষক সমাজের সকল সদস্যদের সঙ্গে একত্রে কার্যকরভাবে কাজ করতে দায়বদ্ধ ও সক্ষম হওয়া;
৪. সহকর্মীদের সাথে পেশাগত সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকা।

এখানে শিক্ষক যোগ্যতার কোন ক্ষেত্রে কী বিষয় অর্ন্তভুক্ত হবে তার একটি সংক্ষিপ্তসার দেয়া হলো। কিন্তু এখানে প্রদত্ত শিক্ষক যোগ্যতার সাধারণ অবয়ব ও কলেবর এতো ব্যাপক যে, কোন আচরণ সম্পন্ন করলে যোগ্যতায় উন্নীত হওয়া যায় তার একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (evidence) শিক্ষকের কাছে দৃশ্যমান না করলে তা পরিমাপযোগ্য পর্যায়ে নির্ণীত হয় না। এ ক্ষেত্রে নিচের উদাহরণটি বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য-

‘রানি ভালো গাইতে পারে’ এ তথ্যটি রানির একটি যোগ্যতা। প্রশ্ন হলো রানির এ যোগ্যতার প্রমাণ কী? সে প্রেক্ষিতে রানিকে প্রশ্ন করা হলে রানি উত্তর দিলেন যে, তিনি যখন গান পরিবেশন করেন তখন শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে তার গান শোনেন, গান শেষে সকলে হাতে তালি দেন এবং আরও একটা গান পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করেন। দেখা গেল এখানে ভালো গান গাইতে পারার প্রমাণ হিসেবে তিনটি প্রমাণ এখানে উপস্থিত।

১. গান পরিবেশন করার সময় শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে গান শোনেন
২. গান শেষে সকলে হাতে তালি দেন / প্রশংসা করেন
৩. আরও একটা গান পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করেন

উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি তথ্যই এক একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (evidence)। বলা বাহুল্য এগুলোর সবটাই দেখা যায় বা শোনা যায় বা রেকর্ড করা যায় এবং এগুলোই হলো পারদর্শিতার সূচক। একে কাঠামোবদ্ধ করলে নিম্নরূপ আকার দেয়া যায়:

যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
রানি ভালো গাইতে পারেন	১. গান পরিবেশন করার সময় শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে গান শোনেন ২. গান শেষে সকলে হাতে তালি দেন/ প্রশংসা করেন ৩. আরও একটা গান পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করেন

কাজেই পারদর্শিতার সূচক বা প্রমাণ যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জুন-২০১৪)।

১.৭ শিক্ষকমান

শিক্ষকতা পেশায় ভালো করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা দরকার। এজন্য শিক্ষক নিজ থেকে যেমন সচেষ্ট থাকবেন, তেমনি শিক্ষকের সেই চেষ্টা কতটুকু ফলপ্রসূ তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষকমান মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষকমান হলো শিক্ষকদের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শ (Standard) এর সমন্বয়, যার মাধ্যমে

শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকদের পারদর্শিতার অবস্থা যাচাই করা হয়। সাধারণত শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ বা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে এক ধরনের মূল্যায়নের কাজ করে থাকে। কখনো কখনো বিদ্যালয় শিক্ষকদের পারদর্শিতা মূল্যায়ন করে। মূলত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষকের অর্জন ব্যবধান ও দুর্বলতা ধরা পড়ে এবং শিক্ষক তা অর্জনে সচেষ্ট হন।

১.৭.১ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষকমান

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকমান নির্ধারণ ও তা প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়। শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই শিক্ষকমান ব্যবহার করে শিক্ষকদের পেশাগত পারদর্শিতা যাচাই করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য একটি অন্যতম উদ্যোগ হলো ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম। ডিপিএড কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকতা পেশায় যোগদানকারী শিক্ষার্থীরা যাতে পেশা সম্পর্কে সচেতন হয়ে দক্ষ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে, সেভাবে তাদের প্রস্তুত করা। ডিপিএড কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে বিষয়গত জ্ঞান, পেশাগত জ্ঞান, বিভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতার চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর পেশায় পারদর্শী শিক্ষক হয়ে উঠবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়। এই কোর্সের নতুনত্ব হচ্ছে প্রায়োগিক শিখনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা। কিন্তু শিক্ষক এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কতটুকু পারদর্শিতা অর্জন করছেন তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক মান মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষক মান মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকতার জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন হয় তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যাচাই করা হয়।

ডিপিএড শিক্ষাক্রমে ২৩টি শিক্ষকমান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই শিক্ষকমানগুলো প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন। প্রত্যেকটি প্রধান ক্ষেত্রকে কয়েকটি শিখন ক্ষেত্রে ভাগ করে তার আলোকে শিক্ষকমানগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। [বিস্তারিত সংযুক্তি-১ এ দেখুন]

ডিপিএড প্রোগ্রামে ১ম-৪র্থ টার্মের সময়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমান (Teacher Standard) মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকমান মূল্যায়ন করা হয় প্রমাণপত্রের মাধ্যমে। সকল শিক্ষার্থীকে ২৩টি শিক্ষকমানেই ৮০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথম থেকে তৃতীয় টার্ম পর্যন্ত শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন যাচাই করার জন্য অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। এই প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে শিক্ষার্থীকে যোগ্যতাভিত্তিক গ্রেড প্রদান করতে হবে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখন

২.১ শিশু

শিশু হলো অফুরন্ত সম্ভাবনাময় মানবসত্তা। শিশু শব্দটি গুলেই প্রথমত তার অবয়বগত বা শারীরিক যেমন-শরীর, চেহারা, আকার-আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়ত, তার বিকাশ বা গুণগত দিক অর্থাৎ মন, দক্ষতা ও আচরণিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের বিবেচনায় আসে। সব যুগে সব সমাজেই শিশু মহামূল্যবান ও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল, আছে এবং থাকবে। প্রতিটি সমাজই তার ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি, কৃষ্টি, সভ্যতা পরিপূর্ণভাবে শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেকই (৪৭%) শিশু। ডেমোগ্রাফিকস অব বাংলাদেশ এর তথ্য অনুযায়ী দেশের জনগোষ্ঠির ৩৩.৪% হলো ০-১৪ বছরের শিশু। এই বিরাট শিশু জনগোষ্ঠিকে সার্বিকভাবে বিকশিত করার জন্য বিশ শতক পরবর্তীকালে আইন ও বিভিন্ন বিধিবিধান দিয়ে অধিকতর সুরক্ষিত ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে এরাই দেশ পরিচালনায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হবে। আর তাই পৃথিবীর সব দেশই শিশুর সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে।

বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ শিশু নীতি (২০১১) অনুযায়ী ‘শিশু বলতে আঠারো বছরের নিচের বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে’ (a child means every human being below the age of eighteen years))। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু বিষয়ক এ সংজ্ঞাটিই অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার নীতিমালায় (UNCRC, 1989) শিশুদের বয়স, অধিকার ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সনদের আলোকে (সনদ নং-১) ‘১৮ বছরের নিচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে, যদি না শিশুর জন্য প্রয়োজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক বিবেচনা করা হয়।’

এখানে উল্লেখ্য যে, ৩-৫ বছর পর্যন্ত সময়কে দ্রুত বিকাশ কাল বলা হয়। তবে ধীর গতিতে এই বিকাশ ১৮ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে বিধায় মনোবিজ্ঞানীগণ এবং বিকাশ বিশারদগণও জন্ম থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত সময়কে শিশু বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

২.১.১ শিশু একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষের মধ্যে শিশু সম্পর্কে ধারণা বা বিশ্বাসের অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একসময় সমাজে শিশুদের নিয়ে বেশ নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত ছিল। তখন মনে করা হতো, শিশুরা অবুঝ, অশান্ত ও ছোট, তারা কোনো কিছু বোঝে না। শিশুরা অক্ষম এবং তারা কোনো কাজ বা দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তারা চিন্তায়, মেধা ও মননে অপরিপূর্ণ। একসময় মনে করা হতো ‘শিশু হলো ফাঁকা কলসি (empty vessel) সদৃশ’। অর্থাৎ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা শূন্য। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে তাদের ধারণা বাড়তে থাকে ও ক্রমে পরিপক্বতা পায়। আবার কেউ কেউ মনে করতেন শিশুরা খালি স্লেট (blank slate), ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলা হয় ‘tabula rasa’ যার অর্থ, শিশুরা কিভাবে বেড়ে উঠবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। আবার, ষোড়শ শতাব্দীতে শিশুদের সম্পর্কে এমন ধারণা চালু ছিলো যে— শিশুরা খুবই দুষ্কৃত্তির এবং ‘শিশুরা জন্ম নেয়, খারাপ ও শয়তানের আচরণ’ নিয়ে। শিশুদের কঠিন শাসন ও নিয়মের মধ্যে রেখে তাদের আদব-কায়দা ও শান্ত স্বভাব গঠন করতে হয়। বর্তমান সমাজে শিশুদের ‘একটি অফুরন্ত সম্ভাবনাময় পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা’ হিসেবে দেখা হয়। যুগের পরিবর্তন ও শিক্ষা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে শিশুদের সম্পর্কে ধারণার ইতিবাচক পরিবর্তন হতে দেখা যায়। মানুষ এখন শিশুদের নিয়ে অনেক বেশি ইতিবাচক ও পূর্ণাঙ্গভাবে চিন্তা করছে, যা শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ধারার গুরু দিকে (আঠারো শতকে) একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণার প্রবর্তন করেন জঁ্যা জ্যাক রুশো। তাঁর মতে, শিশুরা হচ্ছে নিষ্পাপ মানব সম্প্রদায় বা noble savage। শিশুরা তাদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে যা সময়ের সাথে সাথে প্রকাশ পেতে থাকে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত হচ্ছে—বড়দের উচিত শিশুদের আত্মহের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

শিশুরা বড়দের ছোট সংস্করণ নয়, বরং তারা একটি স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ সত্তা। শিশুরা অবুঝ ও অশান্ত নয়, বরং তারা অনেক বেশি ‘সম্ভাবনাময়, সৃজনশীল ও সক্রিয়’। আরো বলা হয়, শিশুদের মধ্যে রয়েছে ‘অফুরন্ত সম্ভাবনা, যা উপযুক্ত পরিবেশ, সহায়তা ও সেবা কর্মসূচি পেলে সহজে পূর্ণতা পেয়ে থাকে’। শিশুর একটি নিজস্ব চিন্তাচেতনা ও নিজস্ব জগৎ রয়েছে যা তাকে তার মতো করে ভাবতে ও কাজ করতে উৎসাহিত করে। আজকের বিশ্বে বিভিন্ন সমাজে পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে শিশুরা অনেক বেশি সুরক্ষা ও অধিকার ভোগের সুবিধা পাচ্ছে এবং গুরুত্ব পাচ্ছে।

২.১.২ শিশু সম্পর্কে আমাদের ধারণা

শিশু সম্পর্কে শিক্ষক ও সমাজের মানুষের ধারণার বিষয়টি আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে বিভিন্ন কারণে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। আমরা শিশুকে একজন দক্ষ বা শক্তিশালী মানুষ হিসেবে না দেখে বরং একজন নিষ্ক্রিয় এবং অবুঝ মানুষ হিসাবে দেখি, যার দক্ষতার অভাব আছে, অন্যের নির্দেশনায় অথবা অন্যের দেখিয়ে দেয়া পথে পরিচালিত হয় কিংবা গতানুগতিকভাবে বেড়ে ওঠে। শিশুদের সম্পর্কে সমাজের মানুষের ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঐ সমাজের শিক্ষায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। শিশু বিষয়ক ধারণাটি শিশুদের চাহিদা, ইচ্ছা, যোগ্যতা এবং সর্বোপরি তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের মানুষ কী ধারণা ও বিশ্বাস ধারণ করছে তার সাথে সম্পৃক্ত। বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রভাব (cultural beliefs) এবং সমাজ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা এ দুইয়ের সংযোজনেই আমাদের মনে শিশু সম্পর্কে ধারণা (image) ও বিশ্বাস (beliefs) তৈরি হয়। অন্য কথায়, আমরা শিশুদের যেভাবে দেখি এবং তাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করি তারই প্রতিফলন হচ্ছে আমাদের শিশু সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাস। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে আমরা যে সমস্ত কাজ করি তার প্রভাব শিশুদের উপর প্রতিফলিত হয়।

শিক্ষকের মনে শিশুর সম্পর্কে যে ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত ও কাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শিশুদের শারীরিক (শরীর, চেহারা, আকার-আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য) ও মানসিক বা বিকাশগত (মন, দক্ষতা ও আচরণিক বৈশিষ্ট্য) দিক অর্থাৎ সার্বিক দিক থেকে তাদের সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। একজন শিক্ষক, যিনি শিশুদের সম্পর্কে ‘পরিপূর্ণ ও ইতিবাচক ধারণা’ রাখেন, আর অন্যদিকে যে শিক্ষক শিশুদের সম্পর্কে ‘অসম্পূর্ণ ও নেতিবাচক ধারণা’ রাখেন, এ দুজনের মধ্যে শিশুদের সাথে কাজ ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, আমাদের মনে যদি কোনো শিশু সম্পর্কে এমন ধারণা ও বিশ্বাস থাকে যে, “শিশুরা অবুঝ, কোনো কিছু বোঝেনা (তাদের কোনো যোগ্যতা নেই বা তারা কাজ করতে অক্ষম), সে কোনো কাজই সঠিকভাবে করতে পারবে না।” তাহলে, আমরা ঐ শিশুটির জন্য একটি কাজ নির্ধারণ করতে গিয়ে তাকে বার বার ছোট করে দেখব ও অবমূল্যায়ন করব বা বার বার তাকে সাহায্য করে তার সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ কমিয়ে দেব। তাকে বার বার চেষ্টা করতে দেয়া হবে না, এমনকি তার জন্য হয়তো এমন উপকরণ বাছাই করব বা এমন পরিবেশ তৈরি করব যা তাদের অনুসন্ধান এবং খেলার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ নেবার সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে। আবার, কোনো শিশুকে ভালোভাবে না জেনে, তার সক্ষমতা না বুঝে বা আংশিক জেনে তাকে বার বার যদি অতি মূল্যায়ন করা হয় বা সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহলে তারা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে না অথবা অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবে না। তাই, শিশু সম্পর্কে আমাদের সবার একটি পরিপূর্ণ, ইতিবাচক ও আধুনিক ধারণা থাকা আবশ্যিক।

২.১.৩ শিশুর বৈশিষ্ট্য

শিশু মাত্রই নির্মল আনন্দ ও সুন্দরের প্রতীক। প্রতিটি শিশু অনন্য। বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য, পছন্দ, চিন্তা, আচরণ ও চাহিদার ভিন্নতা ইত্যাদির কারণেই তারা স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্যতার মূলে রয়েছে শিশুর বংশ ও পরিবেশের

প্রভাব। যেহেতু প্রতিটি মানুষই শিশু থেকে বিকাশের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। প্রতিটি পরিবারেই শিশুর বিচরণ দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে সকলের শিশুদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক এবং প্রত্যেকেরই শিশুদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। বিকাশের এই পরিক্রমার প্রতিটি পর্যায়েই “শিশু”-র রয়েছে কতকগুলি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, বিকাশমূলক চাহিদা, অধিকার ও প্রয়োজন। ধরণ ও প্রকৃতিগত দিক থেকে এগুলো বড়দের থেকে ভিন্ন। শিশুরা অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ব অর্থাৎ কাঁদা মাটির মত। তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে তারা কোন পরিবেশে লালিত পালিত হবে তার ওপর। শিশুর বংশগতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা মানুষের সীমিত। আমাদের হাতে পরিবেশকে শিশুর বিকাশ উপযোগী করে দেবার সুযোগ রয়েছে প্রচুর-শুধু প্রয়োজন সদিচ্ছার। শিশুর বৈশিষ্ট্য ও চাহিদাগুলো কী? শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ, সঠিক মিথস্ক্রিয়া, নিয়মিত যোগাযোগ ও বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও সামগ্রিক বিকাশের ধারা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে শিশু সম্পর্কে এসব ধারণা আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম নির্ধারণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

- সব শিশু এক রকম নয়। প্রতিটি শিশুই অপর শিশু থেকে আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তা রয়েছে। কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ পড়তে পছন্দ করে, কেউ খেলতে, কেউ বা বেড়াতে, কেউ শান্ত স্বভাবের আবার কেউ চঞ্চল প্রকৃতির। কোন শিশু বেড়ে উঠার জন্য সহায়ক পরিবেশ পায়, কোন শিশু পায়না। একেক জন একেক সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠে। একটি শিশুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখেই তার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হবে।
- শিশুদের পছন্দ, চাহিদা ও শিখনের ধরন আলাদা আলাদা হয়। শিশুর পছন্দ গড়ে উঠে বিশেষত: তার বেড়ে উঠার পরিবেশের উপর। কেউ খেলনা দিয়ে খেলতে পছন্দ করে তো অন্যজনের বই পড়তে পছন্দ, কারো শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখা ভাল হয়, আবার কেউ অনুকরণ করে শেখে। শিশুর শেখার কৌশল চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি।
- শিশুরা নিজেদের মতো করে পৃথিবী দেখে, বড়দের মতো করে নয়। বড়দের পৃথিবীটা শিশুর কাছে অপরিচিত ও অজ্ঞাত, যেহেতু শিশুদের অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের। তারা পৃথিবীকে আবাস্তবভাবে (ফ্যান্টাসী/দিবা স্বপ্ন) দেখে। কঠিন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ভাবতে পারে না। তাই তাদের ধীরে ধীরে বাস্তবতার নিরিখে শিখতে এবং ভাবতে সাহায্য করতে হবে।
- স্বভাবসুলভ ভাবেই শিশুদের মনোযোগের পরিসর অত্যন্ত সীমিত। প্রাণচঞ্চল শিশুর মনোযোগের ক্ষুদ্র পরিসরকে গুণগতভাবে কাজে লাগাতে হবে। (অর্থাৎ খুব যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে- কখন শিশু শেখে, কিভাবে শিখতে পছন্দ করে-তার বায়োলজিক্যাল ক্লক- কে প্রাধান্য দিয়ে)। পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠ উপস্থাপন, উপকরণ ইত্যাদি আকর্ষণীয় ও শিশু বান্ধব হতে হবে।

- শিশুরা খেলতে পছন্দ করে। সাধারণত: শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলা শিশুর শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। খেলার মাধ্যমে শিশুর মনোযোগ বাড়ে, শিশুর প্রত্যক্ষণ সুস্পষ্ট হয়। একেকটি শিশু একেক রকম খেলা এবং খেলনা দিয়ে খেলতে পছন্দ করে। কেউ গাড়ী, কেউ বল, কেউ পুতুল দিয়ে, একইভাবে কাজও- কেউ দলীয় নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করে, কেউ বা নীরবে গুছিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে শিশুর পছন্দকে সঠিক ভাবে বুঝে, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে শেখানোর একটি প্রধান পদ্ধতি বা কৌশল হিসাবে খেলাকে বেছে নেয়া।
- সাধারণত শিশুরা চঞ্চল ও সৃজনশীল হয়। প্রকৃতিগত ভাবে শিশুরা চঞ্চল বা অস্থির প্রকৃতির। যে কোন কাজে খুব অল্প সময়ই মনোনিবেশ করতে পারে। সে তার নিজের মত করে কিছু একটা ঐঁকে ফেলে, চট করে কিছু লেখে, ছুটে ছুটেই কোন কাজ করে ফেলে। শিক্ষকের কাজ হলো শিশুর চঞ্চলতাকে সুকৌশলে সৃজনশীলতা ও শেখার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে বিষয়টিকে কাঠামোগত রূপ দেয়া।
- শিশুরা সাধারণত আনন্দপ্রিয় ও কৌতূহলী হয়। শিশুরা আনন্দের মাঝে থাকতে ভালোবাসে, আনন্দের মাঝে কাজ করতে সবাই ভালোবাসে। এতে কাজের গুণগতমান বাড়ে। তারা সারাক্ষণ এটা সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে বা কোন কিছুতে আত্মনিমগ্ন থাকে, সারাক্ষণ প্রশ্ন করে জানতে চায়, শিশুর নিজের চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার (Explore) করতে চায়। শিশুর শেখার জন্য শেখার পরিবেশকে আনন্দপূর্ণ এবং অনেক বেশি সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।
- শিশুরা সাধারণত আত্মকেন্দ্রিক হয়। বংশগত কারণে কোন শিশু আত্মকেন্দ্রিক বা অর্ন্তমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে। অনেক বেশী নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অর্থাৎ সারাক্ষণনধমকের উপর থাকা বা মত প্রকাশের সুযোগ না দেয়া এমন পরিবেশে বড় হলেও শিশু আত্মকেন্দ্রিক বা অর্ন্তমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুকে প্রকাশিত হবার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষককে শিশুর উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- ভালোবাসা পাওয়া ও বড়দের কাছে গ্রহণীয় হওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। ভালোবাসা পাওয়া একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী মাধুর্যমণ্ডিত, অন্যের প্রতি মমত্ববোধ, শ্রদ্ধাশীল, আশাপূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে ভালোবাসা না পাওয়া একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব হবে হতাশাগ্রস্ত, অন্যের প্রতি বিরাগ, অবিশ্বাস, কলহপূর্ণ। শিশুদের প্রত্যাশা বড়দের কাছে গ্রহণীয় হওয়া অর্থাৎ নিজের কাজের মূল্যায়ন পাওয়া। বড়দের কাছে গ্রহণীয় না হলে নিজেকে বঞ্চিত মনে হবে। ফলে শিশু কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে না। নিজেকে সকল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরী হবে। শিশুকে ভালোবাসতে হবে, এবং অন্যকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে।
- জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই শিশু তার চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার করতে শুরু করে। নানা রকম কাজ করার মাধ্যমে অনুসন্ধান করে, ও নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করে। পিতা-মাতা, শিক্ষকের কাজ হলো ধীরে ধীরে তার অনুসন্ধানের পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করা ও বিস্তৃত করে দেয়া। যে শিশু যতবেশি অনুসন্ধানী

হবে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা তার জন্য অনেক সহজ হবে। তাই শিশুর বেড়ে ওঠার, শিখনের পরিবেশকে শিশুদের উপযোগীভাবে সমস্যা সম্বলিত করা, যাতে শিশু সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার সুযোগ পায়।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক, কর্মী এবং পিতা মাতা ও পরিচালক। তাই যদি আমরা বিচক্ষণতার সাথে শিশু ও পরিবারের সঠিক পরিচর্যা করতে পারি তবেই তারা পরবর্তীতে উৎপাদনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে তা ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হবে। উৎপাদনশীল জীবনের জন্য তাদের একটি শক্ত ভিত তৈরি করে দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এটাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। যদি আমরা তা না করতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ সফলতা ও নিরাপত্তা হুমকির সন্মুখীন হয়ে পড়বে। শিশু যে ধর্ম বা গোত্রেই জন্মাক না কেন পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব হলো শিশুর সঠিক এবং সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা, সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে তাকে জীবন উপযোগী করে গড়ে তোলা।

২.২ শিশুবর্ধন

ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র বিকাশ সার্বজনীন ধারা অনুসরণ করে। মাতৃগর্ভে জন্ম অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তার রূপ পেতে যে সকল পরিবর্তনগুলো দেখা যায় তা নিম্নরূপ:

১. আকারের পরিবর্তন (Change in size) ওজন, উচ্চতা ও দেহের আয়তন বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। একই সাথে আভ্যন্তরীণ যন্ত্র-হাট, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রেরও পরিবর্তন হয়।
২. অনুপাতের পরিবর্তন (Change in proportion) অতি শৈশবে শিশুর দেহের তুলনায় মাথা ও কপাল বড় এবং ঘাড় ছোট থাকে। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মাথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ বৃদ্ধি পেতে থাকে।
৩. পুরনো বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটানো (Disappearance of old features) সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex) চলে যায়, শিশুর চুলের প্রকৃতি, দুধের দাঁত ও অন্যান্য শিশুসুলভ আচরণের বিলুপ্তি ঘটে।
৪. নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন (Acquisition of new features) : বাল্যকালে নতুন দাঁত ওঠা, কৈশোরে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

একটি শিশু মাতৃগর্ভে জন্ম থেকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে একটি মানবসত্তার রূপ নেয়। স্বাভাবিক নিয়মে চল্লিশ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর এই মানবসত্তা পৃথিবীতে আসে। এরপর শিশুটি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে জীবনের কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে যেমন শিশুর শারীরিক পরিবর্তন হতে থাকে তেমনি শিশু নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আচরণিক দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। এই পরিবর্তনসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা: আকার-আকৃতিগত পরিবর্তন বা বৃদ্ধি (growth) এবং আচরণগত পরিবর্তন বা বিকাশ (development)। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর বয়স অনুসারে বৃদ্ধি ও বিকাশ সুষ্ঠুভাবে

ঘটতে সহায়তা করা, যাতে সে একজন সুনামগরিক হিসেবে সমাজে স্থান করে নিতে পারে। এই কাজটি করার দায়িত্ব শিক্ষক, পিতামাতা ও অভিভাবকদের। শিক্ষককে তাঁর এই গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্য অবশ্যই শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের ধারা ও উপাদান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

আমরা অনেক সময়ই বলি, “বাহ! তোমার ছেলেটি তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে।” এক্ষেত্রে আমরা ছেলেটির উচ্চতা যে বৃদ্ধি পেয়েছে, এ কথাই বোঝাই। শিশুর উচ্চতার সাথে সাথে ওজন বৃদ্ধি হয় এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও বৃদ্ধি ঘটে। এটি হলো শিশুর দৈহিক পরিবর্তন (growth) যা মূলত শিশুর পরিমাণগত পরিবর্তনকে বোঝায়। সহজ ভাষায় বৃদ্ধি বলতে শুধুমাত্র শিশুর আকার-আয়তনের অর্থাৎ ওজন ও উচ্চতায় পরিবর্তন বা বড় হওয়াকে বোঝায় যা সহজে দেখা যায়। শিশুর বৃদ্ধি যেহেতু দৈহিক, কাজেই তা সহজে পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া মানুষের শারীরিক বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। একজন মানুষের উচ্চতা বয়সের অনুপাতে বৃদ্ধি হতে থাকে, কিন্তু এক পর্যায়ে তার উচ্চতা একটি শেষ সীমায় পৌঁছে। তারপর আর বাড়ে না। সুতরাং বৃদ্ধির একটি সমাপ্তি রয়েছে। জন্ম পরবর্তীকালে যে সব ক্ষেত্রে দৈহিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

উচ্চতা : জন্মের সময় আমাদের দেশে সাধারণত একটি শিশুর উচ্চতা ১৭ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। এরপরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম ৭-৮ বছরে শিশুর উচ্চতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে এর গতি অনেক ধীর হয়ে যায়।

ওজন : জন্মের সময় শিশুর ওজন সাধারণত ৬-৭ পাউন্ড বা তার কম-বেশি থাকে এবং শিশু জন্মের পর প্রথম বছর ওজন অতি দ্রুত বাড়ে। ছয় মাসে শিশুর ওজন দ্বিগুণ হয় এবং এক বছরে তিন গুণ হয়।

আকার : বয়সের সাথে সাথে যেহেতু শিশুর ওজন, উচ্চতায় পরিবর্তন আসে, কাজেই তার সার্বিক আকারেও পরিবর্তন আসে, যা আমরা সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করি এবং শিশুর বৃদ্ধি বুঝতে পারি।



চিত্র: শিশু বিকাশের ক্রমধারা

২.২.১ বিকাশের ধারণা

বিকাশ হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক, অব্যাহত ও সমষ্টিগত প্রক্রিয়া। জন্মগত ভাবেই মানব শরীর নতুন নতুন উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রতিনিয়ত উদ্দীপনার ফলে মস্তিষ্ক ও শরীর ক্রমাগত অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। দৃষ্টিগ্রাহ্য শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি শিশুর অভ্যন্তরীণ চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের প্রকাশ ঘটে তার আচার আচরণে। এরূপ মানসিক বা আচরণিক গুণাবলীর পরিবর্তনকে শিশুর বিকাশ (Development) বলে।

বুদ্ধিদীপ্ত এবং মননশীল জাতিগঠনের জন্য দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন অতি জরুরী। মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। দেশের শিশু গোষ্ঠীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব। বিকাশ যেহেতু দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় তাই সহজে পরিমাপ করা যায় না। তবে বিভিন্ন চেকলিস্ট এবং অভীক্ষা ব্যবহার করে বিকাশ পরিমাপ করা সম্ভব। বিকাশের সাধারণ নীতি :

১. বিকাশ ক্রমধারা এবং পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয় এবং বিকাশের মধ্যে সহসম্পর্ক রয়েছে: যদিও কোন দুটি শিশুই একরকম নয়, তথাপি সকল শিশুই একটি সাধারণ ক্রমধারা অনুসরণ করে;
২. বিকাশের ধারায় সাদৃশ্য রয়েছে: প্রথমে ঘাড় শক্ত হয়, হামাগুড়ি দেয়, বসে, দাঁড়ায় এবং এরপর হাটে;
৩. বিকাশের ধারা ক্রমসংযোজনশীল বা বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে বিকাশ সম্পন্ন হয়;
৪. বিকাশ প্রক্রিয়া খুবই জটিল : শরীরের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি বিভিন্ন হারে হয়। মাতৃগর্ভে মাথা দ্রুত বাড়ে। জন্মের পর ধড়, হাত, পা দ্রুত বাড়ে। শৈশবকালের শেষে শারীরিক বৃদ্ধি মন্থর হয় এবং কৈশোরোত্তরকালে তা আবার দ্রুত হয়। ক্ষুদ্রে শিশুদের মধ্যে কল্পনা প্রবণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা যায়। অন্যদিকে ৯-১০ বছরের কিশোরদের মধ্যে বাস্তবমুখিতা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তার উন্মেষ ঘটে;
৫. বিকাশ দুটি বিশেষ ধারায় সংগঠিত হয়:
 - ১.১ সেফালোকডাল: ভ্রূন অবস্থায়, জন্ম পরবর্তী সময়ে বিকাশের গতি ক্রমশ: মাথা হতে পায়ের দিকে অগ্রসর হয়;
 - ২.১ প্রক্সিমোডিস্টাল: শিশু প্রথমে চোখ, মাথা, ঘাড় এবং পরে বাহু, কনুই অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গের কাজ কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে এই নিয়মে সংগঠিত হয়;
৬. বিকাশ সাধারণ থেকে বিশেষ ভাবে ঘটে- প্রথমে পুরো শরীর এগিয়ে দেয় ক্রমে হাত বা পা বাড়ায়। প্রথমে সবগুলো আঙুল মুঠো করে ধরে, ধীরে ধীরে ৩, ২ বা ১টি আঙুলের ব্যবহার করতে শেখে;
৭. বিকাশের ধারা প্রথমে বিচ্ছিন্ন ও ক্রমে সমন্বিত হয়: একটি একক ডিম্ব কোষের বিভক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের অধিকারী মানব শিশুর রূপ ধারণ করে। একই ভাবে মানসিক বিকাশ-বুদ্ধির সাথে আগ্রহ, মনোযোগ, আবেগ, ইচ্ছা সবই স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এগুলো পরবর্তীতে একটি অন্যটি দ্বারা প্রভাবিত হয়;
৮. প্রতিটি শিশু অনন্য বা স্বতন্ত্র। ভিন্ন বংশগতি ও ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে এই স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়;
৯. পরিপক্বতা ও শিখন বিকাশকে প্রভাবিত করে;

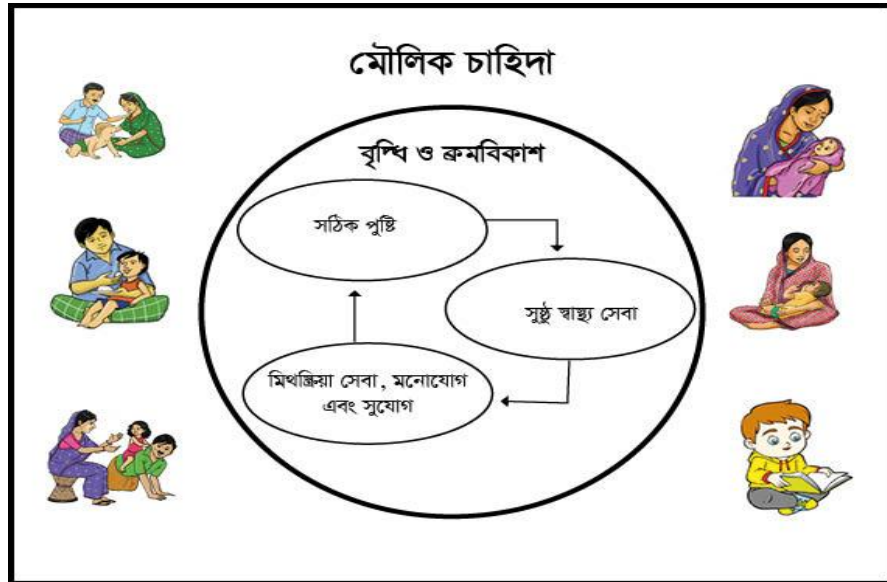
১০.বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সংকটকাল বা বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, শিশুর জন্মের পর ২৮ দিন, প্রথম ২ বৎসর, বয়ঃসন্ধিকাল; এছাড়াও প্রতিটি পর্যায়ই সঠিকভাবে বিকাশ না হলেই সংকট দেখা দিতে পারে।

বিকাশের নীতিগুলো পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলের জানা থাকলে বিকাশের কোথাও অনিয়ম হলে সেটি সুনির্দিষ্ট করে যত দ্রুত সম্ভব চিহ্নিত করে বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রারম্ভিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু, তার পিতামাতা, অভিভাবক, সমাজ সবাই উপকৃত হতে পারে। শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে শিশুর সাথে সম্পর্কিত সকলের শিশু সম্পর্কে সুগভীর ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

২.২.২ বিকাশ ও বৃদ্ধির নিয়ামক:

১. বংশগতি : জন্মের সময় পিতামাতা এবং পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ে আসা বৈশিষ্ট্যসমূহকে বংশগতি বলে। বংশগতির বাহক জীন নামের অসংখ্য ক্ষুদ্র দানা যা ক্রোমোজমের উপাদান। জীন শিশুর দৈহিক, মানসিক এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে যা পরবর্তীতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। দৈহিক বৈশিষ্ট্য বলতে দেহের গঠন, মুখের গড়ন, চোখের রং, চুলের রং, দেহের বর্ণ ইত্যাদিকে বুঝায়। মানসিক বৈশিষ্ট্য হলো-বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, অনুধাবন, স্মৃতি ইত্যাদি। এছাড়াও আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত কর্ম ইন্দ্রিয় হলো গ্রন্থি। বিভিন্ন গ্রন্থির নিঃসরণ আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে সহায়তা করে।

২. পরিবেশ: শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে যে জাইগোটের সৃষ্টি হয় সেখান থেকেই শিশুর পরিবেশের শুরু। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় পরিবেশের অর্থ যেমন ব্যাপক তেমনি বিচিত্র। এর বিস্তৃতি অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ যে অনির্দিষ্ট ভৌত সীমানার মধ্যে অর্ন্তত্বত্বথাকে সমস্ত প্রকৃতিগত বস্তু, ঘটনা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যা কোন ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যক্তির আচরণের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায় তাই তার পরিবেশ। পরিবেশ মূলত: একটি চলমান বা গতিশীল শক্তি-যা ব্যক্তির আচরণে যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটাতে পারে। জন্ম থেকে শিশু নানাবিধ পরিবেশের সন্মুখীন হয়-কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতে। আর এর প্রভাবও হয় কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে। প্রতিটি জীবকে সর্বক্ষণই তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। অন্যথায় অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার এই প্রচেষ্টাকে সঙ্গতি বিধান বা অভিযোজন বলে। আর পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে যেয়েই মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আচরণের যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাই শিক্ষা।



চিত্র ২: শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য মৌলিক ও পরিপূরক চাহিদা সমূহ

শিশুর সঠিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পরিমিত মাত্রায় পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং খেলাধুলার প্রচুর সুযোগ। একই ভাবে বিকাশের জন্য সুযোগ করে দিতে হবে বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার যেন পায় তা নিশ্চিত

করতে হবে। কারন যথাযথ পুষ্টি শিশুর মস্তিষ্কের কার্যাবলিসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটিয়ে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২.২.৩ পরিনমন বা পরিপক্বতা (Maturity):

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যে পূর্ণাঙ্গ বিকাশকে পরিনমন বলে। শিশুর অভ্যন্তরীণ

[;]চটপট্টু যঙ১চস্তা-চেতনা ও বিভিন্ন অঙ্গের সূক্ষ্ম ব্যবহারের দ্বারা পেশী সঞ্চালনের দক্ষতার মাধ্যমে পরিপক্বতা লাভ করে। অর্থাৎ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিশুর স্বাভাবিক ও সার্বিক বিকাশই পরিনমন।

উদাহরণ: হাঁটার জন্য শুধু পায়ের শক্তি এবং পেশীর সমন্বয় থাকলে হয়না, তার সাথে প্রয়োজন কিছু কৌশলগত দিক যা শিশুকে অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ বিকাশের সাথে পরিনমন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

২.৩ শিশুর বিকাশে মস্তিষ্কের ভূমিকা

আমরা জানি, আমাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিকসহ সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। তাই এসকল বিকাশ নির্ভর করে মস্তিষ্কের বিকাশের ওপর। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন:

- দেখা বা দৃষ্টির জন্য দায়ী মস্তিষ্কের পেছনের দিকের নিচের অংশ,
- শোনা ও বলা- মস্তিষ্কের নিচের অংশের মধ্যভাগ,
- স্পর্শ বা অনুভব করা মস্তিষ্কের পেছনের দিকের উপরের অংশ,
- চলন ক্ষমতার জন্য দায়ী মস্তিষ্কের উপরের দিকের (তালুর) মধ্যভাগ,
- চিন্তা, যুক্তি, সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়ী মস্তিষ্কের তালুর সামনের দিক ও কপালের পেছনে উপরের অংশ,
- পরিকল্পনা ও অনুশীলন করার জন্য দায়ী মস্তিষ্কের সামনের দিকের নিচের (কপালের পেছনের) অংশ।

মস্তিষ্ক আবার নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ নিয়ে গঠিত যা পৃথিবীর সকল শিশুর ক্ষেত্রে সংখ্যায় প্রায় সমান। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মস্তিষ্কে ১০০ বিলিয়ন কোষ থাকে। জন্মের পর এই কোষের সংখ্যা আর বাড়ে না। তবে একটি কোষের সাথে অন্য কোষের সংযোগ ছাড়া এই কোষগুলো একা একা কাজ করতে পারে না। বিকাশ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মস্তিষ্কের পরিপক্বতা প্রয়োজন। আর তা করা যায় কেবলমাত্র মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে ব্যাপক সংযোগ ঘটানোর মাধ্যমে। তবে জন্মের সময়ে শিশুর এ কোষগুলোর মধ্যে সংযোগ খুব বেশি থাকে না। এসময় মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে যত বেশি সংযোগ ঘটবে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র তত বেশি প্রশস্ত হবে।

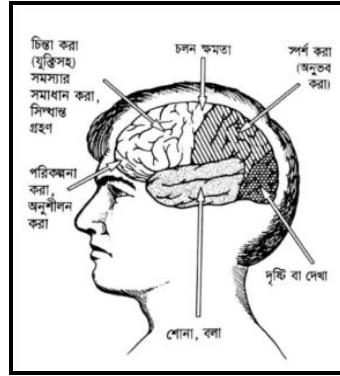
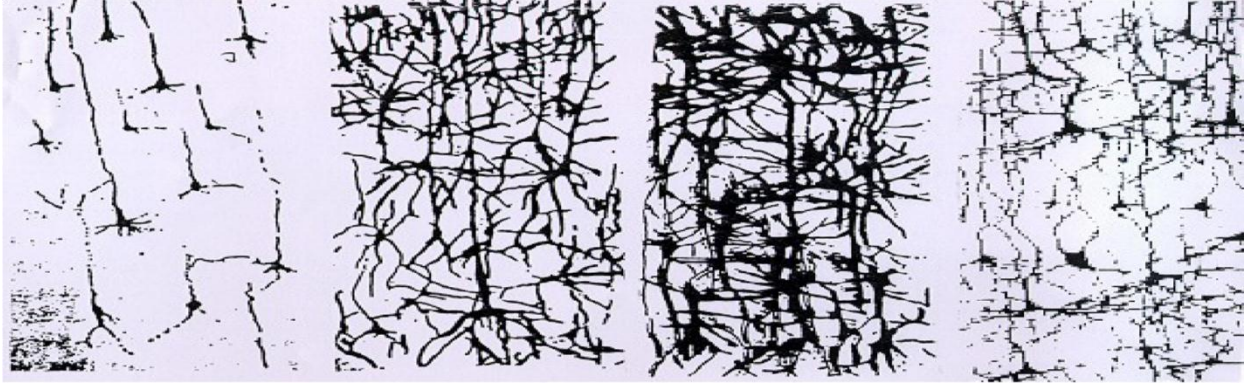
জন্মের সময়

১০০ বিলিয়ন কোষ

৩ মাস

৩-৫ বছর

১৪ বছর



চিত্র: মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে স্থাপিত সংযোগ সংখ্যা/ ধরন

আর মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত উদ্দীপনা। মস্তিষ্কের একেকটি অংশ যেহেতু একেকটি কাজে নিয়োজিত থাকে তাই সুসমন্বিতভাবে কাজের জন্য মস্তিষ্কের সকল অংশকে একই সাথে উদ্দীপিত করতে হয়।

২.৪ শিশু বিকাশের স্তর (বয়ঃক্রম)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় সব শিশুরাই প্রাকৃতিক নিয়মে একটি নির্দিষ্ট বয়সে বসে, দাড়ায়, হাঁটে, কথা বলে। খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে এক একটি দক্ষতা অর্জন করে। দক্ষতা অর্জনের সময়সীমাকে বিকাশের মাইলফলক বলে।

যেমন : দেড় মাসে শিশু সামাজিক হাসি দিতে শেখে, ৬ মাসে সাহায্য নিয়ে এবং ৯ মাসে সাহায্য ছাড়া বসতে পারে, ৯/১০ মাসে হামাগুড়ি দেয়, ১২-১৪ মাসে হাঁটে, ২ বছরে ভালভাবে/ স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে ইত্যাদি। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বৈশিষ্ট্য, শিখন এবং বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুর জীবনচক্র বয়স অনুসারে বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি স্তরকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেরই রয়েছে কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যা বয়সভেদে শিশুরা ঐ নির্দিষ্ট দক্ষতা বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। শিশুর জীবনের একেকটি স্তরের দক্ষতা ও বিকাশ পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও বিকাশের ভিত রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, কোনো একটা স্তরের বিকাশের ধারা কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হলে তা পরবর্তী স্তরের দক্ষতা ও বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। এভাবেই শিশুর জীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটতে থাকে যা বয়সের সাথে সাথে পরিপূর্ণতা পায়।

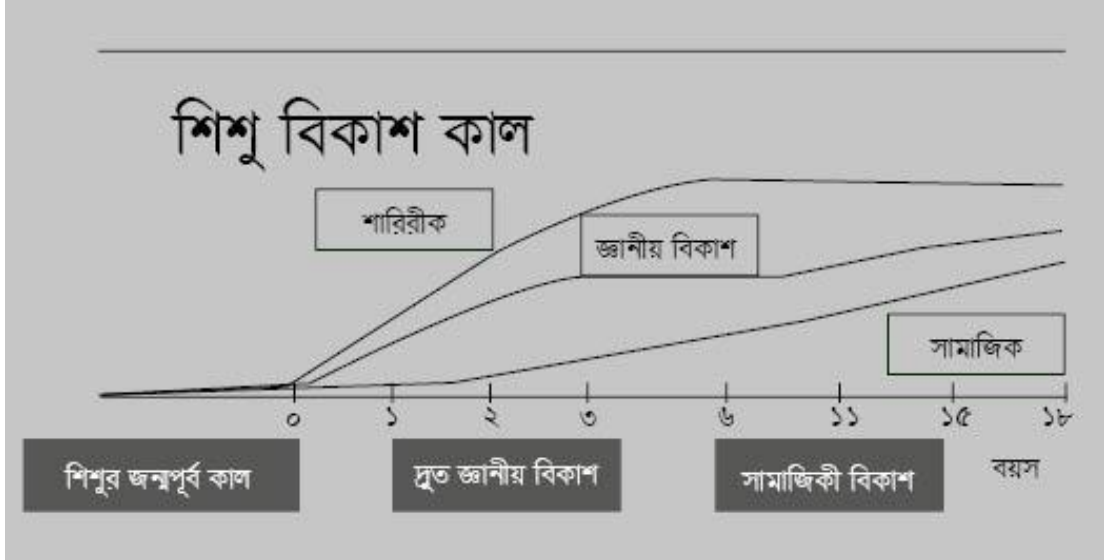
পূর্বের স্তর পার না করে সাধারণত শিশু পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন- কোনো শিশু হাঁটা না শিখে দৌড়াতে পারে না, বা বলা যায় হাঁটা ভালোভাবে না শিখে কেউ ভালোভাবে দৌড়াতে পারে না। শিশুর জীবনের বিভিন্ন বয়ঃক্রমে তাদের বৈশিষ্ট্য, পছন্দ, চাহিদা ও প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। আবার, নির্দিষ্ট একটি বয়সে সকল শিশুর আচরণে বিশেষ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও (মিল) দেখা যায়। এক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, বিভিন্ন দেশের শিশুদের মধ্যে মোটামুটি একই ধারাক্রম অনুযায়ী বিকাশ ঘটে থাকে।

সাধারণত একটি শিশু তার সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে নাকি পিছিয়ে আছে তা বিকাশের মাইলফলক দেখে বুঝা যায়।

১. গর্ভকাল (Intra-uterine embryo and fetus): গর্ভধারণ থেকে জন্মপূর্ব মূহূর্তপর্যন্ত)
২. নবজাতক (Infancy): জন্মপরবর্তী ২সপ্তাহ
৩. প্রাকশৈশব (Toddler or Babyhood): ২ সপ্তাহ থেকে ২ বছর
৪. বাল্যকাল (Early Childhood): ২ থেকে ৫ বছর
৫. বাল্যকাল (Late Childhood): ৬ বছর থেকে ১০/১১ বছর
৬. বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোর (Puberty or Pre-adolescent period): ১০/১১ বছর থেকে ১৩/১৪ বছর
৭. তরুণ বয়স (Adolescent period): ১৩/১৪-১৮ বছর

২.৪.১ গর্ভকাল (Intra-uterine embryo and fetus): গর্ভধারণ থেকে জন্মপূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত:

শিশু ভূমিষ্ট হবার মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এ পর্যায়ে বংশগতসূত্রে পাওয়া সহজাত গুণাবলী সঞ্চালিত হয়, যা পরবর্তী জীবন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়। মানব জীবনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দ্রুত বিকাশ ঘটে এ স্তরে মাত্র নয় মাসে একটি কোষ ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়।



চিত্র: বিকাশকালের বিভিন্ন ক্ষেত্র

শিশুর শারীরিক ও জ্ঞানীয় বিকাশ শুরু হয় জন্মের পূর্ব থেকে এবং সামাজিক বিকাশ শুরু দেড় মাস বয়স থেকে সামাজিক হাতির মাধ্যমে। এরপর থেকে শিশু যতবেশী মানুষ, প্রাণী এবং বস্তুর সান্নিধ্যে আসে সামাজিকতা ততই বাড়তে থাকে।

২.৪.২ নবজাতক (Infancy): জন্মপরবর্তী ২সপ্তাহ

ভূমিষ্ট হবার পর থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত এধাপ। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগতের সাথে/ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে শুরু করে এবং খাপ খাওয়ানো না হওয়া পর্যন্ত বিকাশ ব্যাহত হয়। পর্যায়টি নবজাতকের জন্য বিপদজনক। এ পর্যায়ে সঙ্গতিবিধানের অন্যতম বিষয় হলো পরিবর্তিত তাপমাত্রার সাথে সঙ্গতি বিধান(কারণ মার পেটে থাকাকালীন সে ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে থাকে, এছাড়াও শ্বাসপ্রশ্বাস, চোখা, গলধকরণ করা কঠিন হবার কারনে এসময়ে ওজন হ্রাস পায়। জন্মগতভাবেই নবজাতক যে স্বতন্ত্র এবং পৃথক মেজাজের অধিকারী তা তার কর্মতৎপরতা ও সংবেদনশীলতায় ধরা পড়ে যা পরবর্তীতে তার ব্যক্তি স্বাভাবিকতায় প্রভাব ফেলে।

২.৪.৩ প্রাক-শৈশব : (Toddler or Babyhood): ২ সপ্তাহ থেকে ২ বছর জীবন প্রহরের দ্রুত বৃদ্ধির এ সময়।

দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে- এর ফলে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জনের ফলে স্বনির্ভরতার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। এসময় শিশুরা মূলত বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে শেখে এবং চোখে পড়ার মতো কিছু অপরিহার্য দক্ষতা যেমন, গড়ানো, পাশ ফেরা, জিনিস ধরা, হামাগুড়ি দেয়া, বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, কথা বলা

ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে। শিশুরা তার সেবাদানকারীকে (বাবা/মা) চিনতে পারে ও বিভিন্ন আচরণে সাড়া দেয়। এসময় শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির মতো তার সার্বিক বিকাশ দ্রুত ঘটে থাকে। শিশুদের সাথে বয়স উপযোগী বিভিন্ন ভাষা, বুদ্ধি, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের জন্য মিথস্ক্রিয়া করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়কে সামাজিকীকরণের সূচনা পর্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাক-শৈশবে শিশুরা নিজেদের মনোভাব ও আগ্রহ এমন বিষয়ে নিবদ্ধ করে যা পরবর্তীতে সৃজনশীল বা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুসরণ করার প্রবণতা তৈরী করে। শিশুরা সমবয়সীদের সাথে এবং পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যান্য মানুষের সাথে সামাজিক মেলামেশা ও পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে। এ স্তরে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির মতো তার সার্বিক বিকাশও খুবই দ্রুত ঘটে থাকে। উপযোগী পরিবেশ ও উপযুক্ত সুযোগ পেলে তার ভাষাভিত্তিক, সামাজিক, আবেগিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের স্থায়ী ভিত রচিত হয়।

২.৪.৪ বাল্যকাল (Early Childhood)

২ থেকে ৫ বছর এ পর্যায়টি অর্জনের সময়। এ পর্যায়ে শিশুর প্রতি যে সামাজিক প্রত্যাশার প্রভাব তার আগ্রহ, আচরণ, মূল্যবোধে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সমাজ ও পরিবেশ বিষয়ক সরল ধারণা গড়ে ওঠে। আচরণে ন্যায় অন্যায় বোধের প্রতিফলন সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে শিশুরা যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাহলো শক্ত খাবার খেতে শেখে, ভালভাবে হাঁটতে শেখা, মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করা, স্ত্রী পুরুষের বিদ্যমান পার্থক্য করতে পারা, লেখাপড়া শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়া, সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার মাধ্যমে বিবেক গড়ে ওঠা ইত্যাদি। দলের সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন এ পর্যায়ের শিশুদের অন্যতম বিকাশমূলক কাজ। তাই এপর্যায়কে দলপূর্ব (pre-gang age) বয়স বলা হয়ে থাকে। এ বয়স থেকেই সামাজিক অভিযোজন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

২.৪.৫ বাল্যকাল (Late Childhood): ৬ বছর থেকে ১০ /১১ বছর

মানব জীবনের এপর্যায়ে বিশেষ কিছু দক্ষতা অর্জন করে যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে। হেভিংহাস্টের মতে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক নৈপুণ্য;
- উচ্চতর এবং বিকাশমান প্রাণী হিসাবে যথাযথ মনোভাব;
- সমবয়সীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করা;
- লিঙ্গ অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালন;
- লেখাপড়া ও গণনার মৌলিক কৌশল অর্জন;
- জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ধারণা অর্জনের মাধ্যমে নৈতিক বিকাশ সাধন;
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মনোভাব তৈরি;
- স্বাবলম্বিতা ও সক্ষমতা অর্জন।

এ পর্যায়ে স্কুলের চিরাচরিত ছকে বাঁধা জীবনের শুরু। এসময় থেকে মনোভাব, মূল্যবোধ ও আচরণ অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। বন্ধু ও তাদের মতামত প্রাধান্য পায়। শিক্ষাবিদরা এ স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের বয়স বা কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সোপান। এ স্তরের উদ্দেশ্য হলো দলের স্বীকৃতি অর্জন। মূলত: খেলাধূলা ও আনন্দলাভের জন্যই দল গঠন। সাধারণত: সমমনা শিশুরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে খেলাধূলায় জন্য মিলিত হয়।

২.৪.৬ বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোর (Puberty or Pre-adolescent period): ১০/১১ বছর থেকে ১৩/১৪ বছর

জীবন বিকাশের অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুন্দর এবং একই সাথে বিপদজনক একটি পর্যায়। স্বল্পস্থায়ী এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। বয়ঃসন্ধিকাল যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপক্বতা অর্জন করে, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করে। এস্তরে সবচেয়ে বেশি দৈহিক বৃদ্ধি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতের পরিবর্তন হয়। এ পর্যায়ে যতটুকু তথ্য তাদের চাওয়া ততটুকুই দেয়া প্রয়োজন। পরিবর্তনের অস্থিরতায় উপযোগী আচরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা প্রয়োজন। প্রাপ্ত বয়সে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের অদম্য ইচ্ছা ও সুখকর প্রত্যাশাই সাফল্যের পথে চালিত করতে পারে।

২.৪.৭ তরুণ বয়স (Adolescent period): ১৩/১৪-১৮ বছর

শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক বেশি পরিপক্বতা অর্জন করে। মানসিকভাবে সে নিজেকে অনেক বেশি সাহসী মনে করে, আবার কখনো কখনো হতাশা প্রকাশ করে। এমনকি সে যা নয় তাও ভেবে থাকে। এসময় নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশে, আবেগিক অনুভূতি যেমন, রাগ, দুঃখ, মেজাজ ইত্যাদি বেশ জোরালোভাবে প্রকাশ করে। এসময় ছেলে ও মেয়েদের বিশেষ আবেগিক ও সামাজিক পরামর্শ বেশ গুরুত্বের সাথে প্রদানের প্রয়োজন হয়। তারুণ্য প্রাপ্ত বয়সের সূচনা, আত্ম পরিচিতি অর্জনের বয়স। বয়সের দিক থেকে এরা সার্বিকভাবে পরিপক্ব। এপর্যায়ের বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নরূপ:

- সমবয়সী ছেলেমেয়েদের একত্রে নতুন সম্পর্ক তৈরি করা;
- নিজের দৈহিক গঠন স্বীকার করে তার যথার্থ ব্যবহার করা;
- বাবা-মা ও বয়স্কদের অযাচিত আদর ভালবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে শেখা;
- অর্থোপার্জনের উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণের প্রস্তুতি, বিবাহ ও পরিবার প্রতিপালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
- নিজেকে স্বনির্ভরভাবে পরিচালিত করার নীতিমালা উদ্ভাবন ও আদর্শগ্রহণ

তারুণ্যের স্বীকৃতি ভালবাসা ও সাফল্য অর্জনের উপর অভিযোজন নির্ভর করে। তারুণ-তারুণী যদি নিজেদের সমস্যা যথাযথ ভাবে সমাধান করতে সক্ষম হয়, তবে আত্ম প্রত্যয় বৃদ্ধি পায়। বাস্তবসম্মত চিন্তাশক্তি অর্জনের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

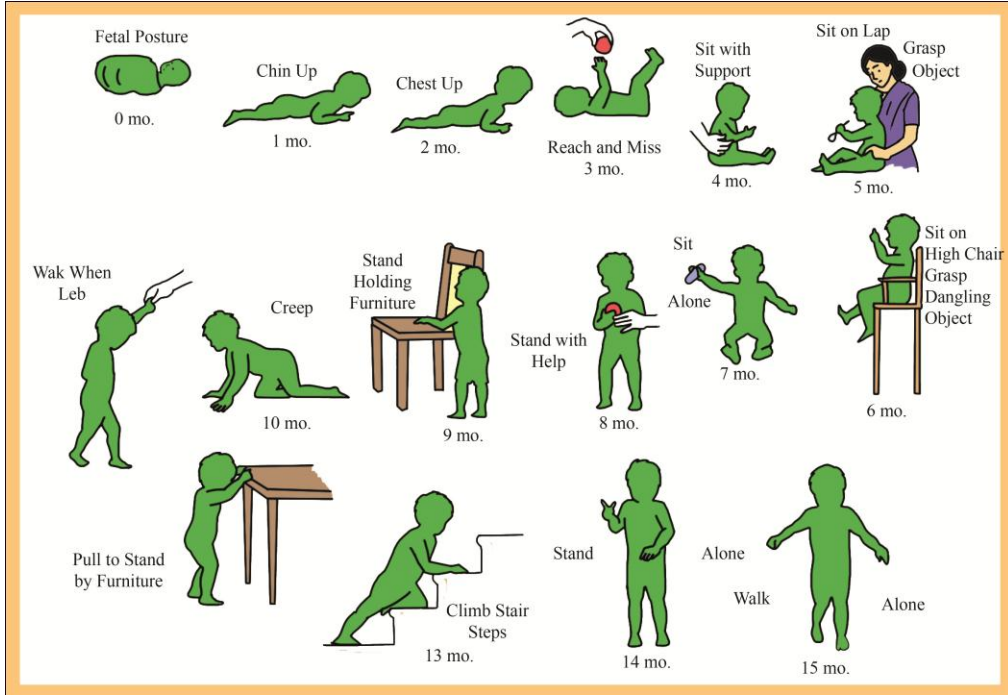
২.৪.৮ শিক্ষকের করণীয়

শিশু হলো একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা। বিভিন্ন বংশগতি ও পরিবেশের কারণে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রতিটি শিশুই আলাদা। আমাদের প্রত্যেকেরই শিশুদের সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ও সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যিক। শিশুর বিকাশের জন্য প্রতিটি স্তরই খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর জীবনের এক একটি স্তরের দক্ষতা ও বিকাশ পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও বিকাশের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবেই শিশুর জীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটতে থাকে, যা ক্রমান্বয়ে তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়কাল। শিশুর সারা জীবনের ভিত্তি রচনা ও পরবর্তীকালের শিখনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক হিসেবে শিশুদের সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক অর্থাৎ সার্বিক ধারণা নিয়েই আমাদের শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম নির্ধারণ, পরিচালনা ও মূল্যায়নসহ শিখনের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়োজিত হতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীদের সফলতা অর্জনে সহায়তা করতে পারবো।

২.৫ বিকাশের বিভিন্ন ডোমেইন বা ক্ষেত্রসমূহ

পরিবার, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পুষ্টি ও শিখন শেখানোর প্রক্রিয়া সার্বিক বিকাশের অন্যতম নিয়ামক। সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রগুলোকে প্রধানত শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, সামাজিক, আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ, আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং খেলা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকে। নিচে ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো:

২.৫.১ শারীরিক বিকাশ (Physical development)



চিত্র: শিশুর শারীরিক বিকাশের ক্রমধারা

বৃদ্ধির ফলে দেহে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা শারীরিক বা সঞ্চালনমূলক দক্ষতার বিকাশ ও নৈপুণ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সঞ্চালনমূলক দক্ষতার বিকাশের অন্তর্ভুক্ত হলো: চলাচলে বা দৈহিক কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন যা কিনা নির্ভর করে মস্তিষ্কের পরিপক্বতা, ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা, বর্ধিত আকার বা দৈহিক বৃদ্ধি, মাংসপেশীর শক্তি, অস্থির সংগঠন প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা অনুশীলনের সুযোগের ওপর। বর্ধিত শক্তির দ্রুততা, নমনীয়তা, ক্ষিপ্ততা, ভারসাম্য এবং দেহের সমন্বয়ে-চলাচল অনেক বেশি সুনিপুণ ও দক্ষতাপূর্ণ হয়। সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হলো- দেহের সূক্ষ্ম মাংসপেশী ও হাড়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ- বিশেষত: হাত, পা এবং মুখ। “সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতা” শব্দটি সাধারণত: ব্যবহৃত হয় চোখ ও হাতের সমন্বয় বোঝাতে। চোখ ও হাতের সমন্বয় বলতে বুঝায়- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দৃষ্টিগত বস্তু চিহ্নিতকরণ ও প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষমতা এবং সুনিপুণভাবে নাড়া চাড়া বা সঞ্চালন করা, যেমন-সোজা দাগে লেখা। সূক্ষ্ম সঞ্চালনমূলক বিকাশ এবং চোখ ও হাতের সমন্বয় ঘটে স্কুল সঞ্চালনের বা শারীরিক বিকাশের সংযোগে। উদাহরণ স্বরূপ-মাথা ও ধড়ের নিয়ন্ত্রণ এবং বাহু ও হাতের নড়াচড়ার ওপর দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ- সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতার গুণগত দিকের ওপর প্রভাব ফেলে। স্কুল সঞ্চালনের বা শারীরিক বিকাশের দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হলো- বৃহৎ আকৃতির হাড় ও পেশীর সঞ্চালনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেগুলো হাঁটা, দৌড়ানো, বসা, ছুড়ে মারা, ধরা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। সঞ্চালনমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে এবং পূর্বোক্তি বা ভবিষ্যৎবাণী করার মত ক্রমানুসারে। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী ক্রিয়া থেকে বর্ধিত, নিয়ন্ত্রিত এবং নতুন সঞ্চালনমূলক প্যাটার্নের বিকাশ ঘটে, যা কিনা পরবর্তীতে জটিল সঞ্চালনমূলক প্যাটার্ন তৈরির জন্য সমন্বিত হয়। জীবনের প্রথম বছরের প্রধান শারীরিক চ্যালেঞ্জসমূহ হলো সহজ/ সোজা অঙ্গভঙ্গির বিকাশ ও তা বজায় রাখা, অবস্থানের পরিবর্তন করা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়া, কিছু ধরতে চেষ্টা করা, জিনিস মুষ্টি করে ধরা, হাত থেকে জিনিস ছেড়ে দেয়া এবং

বহন করা, জিনিস এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা। এই সকল সঞ্চালনমূলক দক্ষতার উদ্ভব, ব্যবহার এবং নিপুণতা শৈলী নির্ভর করে তাদের পৃথিবী যেখানে তারা বাস করে তা অনেক বেশী ফলপ্রসূ ভাবে আবিষ্কার, পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে, বুঝতে এবং পরিচালনা করতে পারার ওপর। সঞ্চালনমূলক দক্ষতার বিকাশ প্রাপ্ত কৈশোর বয়স পর্যন্ত পরিমার্জিত হতে থাকে- যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আঙ্গুলের দ্বারা সূক্ষ্ম নাড়াচাড়ার মাধ্যমে দক্ষভাবে যন্ত্রাদি ব্যবহার করতে পারে। ৫-৬ বছরের মধ্যে মোটামুটিভাবে মৌলিক সঞ্চালনমূলক দক্ষতাসমূহ ভালভাবে শিখে যায়।

লোকোমোটিভ প্যাটার্ন (গতিশীল নক্সা) এর অন্তর্ভুক্ত হলো-হাঁটা, দৌড়ানো, লাফ দেয়া, ঝাপ দেয়া, দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং দড়ি লাফানো। ব্যালিস্টিক স্কীলগুলো হলো- ছুড়ে মারা, ধরা, লাথি মারা ইত্যাদি। এই দক্ষতাগুলো খেলা ও ক্রীড়া যেখানে অনেক বেশি পরিপক্ব, সমন্বিত ও জটিল চলাচলের জন্য প্রয়োজন হয়, সেসকল খেলাগুলোতে শিশু কতটুকু ভালো করবে তা নির্ভর করে দূরত্ব ও দ্রুততা মূল্যায়নের ক্ষমতার পরিবর্তনের ওপর। এই দক্ষতাগুলোর বিকাশ ঘটে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে, এখানে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া করা হয়। আমরা যা কিছু করি তার প্রায় সব কিছুরই অংশ হলো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য প্রত্যক্ষণের দক্ষতা অনেক বেশি বুদ্ধি বিকাশের সাথে সম্পর্কিত।

শিশুরা যখন বাল্যাবস্থা এবং প্রাপ্ত কৈশোরে পৌঁছে তখন শারীরিক বা স্থূল সঞ্চালনমূলক দক্ষতা অনেক বেশি ছন্দময় থাকে এবং ছেলেমেয়ে ভেদে পার্থক্য দেখা যায়। যে সকল স্থূল সঞ্চালনমূলক কাজে শক্তির প্রয়োজন সেসকল কাজে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে ভাল করে, যেমন- বল ছোড়া। মেয়েরা সূক্ষ্ম সঞ্চালনমূলক কাজে ভাল হয়। তাদেরও পুষ্টি ছেলেদের চেয়ে বেশি যথাযথ ও দ্রুত হয়। মেয়েদের হাঁটা অনেক বেশি সঠিক হয় ও তারা অনেক দূর থেকে এক পায়ে লাফ দিতে পারে।

শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, আশা করা হয় যে তারা লেখার জন্য কলম, পেন্সিল ব্যবহার করতে পারবে। যদি শিশুর মৌলিক সূক্ষ্ম সঞ্চালন দক্ষতা, বুঝার ক্ষমতা এবং অক্ষর লেখার পূর্ব দক্ষতা না থাকে (Lamme, 1979) অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক পূর্বযোগ্যতা বা প্রস্তুতি না থাকলে এসকল কাজ করা খুব কঠিন। শিক্ষকগণ যখন এসকল পূর্ব যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হবেন তখন তাদেরও আকাজ্জ্বার মাত্রা বাস্তব সম্মত হবে এবং তাদের সাহায্য সহায়তা দ্বারা শিশুরা সফলতার অভিজ্ঞতা পাবে। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস। আর তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষাকার্যক্রম তার জন্য ফলপ্রসূ করতে শিশুর স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখার কোন বিকল্প। সঞ্চালন, সূক্ষ্ম সঞ্চালন, লোকোমটর, ব্যালিস্টিক স্কীল

২.৫.২ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

বুদ্ধি হলো সে সকল ক্ষমতা বা দক্ষতার সমষ্টি যার সাহায্যে একজন ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয়া, বুঝতে চেষ্টা করা, মনে রাখা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ করা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করা, সমস্যার সমাধান করা এবং তার পরিবেশের সাথে যথাযথ ভাবে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা।

২.৫.২.১ বুদ্ধিবৃত্তিক/ জ্ঞানীয় বিকাশের তত্ত্ব (Cognitive development)

শিশু নিজের চারপাশ সম্পর্কে ধারণা- যেমন: মা আসলে কান্না থেমে যাওয়া, দুধের বোতল দেখলে খুশি হওয়া, সময়ের সাথে সাথে চিন্তা করা ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা, যুক্তি দেখানোর নৈপুণ্য অর্জন করা, পরিবেশ উপযোগীভাবে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বলে। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জঁ পিয়াজে তত্ত্বের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানীয় বিকাশকে বর্ণনা করেছেন।

জঁ পিয়াজে শিশুদেরকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখেন। পিয়াজের মতে, একটি শিশুর বুদ্ধি বিকাশ হচ্ছে ক্রমশ জটিল মানসিক কাঠামোর গঠন প্রক্রিয়া এবং এটিকে তিনি “স্কিমা” (Schema)- বৃত্তীয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ শিশু তার পৃথিবী তৈরিতে স্কিমা ব্যবহার করে। স্কিমা হলো একটি ধারণা বা কাঠামো যা ব্যক্তির মনের মধ্যেই থাকে এবং যার দ্বারা তথ্য সুশৃঙ্খলিতকরণ ও বিশ্লেষণ করে। ছোট শিশুর প্রাথমিক স্কিমা হচ্ছে চোষা। পিয়াজের মতে, শিশুরা সক্রিয়ভাবে তাদের চারপাশের পরিবেশ অনুসন্ধান করে (exploration) এবং পরিবেশের বিদ্যমান উপকরণসমূহ দক্ষতা সহকারে ব্যবহারের (manipulation) মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব জ্ঞান অর্জন করে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শিশুরা নতুন তথ্য অথবা ধারণা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিদ্যমান চিন্তা-ভাবনাকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে এবং এই নতুন তথ্যই পরবর্তীতে তাদেরকে নতুন নতুন বিষয় বুঝতে সাহায্য করে, এভাবেই শিখন সংগঠিত হয়।

পিয়াজে শিশুকাল থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশের চারটি প্রধান ধাপ চিহ্নিত করেছেন। প্রতিটি ধাপেই ব্যক্তি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, নাড়াচাড়া এবং অনুসন্ধান করার মাধ্যমে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হয়। এ তত্ত্বের আলোকে, একজন শিশুকে ‘একক খুদে বিজ্ঞানী’ হিসেবে অভিহিত করা যায়। শিশুর চিন্তা করার প্রক্রিয়া বয়স্ক মানুষের চিন্তা করার প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। পিয়াজের মতানুসারে মানুষ তার চিন্তা করার প্রক্রিয়াকে মানসিক কাঠামোতে সংগঠিত করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এই মানসিক কাঠামোর সাহায্যেই শিশুরা পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং পৃথিবী সম্পর্কে নানারকম জ্ঞান লাভ করে। শিশুর সাধারণ মানসিক কাঠামোগুলো আস্তে আস্তে একত্র হয়ে কার্যকরী বা সমন্বিত মানসিক কাঠামোতে পরিণত হয়। স্কিমাগুলোই শিশুর চিন্তার মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। শিশুর স্কিমা সুসংগঠিতকরণ ও নতুন স্কিমা বিকাশ লাভ করার মাধ্যমেই সে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য দু’টি মৌলিক প্রক্রিয়া কাজ করে। এগুলো হলো:

আত্মীকরণ (assimilation):- বিষয়টি তখনই ঘটে যখন শিশু নতুন অর্জিত জ্ঞানকে পূর্বের জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করে। অর্থাৎ শিশু পরিবেশ সম্পর্কে নতুন তথ্য তার স্কিমায় যোগ করে।

অভিযোজন (accommodation)- শিশু তার স্কিমার সাহায্যে যে কোনো তথ্য নির্বাচন (selection), প্রক্রিয়াকরণ (processing), সংরক্ষণ (conservations) করে থাকে।

সে যদি কোনো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে সে তার বর্তমান স্কিমার সাহায্যে সমাধানের চেষ্টা করে। যেমন- একটি ৮ বছরের মেয়ে শিশুকে একটি হাতুড়ি ও একটি পেরেক দেয়া হলো দেয়ালে ছবি ঝুলানোর জন্য। সে পূর্বে কখনো হাতুড়ি ব্যবহার করেনি। কিন্তু অন্যদের কাজ করতে দেখেছে এবং বুঝেছে যে হাতুড়ি শক্ত করে ধরতে হয়। হাতল ধরে ঠুকে ঠুকে পেরেক দেয়ালে ঢুকানো যায়-বিষয়গুলো মনে করে সে তার আচরণকে পূর্বের স্কিমার সাথে মিল করলো। কিন্তু হাতুড়ি ভারি তাই সে হাতুড়ির খুব আগার দিকে ধরলো। শক্ত করে মারলো কিন্তু পেরেক বেঁকে গেল। তাই সে আঘাতের পরিমাণ কমালো। এই উপযোজন বা মানিয়ে নেয়া অর্থাৎ সামঞ্জস্যকরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবী সম্পর্কে তার ধারণার পরিবর্তন এর প্রকাশ পায়। বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে সমস্যার সমাধানের এই প্রক্রিয়া আসলে আত্মীকরণ। আবার সমস্যা সমাধানে শিশুর বর্তমান স্কিমা যদি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রয়োজন হয় নতুন স্কিমার। শিশু নতুন স্কিমা সৃষ্টি করে তার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। এভাবে নতুন স্কিমা সৃষ্টি হলো অভিযোজন। মূলত আত্মীকরণ ও অভিযোজন এ দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার মধ্যে সৃষ্ট সাময়িক ভারসাম্যহীনতা দূর করার চেষ্টা করে এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসে। একটি শিশুর এই ভারসাম্য অবস্থানে ফিরে আসা হলো উপযোজন (adaptation)।

ইন্দ্রিয়-পেশীর সমন্বয়কাল (pre-operational period)-

শিশুর জন্ম থেকে ২ বছর

এই পর্যায়ে একটি শিশুর মাঝে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়,

১. বস্তুর স্থায়িত্বের ধারণা ও শিশুর সামনে থেকে কোনো কিছু সরিয়ে নিলে সে বস্তুটি কোথায় আছে সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় (Object permanence)।
২. লক্ষ্যভিমুখী আচরণ : এছাড়া শিশু কোনো কিছু দেখলে তা ধরতে চায় এবং সেদিকে অগ্রসর হয় (Goal directed actions)।

এই বয়সী শিশুদের সঞ্চালনমূলক আচরণে বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটে। শিশুদের পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান খুবই সীমিত থাকে। তবে তা ক্রমে বিকাশমান। কারণ এটা নির্ভর করে শারীরিক মিথস্ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার ওপর। শারীরিক বিকাশ শিশুকে নতুন বুদ্ধিগত দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। মোটামুটিভাবে ৭ মাস বয়সে বস্তুর স্থায়িত্বের ধারণা অর্জন করে। এই স্তরের শেষের দিকে শিশুর মধ্যে কিছুটা প্রতীকী (ভাষা) দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

প্রাক প্রয়োগিক স্তর (২ থেকে ৭ বছর):

১. ধারণা স্তর (২ থেকে ৪ বছর)

পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রতীকী চিন্তা করার দক্ষতা বাড়ে। শিশুরা অনেক বেশী অনুকরণ এবং অনুসরণ করে। বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটে- প্রতীক, ভাষা, স্মৃতির ব্যবহারের মাধ্যমে এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের বিকাশ ঘটে, তবে চিন্তা থাকে অযৌক্তিক ও একমুখী বা এককেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা শিশুকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে।

শিশুর মধ্যে প্রতীকী খেলার সূচনা হয়। যেমন-শিশু লাঠির ওপর ভর দিয়ে লাঠিকে ঘোড়া হিসেবে ব্যবহার করে। এই স্তরের শিশুরা কোন জিনিসের অনুপস্থিতিতেই তাকে মানসিকভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন করে। যেমন-পিয়াজের ২৯ মাস বয়সীকন্যা জ্যাকুলীন বাথরুমে তার বাবাকে গরম পানির কল খুলতে দেখে মনে করলো বাবা দাড়ি কামাবে, কারণ অতীতে দাড়ি কামানোর আগে বাবাকে এই ধরনের কাজ করতে সে দেখেছে।

জ্যাঁ পিয়াজে অনুসারে শিশুরা বিভিন্ন বয়সে এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করে। একই সময়ে অন্যান্য কিছু শিশুদের মধ্যে একাধিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি দৃঢ় ভাবে বলেছেন বোধ বিকাশের ক্ষেত্রে এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করতেই হয়। কোন একটি ধাপ বা পর্যায়কে বাদ দিয়ে এগোবার কোন সুযোগ নেই। প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার ফলক, তার সাথে রয়েছে পৃথিবীকে বুঝার জটিল বোধশক্তি।

২. উপলব্ধির স্তর/ মূর্ত প্রতীক স্তর (৪ থেকে ৭ বছর)

এ বয়সী শিশুদের মধ্যে নতুন নতুন মানসিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটে। উপলব্ধির স্তরে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে যৌক্তিক চিন্তা এবং বাস্তব বস্তুর সাথে সম্পর্কিত প্রতীকের সুশৃঙ্খল ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে। মূর্ত প্রয়োগিক স্তর সাত ধরনের সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত, যেমন-নম্বর, দৈর্ঘ্য, তরল, ভর, উচ্চতা, ক্ষেত্র বা ভূমি এবং পরিমাণ। এ স্তরে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার অবসান ঘটে, প্রয়োগিক চিন্তা বিকাশিত হয়।

বস্তুর ভৌত পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাকে বলা হয় সংরক্ষণ (conservation)। যেমন-একটি শিশুকে যদি সমপরিমাণ দুইটি গ্লাসে পানি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন গ্লাসে পানির পরিমাণ বেশি তাহলে সে বলবে দুটোতেই পানির পরিমাণ সমান। পরবর্তীতে একটি গ্লাস পরিবর্তন করে একটি সরু গ্লাসে এবং অপরটি আগের গ্লাসেই পানি ঢেলে শিশুকে জিজ্ঞাসা করলে স্বাভাবিকভাবেই সে বলবে সরু গ্লাসে পানি বেশি আছে। কারণ এ স্তরে শিশুরা একমুখী চিন্তায় নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। এই স্তরের শিশুর পক্ষে কোন বস্তুর বিভিন্ন দিকের ওপর (Decentering) মনোযোগ দেয়া বা ভাবা কঠিন। এই পর্যায়ে শিশু বিভিন্ন বিষয়কে সমন্বিতভাবে চিন্তা করতে পারে। তাদের ভাষার ব্যবহার অনেক পরিপক্ব হয়। স্মৃতি এবং কল্পনার বিকাশ ঘটে যা তাদের বিগত ও অনাগত এর পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে। ছলনা বা ভান করতে শেখে। এ পর্যায়ে তাদের চিন্তা হয় স্বতঃস্ফূর্ত, সম্পূর্ণ যৌক্তিক নয়। এরা জটিল ধারণা করতে পারে না, যেমন: কার্যকারণ, সময় এবং তুলনা।

বাস্তব প্রায়োগিক স্তর (concrete operational period): ৭-১০/১১ বছর

এ পর্যায়ে শিশুর বুদ্ধি ও যুক্তি পরিপক্বতা পায়। বস্তুর আকৃতি, পরিমাণ, আয়তন ও প্রকৃতিগত ধারণা জন্মে। নিজের যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, বস্তুর শ্রেণিকরনেও সক্ষম হয়। জ্ঞান বিকাশের এই পর্যায়ে শিশুর চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তু ও ঘটনা নির্ভর হয়। বস্তুর স্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ, বস্তুর পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ও পরিবর্তনের বিপরীতমুখিতা (reversibility) সম্পর্কে ধারণা হলো এই পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্য। যেমন: ক খ গ এই স্তরের শিশুরা বুঝতে পারে যে, ক - খ এর চেয়ে, এবং খ - গ এর চেয়ে ছোট অর্থাৎ ক-খ এবং গ এর চেয়ে ছোট।

এ বয়সে শিশুরা যৌক্তিক এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যুক্তি বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করে। বাহ্যিক ঘটনার প্রতি সচেতন হয় এবং বুঝতে শুরু করে যে একেক জনের চিন্তা ও অনুভূতি অনন্য। অন্যের কাছে বলা যায় না, হতে পারে অবাস্তব। এ পর্যায়ে তারা বিমূর্তভাবে বা অনুমান করে চিন্তা করতে পারে না।

রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক স্তর (formal operational period): ১১/১২-১৫/১৬ বছর

রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক স্তরে বুদ্ধি ও যুক্তির সমন্বয়ে কিশোর কিশোরীরা এ সময় বিমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম হয়। অনুমিত বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ে তারা বেশ সক্রিয়। এই স্তরে তারা বক্তব্যের ধরন (form) এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক (relation between contents/subjects) ও পার্থক্য (differentiation) করতে পারে। আরোহ অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্তির নিরিখে বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণের প্রয়াস নেয়। এই সময়ে শিশুরা সহযোগিতামূলক মনোভাবের অধিকারী হয়। তার জীবনে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সূচিত হয়। সে আলোচনায় অগ্রহী হয়ে ওঠে, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করে। শিশুর মাঝে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও এই পর্যায়ে হয়ে থাকে। চিন্তাশক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এই স্তরের কিশোর কিশোরীরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারণা লাভ করে। যারা বোধ বিকাশের এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তারা যৌক্তিকভাবে সংকেতের ব্যবহার করতে পারে যেমন: বীজগণিত, বিজ্ঞান। তারা বিভিন্ন ধরনের চলক নিয়ে (Variable) সুশৃঙ্খল ভাবে ভাবতে পারে। অনেকেই এই স্তরটিকে বাস্তবের পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে চান যা কিনা সমাজ সংসারে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

এই পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বয়ঃসন্ধিকালের আত্মকেন্দ্রিকতা। এই সময় কিশোর কিশোরীরা মনে করে তাকে অন্যরা তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখছে। ফলে বেশিরভাগ সময় সে আত্মকেন্দ্রিকতায় ভোগে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে বয়সের সাথে সাথে জ্ঞানীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে যার দ্বারা শিশুরা পরবর্তীতে জীবন চলার পথে পদে পদে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। এর ব্যত্যয় ঘটলে ভবিষ্যতে তাদের জীবনধারণ করা কঠিন হবার এবং একইসাথে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে।

শিশুর শিখনে এ তত্ত্বের প্রভাব ও শিক্ষক হিসেবে করণীয়

শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য তার বয়স এবং স্তরভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। শিশুকে তার বয়সের ভিন্নতা অনুযায়ী জানা ও বোঝা যেমন জরুরি, তেমনি সে অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ করাও জরুরি। শিশুরা বড়দের মতো করে চিন্তা করে না। তাদের রয়েছে নিজস্ব চিন্তার জগৎ, যা বড়দের থেকে আলাদা। জ্ঞান বিকাশের কোন পর্যায়ে শিশু আছে সে অনুযায়ী তাকে নির্দেশনা দিলে তা শিশুর জ্ঞানের বিকাশ বৃদ্ধির সহায়ক হবে। সুতরাং শিক্ষকের কাজ হবে শিশুর চিন্তার প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করা এবং তার স্তর অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া। অর্থাৎ শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও বিভিন্ন স্তরে শিশুর শিখন কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা রাখবেন। সর্বোপরি, পিঁয়াজের

মতবাদ অনুধাবন করলে একজন শিক্ষক শিশুর সমস্যা যেমন সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন তেমনি সে অনুযায়ী সমাধানের জন্য অনেক বেশি সচেষ্ট হতে পারবেন।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর অভাবে শিশুর মধ্যে কথা বলা, ভাষা, বুঝা, চলাফেরা, নড়াচড়া করা, যোগাযোগ করা, সঠিক এবং পরিমিত আচরণ করা, খেলাধুলা করা এবং পড়ালেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা তৈরি হয়। এর ফলে শিশু তার সমবয়সীদের তুলনায় বিকাশের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় শিক্ষক অভিভাবকের করণীয় হলো যতদ্রুত সম্ভব শিশুর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। পরিমিত পুষ্টি, বয়স উপযোগী উদ্দীপনা, সঠিক যোগাযোগ, আনন্দঘন ও কর্ম উৎসাহী পরিবেশ শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশের সহায়ক।

২.৬ সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ (Social and Emotional Development)

২.৬. ১ সামাজিক বিকাশ



চিত্র: সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ

জন্মের পর থেকেই অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিশুর চাহিদা পূরণ করার মধ্য দিয়ে মা এবং আপনজন শিশুকে সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলেন। এসময়ে তারা শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করেন, খাওয়ান, যত্নাদি করেন, যার মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহ উদ্দীপিত হয়, শিশু আরাম ও পরিতৃপ্তি লাভ করে এর মধ্য দিয়ে আশ্বস্ততা এবং বিশ্বস্ততার সূচনা হয়। উদ্দীপনা শিশুকে আনন্দ দেয়, পরিতৃপ্ত করে ফলে শিশু ও মায়ের মধ্যে মধুর সম্পর্কের দ্বারা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। আর যেসকল শিশু যত্ন থেকে বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যে হিংসা, আক্রমণাত্মক, নেতিবাচক, কলহপ্রবণ এবং অসহযোগী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। দুই মাস বয়সে শিশুর মধ্যে সামাজিক হাসি লক্ষ্য করা যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এক বছরের শিশুরা হয় নিজে একা থাকে অথবা বড়দের সাথে থাকতে চায় কিন্তু একই বয়সী অন্য শিশুর উপস্থিতি পছন্দ করে না। দুই বছরে কথা বলার পরিমাণ ১০%, চার বছরে তা বেড়ে ৬০% হয়। শিশু মনস্তত্ত্ববিদ ব্রিজেস, আইজ্যাক, গিজেল-শিশুর সমাজ সচেতনতা ও প্রক্ষোভের বিকাশে ৩টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১.অনীহা (Indifference), ২.বিরোধ বিদ্বেষ (Hostilitic) ৩.বন্ধুত্ব (Friendship)।

ব্রিজেস (১৯৭১) প্রাক স্কুল স্তরের (২-৫বৎসর) শিশুদের বড়দের প্রতি আচরণের তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন- প্রথম পর্যায়ে শিশু পরিবারের বড়দের উপর নির্ভর করে, তাদের সাহায্য কামনা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু বড়দের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয় ও বাধা প্রদান করে। শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ (৪-৫বৎসর) বয়সে শিশু বড়দের সহযোগিতা করে,

সম্মান করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়। এ স্তর থেকেই শিশু দলে থাকতে ভালবাসে। দলে শিশুর আচরণ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। কেউ মিশতে ভালোবাসে, কেউ বা একা থাকতে ভালোবাসে, কারো মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দেখতে পাওয়া যায়। আবার কাউকে অন্যের আদেশ পালন করতে দেখা যায়। শাসন, শৃঙ্খলা, বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন সঙ্গী-সাথীর কাছ থেকে সহযোগিতা ও ভাগাভাগি করতে শেখে। ৬-৮বয়সের শিশুদের মধ্যে আত্মসচেতনতা প্রবল হয়। বাড়ির এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেশার নিয়মকানুন যে একরকম নয় এ উপলব্ধি ঘটে। এ ব্যাপারে শিশু আপত্তি তোলে এবং মৌন বিদ্রোহ ভাব দেখায় (পিয়াঁজে-১৯৩২)। ৮-১০ বছরে শিশু স্বাবলম্বী হয়। নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর আস্থা বান হয়। ৮-১২ বছরের শিশুর সামাজিকতার প্রধান আকর্ষণ হয় দল। ১০-১১ বছরের ছেলে মেয়েদের মধ্যে লিঙ্গের পার্থক্য (Sex difference) সুস্পষ্ট হয়। ছেলেরা ছেলেদের দলে, মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। দলে সাধারণত: একই বয়সের ও একই আর্থ সামাজিক (Socio-economic status) মানের ছেলেমেয়েরা থাকে। এটা ১১-১৪/১৫ বছরে প্রকট আকার ধারণ করে। এ বয়সের ছেলেদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং মেয়েদের মধ্যে উদ্বেগ বেশি দেখা যায়। ফিনে (Finney) লক্ষ্য করেন যে, যাদের মায়েরা কঠোর এবং মারমুখি, তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কলহ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে-সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে পালিত শিশুরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবার ও সমাজের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন অনুযায়ী খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করে। To be meek, patient, tactful, modest, honorable, brave is not to be either manly or womanly; it is to be human. (Jane Harrison 1850-1928)

২.৬.২ আবেগিক বিকাশ

খুশি হলে হাসা, ব্যথা পেলে কাঁদা, কোন কিছু চেয়ে না পেলে জেদ করা ইত্যাদি আবেগের বহিঃপ্রকাশ। নবজাত শিশুর মধ্যে অবিমিশ্র উত্তেজনা হল প্রথম আবেগ। জীববিদদের মতে মস্তিষ্কের থ্যালামাস আবেগের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং এন্ড্রিনাল গ্রন্থির নিঃসরণ- এন্ড্রিনালিন আবেগকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালিত করে। আবেগ দুই প্রকার: ধনাত্মক- হাসি, আনন্দ, স্নেহ ভালবাসার অনুভূতির প্রকাশ ও অন্য দিকে ক্রোধ, ভয়, আক্রমণাত্মক আচরণ, এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি নেতিবাচক আবেগ। আবেগের গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক, দুটো দিক রয়েছে। শিশু ইতিবাচকভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সমবয়সী ও বড়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ও বজায় রাখা, অর্থাৎ প্রচেষ্টা ও ভুল, অনুকরণ, সাপেক্ষণ ও প্রশিক্ষণের দ্বারা আবেগের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভাল লাগা, মন্দ লাগা, আবেগ অনুভূতির সঠিক ভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করে। দেহ ও মনের ক্রমবিকাশের মত আবেগেরও ক্রমবিকাশ ঘটে এবং সেই সাথে আবেগের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন আসে। আবেগজনিত আচরণ অনেকটা সুসংবদ্ধ হয়। মূল্যবোধ, আদর্শ, অন্যের প্রতি আগ্রহ ও অন্যের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি সম্মান, নিজের হিত চিন্তা ইত্যাদি শিশুর আবেগময় জীবনকে প্রভাবিত করে। জীবনের শুরু থেকে শিশুর আবেগকে সুপরিচালিত করলে বয়সের সাথে সাথে আবেগেরও সুষ্ঠু পরিণতি ঘটে।

হাসিখুশি পরিবেশ, বাবা-মার আদর্শ, স্নেহপূর্ণ আচরণ-শিশুর মধ্যে ভালোলাগার অনুভূতি সৃষ্টি করে। শিশু নিজেকে ভালবাসতে শেখে, অন্যকে বিশ্বাস করতে শেখে। শিশুর স্বাভাবিক আবেগের তীব্র প্রকাশকে জোর করে অবদমন করলে, শাস্তি দিলে বা গালাগালি করলে শিশু ভীত হয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শিশুর আচরণে নানারকম অসঙ্গতি দেখা দেয়। শরীরবিদদের মতে আবেগের সময় দেহে রাসায়নিক ক্ষরণের ফলে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তা দমন করা অস্বাস্থ্যকর। এই শক্তিকে গঠনমূলক কাজে লাগানোর পক্ষে জোরালো মত মনোবিজ্ঞানীদেরও। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্রোধ দমনের ফলে শিশু তার খেলনা, পুতুল বা অন্য শিশুদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। অনেকে আবার শিশুসুলভ আচরণে ফিরে যায়, যাকে Regression বলে। যেমন: বিছনা ভিজানো, আঙ্গুল চোষা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা ইত্যাদি। শিশুকে জীবন উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সব ধরনের আবেগ অনুভূতি অভিজ্ঞতা দেয়া উচিত। Hurlock বলেছেন- Having an opportunity to experience all kinds of emotions and learning how to cope with them provide a mental health insurance---a psychological protection against life's hazards. দেখা গেছে, যে সকল শিশুদের সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ ভালো হয় তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতেও দক্ষতা প্রদর্শনে পারদর্শী হয়-সহজেই ধারণা ও অনুভূতির প্রকাশ করতে পারে। অন্যদের প্রতি সমানুভূতিশীল হয়, হতাশা এবং ভালো না লাগাগুলো সহজেই মানিয়ে নিতে পারে, আত্মবিশ্বাসী হয়, সহজেই বন্ধুত্ব গড়তে এবং তা বজায় রাখতে পারে; সর্বোপরি বিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জন করে।

২.৭ ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ (Language and Communication Development)

পৃথিবীর এক এক দেশের শিশুরা এক এক ভাষায় কথা বলে। মূলত: শিশুরা জন্মগত ভাবেই ভাষা শেখার দক্ষতা নিয়ে জন্মায়। ভাষা শিশুর যোগাযোগ, প্রকাশ এবং অনুভূতির বিকাশকে সহায়তা করে। এছাড়াও শিশুর চিন্তন, সমস্যার সমাধান এবং সম্পর্ক স্থাপনেও সহায়তা করে। ভাষা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে বোধগম্যতা, শব্দের ব্যবহার এবং শব্দগুলোকে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতার সাথে তা ব্যবহার করা। সাক্ষরতা এবং পড়া-লেখার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ভাষা বুঝতে পারা ও প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন।

ভাষার উপাদান

শিশুর ভাষার বিকাশে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা বুঝতে পারা এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা। রিসেপটিভ ল্যাংগুয়েজ বা বোধগম্য ভাষা বলতে বোঝায়- বুঝতে পারা অর্থাৎ শব্দ ও বাক্যের বোধগম্যতা এবং এক্সপ্রেসিভ ল্যাংগুয়েজ অর্থাৎ প্রকাশিত ভাষা বলতে বোঝায়- ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা। ভাষার দু'টি উপাদানেই নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

১. **ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology):** ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ উচ্চারণ প্রক্রিয়াই হলো ফোনোলজি। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনি রয়েছে। কেউ যদি নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিখতে চায় তবে তাকে সেই ভাষার ধ্বনির সাথে

পরিচিত হতে হবে। শিশুরা ধীরে ধীরে এ ধ্বনিগুলো বুঝতে পারে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করে।

২. **শব্দঅর্থতত্ত্ব (Semantics):** ভাষার অর্থ নির্দিষ্ট হয় অনেক কিছু দিয়ে। সিমেন্টিকস্ হল শব্দের অর্থ ও শব্দের মিলন, এর সাথে শব্দের গঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত (অতীত, বর্তমান, একবচন, বহুবচন) এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের গঠন এর সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারাকেই সিমেন্টিক বলে। এ পর্যায়ে শিশুরা ব্যবহৃত নতুন শব্দের সঠিক অর্থ বুঝতে শেখে।
৩. **বাক্যতত্ত্ব (Syntax):** বাক্যের গঠনসংক্রান্ত বিদ্যার নাম বাক্যতত্ত্ব। এখানে পদক্রমের আলোচনার প্রধান সিনটেকস্ হল বাক্যের অনুক্রম। যেমন: ইংরেজিতে sub+verb+object বসিয়ে বাক্য গঠন করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুরা যোগাযোগের জন্য সঠিক শব্দযোগে রীতিবদ্ধভাবে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করতে পারে, যা ভাষা বিকাশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
৪. **প্রয়োগবিজ্ঞান (Pragmatics):** এটা হল ভাষার সেই দিকটি যেখানে ভাষার অলিখিত অর্থ-কখন, কিভাবে, এবং কাকে বলা হচ্ছে তার ওপর অর্থ বা পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর করে। অর্থাৎ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দক্ষতার সাথে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাই হলো প্রেগমেটিকস্। এ পর্যায়ে শিশুরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে শ্রোতার জ্ঞান, আগ্রহ অনুযায়ী কথপোকথন করতে শেখে। মন্টেসরির মতে, ২-৫ বছরের শিশুদের শব্দসম্ভারে যথেষ্ট উন্নতি হয়। শব্দ উচ্চারণে যেমন পরিপক্বতা আসে, তেমনি শিশুর প্রকাশ ক্ষমতায় দক্ষতা আসে। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে, অন্যের সাথে যোগাযোগের উন্নতি হয়, এতে ভাষার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিশুর বাক শক্তির অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হচ্ছে অন্য শিশুর উপস্থিতি তাকে কথা বলতে উদ্বীকিত করে। এ বয়সী শিশুরা অন্যের সম্পর্কে যখন বলে তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যের দোষ ত্রুটি ধরে বা নালিশ করে। এর পরেই শিশু একবার কথা বলতে শুরু করলে অনর্গল বলতে থাকে। ৩/৪ বছরের শিশু প্রায় ১৫০০-২০০০ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। স্কুল ও বইপত্রের প্রভাবে শিশু বিভিন্ন রঙ, সংখ্যা, গণিতের অংশ, সময় ইত্যাদির সাথে জড়িত অর্থবহ শব্দ শেখে। গুপ্ত শব্দ, সাংকেতিক শব্দ, অনাকাজিক্ষিত শব্দ যেমন- গালি ইত্যাদি অন্য শিশুর সাথে দলের মধ্যে থেকে শিখে। শিশুর ব্যবহৃত শব্দ জটিল থেকে জটিলতর হয়। শিশুর মধ্যে সমালোচনা, প্রশ্ন, নাটকীয় অনুকরণ, উত্তর, সামাজিক প্রশংসা, তথ্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। বিদ্যালয়গামী শিশুরা বিশেষ বস্তু, পরিস্থিতির নামকরণ, বস্তুর শ্রেণীকরণ যেমন- জীবজন্তু, যানবাহন, শব্দের ব্যাকরণজনিত বৈশিষ্ট্য: যেমন- গতকাল হয়েছিল, আগামীকাল হবে এবং ঘটনা ও বস্তুর বর্ণনাজনিত গুণাগুণ প্রকাশ করতে পারে। ৪/৫ বছরের শিশুদের শব্দের ভান্ডার ১২০০০-১৫০০০ হয় এবং তাদের কথার শতকরা ৮০ ভাগই পরিচিতরা বুঝতে পারে। ৪ বছরের শেষে ভাষার বিকাশ সম্পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে। এসময় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভাষার নামের সঙ্গে তাদের ভাষার পার্থক্য শুধু স্টাইলে, ব্যাকরণে নয়। ৫-৬ বছরের শিশুরা তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের পারদর্শিতা অর্জন করে।

শিক্ষকের করণীয়

প্রচুর পরিমাণে খেলা, গল্প বলাসহ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজের বর্ণনার মাধ্যমে শিশুর কথা ও ভাষার বিকাশকে সহায়তা করা এবং ক্রমান্বয়ে জটিল ভাষার ব্যবহারে উৎসাহিত করা। শিক্ষকের মনে রাখতে হবে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ভাষার বিকাশকে প্রভাবিত করে- সামর্থ্য, কারণ এবং সুযোগ। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর উপযুক্ত পরিমাণ সামর্থ্য রয়েছে কিনা, কেন কথা বলবে-কথা বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কিনা? কথা বলার যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ রয়েছে কিনা? উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়েই শিক্ষককে সুনজর দিতে হবে।

যোগাযোগ

'All behavior communicates'-জন্মের পর মূহুর্তে শিশু কাঁদে এবং মা প্রতিক্রিয়া করে অর্থাৎ শিশুর প্রথম শব্দ বলার অনেক আগেই যোগাযোগ শুরু হয়। যোগাযোগ বলতে বুঝায় যুক্ত হওয়া বা সেতু বন্ধন, যা কিনা মানুষের মৌলিক চাহিদা। আমরা সারাদিন একজন আরেক জনের সাথে যোগাযোগ করি। যোগাযোগের মাধ্যমেই সংযোগ সাধিত হয়। সুতরাং সংযোগ স্থাপনই হল যোগাযোগ। যোগাযোগ ছাড়া চারপাশের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বা পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়া যায় না। চিন্তা,ধারণা,তথ্য এবং বার্তা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে প্রেরণ করার প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ বলে। সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ বিকশিত হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম হলো ইন্দ্রিয়সমূহ অর্থাৎ দৃষ্টি, শ্রাবণ, স্পর্শ, শব্দ।

শুধু ভাষা নয় বরং একজন মানুষ আরেক জনের সাথে যত রকম উপায়ে যোগসূত্র স্থাপন করে, তার সবই যোগাযোগের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ যোগাযোগ মৌখিক ও অমৌখিক হতে পারে। দেহভঙ্গিমা যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক যোগাযোগ সংঘটনের জন্য প্রয়োজন একজন ব্যক্তির, যার সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং একটি বিষয়, যার উদ্দেশ্যে কথা বলা হবে। যোগাযোগের জন্য যে সকল দক্ষতাগুলো প্রয়োজন তাহলো:

১. খেলা: শিশু নিজের হাত পা দিয়ে খেলে। এই শব্দ শুনে সে আনন্দ পায়। বয়সের সাথে সাথে খেলার মধ্য দিয়ে অনেক জটিল এবং কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করে।
২. শোনা: শিশু খেলতে খেলতে বিভিন্ন আওয়াজ বা শব্দের প্রতি মনোযোগী হয়। শব্দের বিভিন্নতা বুঝতে পারে।
৩. অনুকরণ করা: জীবনের শুরুতেই মা এবং যত্নকারী শিশুর আওয়াজ অনুকরণ করেন। শিশুটিও তাদের অনুকরণ করে। খেলার ছলে অনুকরণ করা পালাক্রমে রূপ নেয়।
৪. পর্যায়ক্রমিক পাল্লা: একটু পরিপক্ব হলে শিশু কাঠামোবদ্ধভাবে পালাক্রম অনুসরণ করে যোগাযোগ করতে পারে।
৫. মনোযোগ: জন্মের পর শিশু মায়ের মুখের দিকে তাকায়, খেলতে খেলতেই শিশু আকর্ষণীয় জিনিসের প্রতি, উচ্চ শব্দ, চলমান জিনিসের প্রতি মনোযোগী হয়। অর্থাৎ শিশুর মনোযোগের পরিসর বাড়ে।

৬. বোধশক্তি: মনোযোগ সহকারে দেখা, শোনার ফলে শিশু বিষয়টি বুঝতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধারণার পরিসর বাড়ে।
৭. শব্দহীন যোগাযোগ/ দেহভঙ্গি: শুরুতে কান্নার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ শুরু হয়-মা শিশুর কান্নায় সাড়া দেন। এই যোগাযোগ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আরও পরিশীলিত করে শিশু যোগাযোগ করে।
৮. কথা: সবশেষে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী পন্থায় অর্থাৎ কথার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে শেখে।
৯. যোগাযোগ শিশুকে বন্ধুদের সাথে, পরিবারে কার্যকরী আন্তঃসম্পর্ক তৈরিতে এবং জীবনকে সহজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

২.৮ অভিযোজন/ আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ (Self-help)

শিশুর নিজস্ব পরিবেশে স্বনির্ভরভাবে কাজ করাকে বুঝায়। এটা বিকাশমান, যা শিশু বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে অর্জন করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা আরো জটিল হয়, কারণ পরিবার এবং সমাজের প্রত্যাশা বাড়তে থাকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আত্মনির্ভরশীলতার মূল্যায়ন হয় অন্যের প্রত্যাশা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে। বিকাশের সাধারণ নীতি রয়েছে কিন্তু আত্মনির্ভরশীলতার দক্ষতা সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত। সমাজের মানুষ নির্ধারণ করে কোন নির্দিষ্ট বয়সে শিশুর কোন কোন দক্ষতায় পারদর্শী হওয়া উচিত। পুরো বাল্যকাল ধরে শিশু আত্মনির্ভরশীলতার দক্ষতা অর্জন করে। বিকাশের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে আত্মনির্ভরশীলতার দক্ষতা অর্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। আত্মনির্ভরশীলতার একেকটি দক্ষতা অর্জন শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদার অনুভূতি জাগায় এবং মা-বাবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খুশি হয়- যা তাকে শিখতে আরো উৎসাহী করে। এ সময় ধৈর্য সহকারে নমনীয়ভাবে নির্দেশনা দান শিশুর দক্ষতা অর্জনে অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন এবং তার আশেপাশের অন্যান্যদের দেখে শিশু নিজে একটু একটু করে কাজ করতে শেখে যেমন-খাওয়া, নিজে কাপড়-চোপড়, জুতা পরা খোলা, নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্রাব পায়খানা করা, গোসল করা, বইখাতা, চেয়ার-টেবিল বিছানা ইত্যাদি গুছিয়ে রাখা। এ সকল দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু ক্রমান্বয়ে নিজের কাজগুলো নিজে নিজে করতে শিখে যায় এবং পরনির্ভরশীলতা কমে যায়। মূলত: আত্মপ্রাধিকার থেকে আত্মপ্রকাশের চাহিদা, আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাংক্ষা জাগে। এই সময় ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে। পরনির্ভরশীল না হয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করার ইচ্ছা প্রবল হয়। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন তড়িত করে। এগুলোই শিশুর আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ। নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো শিশুকে না শিখালে শিশু প্রতিটি কাজের জন্য অন্যের গলগ্রহ বা বোঝা হয়ে থাকবে। জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে যা কারো কাম্য নয়। নিজের কাজ নিজে করতে পারার আত্মতৃপ্তিই আলাদা এবং আত্মনির্ভরশীলতা পরিবার ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। মা যখন বিছানা করেন তখন তার ৫ বছরের শিশু তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, এ সময়টাকে মা কাজে লাগাতে পারেন। চাঁদর তোলা, বালিশ সরানো বা চাঁদর বিছাতে তার সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে শিশুকে আস্তে আস্তে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে নিজের বিছানা প্রস্তুত করা শেখানো

যায়। প্রতিটি কাজেই শিশুর সহযোগিতা চেয়ে বিভিন্ন কাজে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা সম্ভব।

২.৯ খেলার দক্ষতা উন্নয়ন (Play Skill development)

খেলার মাধ্যমে শিশু নিজেকে ও নিজের চারপাশকে আবিষ্কার করে। খেলা হলো প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষুদে শিশুদের ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনের জন্য তৈরি হবার কৌশল (Carl Gross)। খেলার মাধ্যমেই মানব শিশুর অন্তর্নিহিত প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত ও প্রকাশিত হবার সুযোগ ঘটে। শিশুর বিকাশে খেলা যে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তা কিডারগার্টেন পদ্ধতির জনক ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবল (১৮৯৬) দৃঢ়স্বরে বলেছেন। শিশুর জন্য খেলা স্বাভাবসুলভ ও আনন্দদায়ক কাজ। সৃজনশীল খেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশুরা সঞ্চালনমূলক, ভাষা, বোধ বা বুদ্ধি এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে।



চিত্র: শিশু বিকাশের ক্ষেত্র

পিয়াজের (১৯৫১) মতে, খেলা হলো একটি উপযোজনমূলক কার্যাবলি। খেলা শুরু হয় ইন্দ্রিয় পেশীর স্তরে- যখন শিশুরা সেই সকল কাজগুলো বার বার করে যেগুলোর মাধ্যমে তারা তৃপ্তি এবং আনন্দ পায়। গার্ডি (১৯৭৭) মন্তব্য করেছেন যে, খেলা হলো শিশুকালের অতিসাধারণ একটি বিষয় যার মাধ্যমে শিশুর আত্মধারণা, যোগাযোগের মৌখিক এবং অমৌখিক, বুদ্ধি, ভৌত ও সামাজিক পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হতে থাকে। রজার

এবং সোয়ার (১৯৮৮) তাঁদের মতে, খেলার মাধ্যমে কমপক্ষে ৯ বছর পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধি সংগঠিত হতে থাকে। কারণ শিশুর সব আচরণের উপর খেলার প্রভাব পড়ে। খেলা বিকাশ ও শিখনের একটি কার্যকরী বাহন। ফ্রস্ট (১৯৯২) বলেছেন, খেলা হলো শিশুর চিন্তা-কল্পনা, বুদ্ধি, ভাষা, সামাজিক দক্ষতা এবং প্রত্যক্ষ-পেশীসঞ্চালন দক্ষতা বিকাশের প্রধান উপায়।

শিশুরা যখন খেলায় নিয়োজিত হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মেই চলাফেরা (movement), রঙ, আকৃতি, বুনন (texture), রূপ (form), সাইজ, ভাষা, নিয়ম (rules and regulation), সামাজিকীকরণ (socialization) ইত্যাদি বিষয়গুলো শিখে যায়। একটি শিশু সঞ্চালনমূলক খেলার মাধ্যমে (motor play) নড়াচড়া, লাফ দেয়া, বল ছোড়া, দড়ি লাফ, তিনচাকার রিক্সা চালানো, মালগাড়ী (চার চাকার) এবং খেলার মাঠের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে খেলতে শিখে। অন্যদের সাথে খেলার মাধ্যমে ভাষা শেখে; বিভিন্ন জিনিসের নাম, ছড়া, কবিতা, গল্প, ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে। ছোট বেলায় সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬-৯ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের পেশী সঞ্চালন, ভাষা, সামাজিক দক্ষতা ইতিমধ্যেই হয়ে যায়-এসময় তারা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের আরো সুনিপুণ করতে আগ্রহী হয়। তারা নিজেরা নিজেদের মত করে যখন রঙের ব্যবহার করে, গণনার খেলা খেলে, আকৃতি মিলায়, হাঁড়ি পাতিল নিয়ে খেলে এবং বিভিন্ন জিনিস শ্রেণিকরণ ও দলকরণ করে, তখন এসবের মাধ্যমে বোধ ও চিন্তার দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

সামাজিক দক্ষতার বিকাশ হয় অন্যান্য শিশুদের সাথে বাড়ি-বাড়ি, রান্না-বান্না, অন্যান্য দলগত খেলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। খেলার চাহিদা জন্মগত। সব শিশুই খেলতে চায়। সব শিশুকেই খেলতে হবে। শিশুর বিকাশে খেলার তাৎপর্য স্বীকার করেছেন প্রাক শৈশবকালীন শিক্ষাকাজে নিয়োজিত শিক্ষকগণ ও গবেষণা কার্যে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের মতে, খেলা শৈশবকালীন শিক্ষাকার্যক্রমের একটি অনস্বীকার্য অংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের পেশী সঞ্চালন, ভাষা, সামাজিক দক্ষতা ইতিমধ্যেই হয়ে যায়, এসময় তারা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের আরো সুনিপুণ করতে আগ্রহী হয়, বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানের, বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে তারা তাদের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে নিজেরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়।

৯-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে চিন্তার দ্রুততা ও দক্ষতা বাড়ে। আবেগের ভারসাম্য আসে, পরিকল্পনা ও সমস্যার সমাধানের দক্ষতা বাড়ে এবং নেতৃত্বের গুণাবলির সংমিশ্রণ ঘটে। এ বয়সের খেলা অনেক বেশি পরিশীলিত ও প্রতীকী হয়। খেলার মূখ্য উদ্দেশ্য মজা করা বা আনন্দ পাওয়া হলেও এর মধ্য দিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখন ঘটে।

অভিভাবক ও শিক্ষকের করণীয়

প্রচুর পরিমাণে ইনডোর আউটডোর খেলার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। খেলাধুলার মধ্যে থাকলে শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ/ ভাল থাকে, প্রাজ্ঞ থাকে, বন্ধুত্ব বাড়ে ফলে সামাজিকতা বাড়ে, সহমর্মিতা বাড়ে এবং একের

প্রতি অন্যের দায়বদ্ধতা বাড়ে। এ ধরনের শিশুরা একে অপরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং এর ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরির শক্তি ভিত রচিত হয়।

২.১০ বিলম্বিত বিকাশ

কোন বিশেষ কারনে একটি শিশু যদি তার সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে পিছিয়ে পড়ে তবে ঐ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার আচরণিক সমস্যা তৈরী হবে। যেমন: বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লে বুদ্ধি করে কথা বলতে পারবে না বা কাজ করতে পারবে না। শারীরিক বিকাশে বিঘ্ন হলে জিনিস ধরতে, তুলতে, নিতে- দিতে পারবে না, হাঁটা চলায় সমস্যা হবে। ভাষা যোগাযোগে পিছিয়ে পড়লে কথা বলা, ভাব বিনিময়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে। নিজের প্রয়োজন বুঝতে পারবে না, ফলে জীবন অনেক বেশি স্থবির হয়ে পড়বে। শিশু তার বয়সের সাথে সাথে সমাজ উপযোগী আদব-কায়দা, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম করছে কিনা। যদি না করে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শিশুসুলভ খেলাধুলা ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শেখানোর ক্ষেত্রে অনেক কৌশলী হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে শিশু যাতে খুব আবেগ প্রবণ না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই তার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ও বয়সোপযোগী আচরণের মাধ্যমে আবেগের নিয়ন্ত্রণ শেখাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুকে শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগিতা বা দুষ্কৃতির কারণে শিক্ষক যদি বকুনি দেন, তাহলে শিশু যেন তা শোধরানোর পরিবর্তে প্রতিক্রিয়া হিসেবে কান্নাকাটি না করে। আবার, খেলার সময় অন্য কোন সহপাঠী যদি শিশুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাহলে সেও যেন ঐ সহপাঠীর সঙ্গে বিরূপ আচরণ না করে বরং শিক্ষকের সাথে বিষয়টি আলাপ করে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিশুরা যেন কথায় কথায় শিক্ষকের কাছে এ ধরনের অভিযোগ করার প্রবণতা না দেখায়।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিশুকে জীবন উপযোগী করে তোলা। সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই শিশুর নিজের প্রয়োজনেই অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশু একটি বিষয়ে পিছিয়ে গেলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

২.১০.১ বিলম্বিত বিকাশের ক্ষেত্রে করণীয়

১. শিশুর বয়স, সামর্থ্য ও আগ্রহ বা অনুরাগ, ভাল লাগা, মন্দ লাগা অর্থাৎ শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বুঝা;
২. শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা;
৩. শিশুর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা;
৪. প্রতি বিষয়ে বা কর্মকাণ্ডে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৫. শিশুর পরিবেশকে অনেক বেশি উদ্দীপনাময় করা; যাতে শিশুর বিকাশের সবগুলো ক্ষেত্রের পরিচর্যা বা অনুশীলন হয় সে দিকে দৃষ্টি দেয়া। সমন্বিত উদ্দীপনা না পেলে শিশুর বিকাশে ভিন্নতা দেখা দেবে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিত্বে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিবে;

৬. শিশুর যেহেতু মনোযোগের পরিসরের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই শিশুর প্রয়োজন অনুসারে উপযোগী উদ্দীপকের দ্বারা বারবার, বিভিন্নভাবে একটি বিষয় অনুশীলন করানো প্রয়োজন;
৭. খুব কম মানুষই একা একা সব কাজ করতে পারে। একটু সহায়তা পেলে কাজ করা সহজ হয়। এক্ষেত্রেও শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করতে হবে;
৮. কর্মসম্পাদনের অব্যবহিত পরেই পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা (যে কোন ধরনের পুরস্কার- মৌখিকভাবে ভালো বলা, আদর, স্টার, চকলেট);
৯. যতদূর সম্ভব যে কোন ধরনের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকা;
১০. শিশুর বেড়ে ওঠা বা শিখনের জন্য শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা;
১১. অনেক উপকরণের মজুদ রাখা, যাতে শিশুর চাহিদা মোতাবেক/ অনুযায়ী তা সরবরাহ করা যায়;
১২. শিশুর সকল কর্মকাণ্ড বন্ধুসুলভ ভাবে মনিটরিং করা;
১৩. বিকাশের ক্ষেত্রগুলো যদি সঠিকভাবে বিকশিত হয় তবে শিশুর বিশ্বস্থতার জায়গাটি সুদৃঢ় হয়, আত্মধারণা তৈরী হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অন্যদিকে যদি বিকাশের ক্ষেত্রের কোন একটিতে ছন্দপতন ঘটে তবে শিশুর ব্যক্তিত্বে অসংগতি সৃষ্টি হয়। (বিলম্বিত বিকাশ বোঝার জন্য সংযুক্তিতে পরিশিষ্ট-১ এ স্বাভাবিক বিকাশের মাইল ফলক দেখুন)।

২.১১ লেভ ভিগট্‌স্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব (Soiocultural theory)

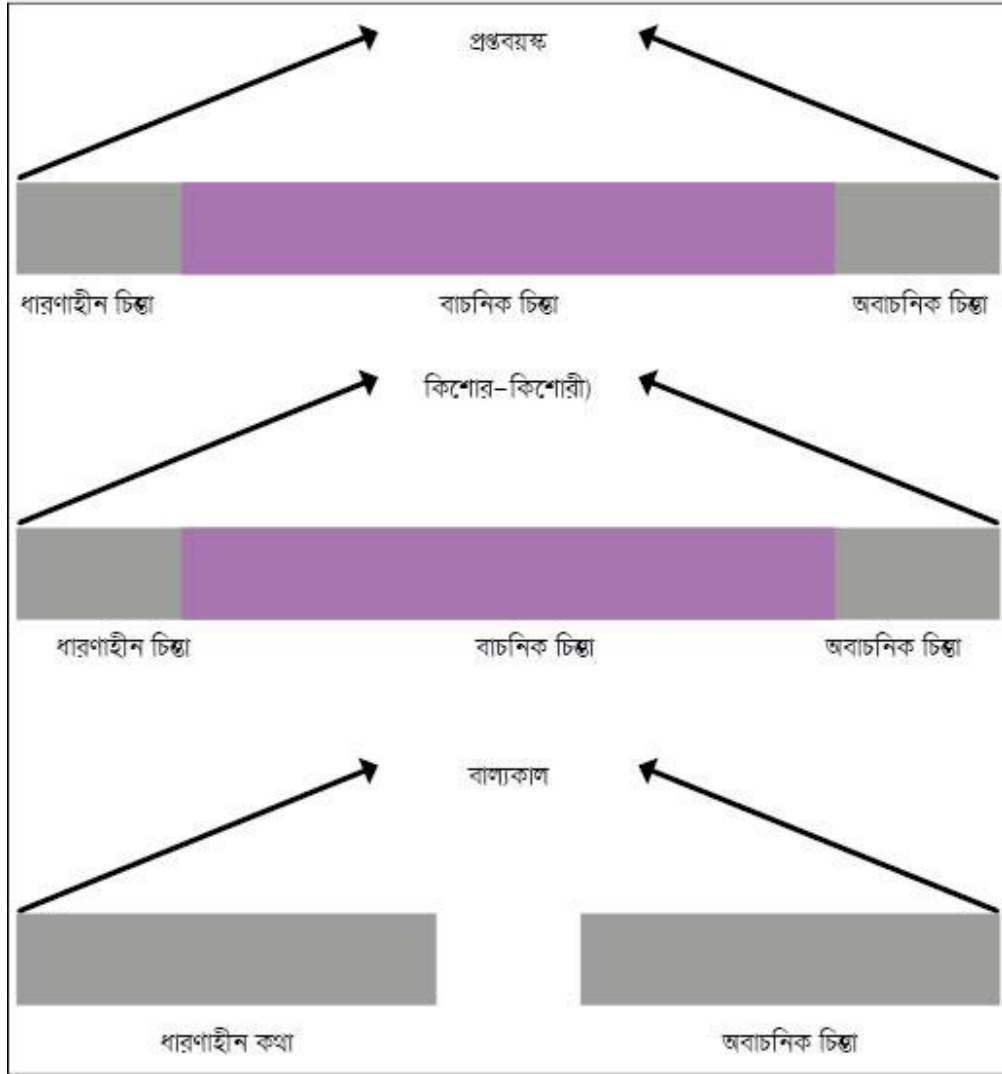
বিখ্যাত সমাজ-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ লেভ সেমিওনোভিচ ভিগট্‌স্কি (১৮৯৬-১৯৩৪) সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্বের (theory) প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে ‘বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ’। তাঁর মতে, চিন্তন (thinking) এবং শিক্ষণ (learning) শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ (inner) এবং স্বতন্ত্র (individual) প্রক্রিয়া নয়। এগুলো সাধারণত: বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ, ভাষা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (social interaction) এবং সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংস্কৃতি অর্থাৎ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, দক্ষতা, সামাজিক দল বা গোত্রের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি কিভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয় সেই বিষয়ের ওপরই ভিগট্‌স্কি তার মানব বিকাশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্বে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের পূর্ণবয়স্ক জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকেই বুদ্ধিবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং দক্ষতাসমূহ সামাজিক উপায়ে শিশুদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতামূলক কথোপকথন অত্যন্ত জরুরি। শিশুরা ভাষার ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথেই অন্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয় এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশকে তিনি অপেক্ষাকৃত সক্ষম শিশুর সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মেলামেশা বা আদান-প্রদানের ফলাফল হিসেবেও দেখেন। লেভ ভিগট্‌স্কির তত্ত্বের আলোকে, শিশুকে আমরা একজন ‘খুদে সামাজিক বিজ্ঞানী’ হিসেবে অভিহিত করতে পারি, যেখানে পিয়াজের তত্ত্বের আলোকে শিশুকে শুধু ‘খুদে বিজ্ঞানী’ বলা হয়েছে।

ভিগটস্কি লক্ষ্য করেছেন যে কিছু কিছু কাজ শিশুদের জন্য একা করা বেশ কষ্টসাধ্য কিন্তু সেই কাজটিই কোনো পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অথবা একজন অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষ শিশুর সহায়তা নিয়ে তারা সহজে করতে পারে। শিশুর জ্ঞানের এই দুইটি পর্যায়ের ব্যবধানকে তিনি ‘বিকাশের নিকটবর্তী অঞ্চল (zone of proximal development) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জোন অব প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্টের সর্বনিম্ন পরিসীমা হলো সমস্যা সমাধানের সেই স্তর যেখানে কোনো শিশু একা একা কাজ করে পৌঁছাতে পারে। আর সর্বোচ্চ পরিসীমা হচ্ছে বাড়তি দক্ষতার স্তর, যেখানে শিশু তার নিজের থেকে অধিক দক্ষ কোনো ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে কাজ করতে পারে। যখন শিশু কোনো বিমূর্ত (abstract) সমস্যা সমাধান করে তখন তারা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তবে ভিগটস্কি বরাবরই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ভাষা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (social interaction) এবং বৃহত্তর সমাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, শিশুরা অবাচনিক (non-verbal) এবং ধারণাহীন চিন্তা এ দুই ধরনের ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়ায় জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। তত্ত্বটি বুঝার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ধারণার প্রয়োজন—

১. অবাচনিক চিন্তা (non-verbal): এটি হলো প্রাথমিক স্তরের একটি মানসিক ক্রিয়া, যেখানে শিশু কোনো ঘটনা বা বস্তুকে দেখে, ভাষা ব্যবহার করে না।
২. বাচনিক চিন্তা (verbal): ভাষা এবং চিন্তা শিশুকে সুসংহত হতে এবং পরস্পরকে জানতে সহায়তা করে। বাচনিক চিন্তা জটিল ধারণাগুলো শেখার ক্ষমতা গঠন করে।
৩. ধারণাহীন কথামালা: এটি হলো প্রাথমিক স্তরের একটি ভাষা, যেখানে শিশু কোনো কিছুর অর্থ চিন্তা না করেই শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে। যা পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ধারণাগত শব্দ হিসেবে তৈরি হয়।
৪. স্বপরিচালিত কথামালা: অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা কোনো কিছু শিখার জন্য ভাষা ব্যবহার করে। এ সময় শিশুরা নিজের সাথে কথা বলে, প্রায়ই জোরে শব্দ করে কথা বলে।
৫. স্কাফোল্ডিং (Scaffolding): ভিগটস্কির তত্ত্বের “স্কাফোল্ডিং” শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ আবিষ্কার হিসেবে দেখা হয়। যেখানে শিশুর সাথে সরাসরি বড়দের কাজ করার বা সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে, স্কাফোল্ডিং হলো শিশুর কোনো সমস্যার সমাধান বা উত্তরণের জন্য প্রদত্ত ধারাবাহিক সহায়তা, যা শিশুর অবস্থান বুঝে ধাপে ধাপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হয়। শিখনের ক্ষেত্রে শিশুর অবস্থান বুঝে শিক্ষক বা বড়দের দ্বারা অথবা অপেক্ষাকৃত সক্ষম সঙ্গীর দ্বারা বিভিন্ন অবস্থায় স্কাফোল্ড করা হয়। শিক্ষক (প্রাপ্তবয়স্করা) শিশুকে পরোক্ষভাবে সূত্র, ইঙ্গিত, উপকরণ এবং পরিবেশ দিয়ে ও প্রশ্ন করে সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন, কিংবা সমস্যার সরাসরি সমাধান করে দেবেন, অথবা তাদেরকে সুযোগ করে দেবেন নিজে থেকে সমস্যাটির সমাধান করতে পারার, যার পুরোটাই নির্ভর করবে শিশুর বিকাশের অবস্থানের ওপর। তবে, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ধারণা বা দক্ষতা অর্জনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই মুখ্য হবে, তাকে কোনো কাজ সরাসরি করে দেয়া নয়।

৬. বিকাশের নিকটবর্তী অঞ্চল (Zone of Proximal Development): কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যা যখন শিশুর সামর্থ্য বা চিন্তা ক্ষমতার কিছুটা ওপরের স্তরে থাকে তখন শিক্ষক বা পিতা-মাতা অথবা অপেক্ষাকৃত সক্ষম সাথি ইশারা, ইঙ্গিত, উপকরণ, সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বা প্রশ্ন করে নিজে থেকে সমাধান খুঁজে পেতে শিশুকে সহায়তা করেন। এই অবস্থাকে ভিগটস্কি বলেছেন, ‘জোন অব প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট’। ভিগটস্কির তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো Zone of Proximal Development (ZPD)। শিশুর একা কোনো কাজ করার সামর্থ্য এবং অন্যের সাহায্য নিয়ে কাজ করার সামর্থ্যের মধ্যে যে এলাকা বা স্তর তা-ই Zone of Proximal Development। শিশুর শিখনকে যদি একটি স্কেলের সাথে তুলনা করি, তাহলে এই স্কেলের কোনো একটি পয়েন্টে শিশুর বর্তমান যোগ্যতাগুলো (current abilities) আছে, যা সে নিজে নিজে সম্পন্ন করতে পারে। আর এর ওপরে আরো কিছু যোগ্যতা আছে, যা শিশুর সামর্থ্য বা চিন্তা শক্তির কিছুটা ওপরে (potential abilities), যা সে একা একা করতে পারে না। কিন্তু যদি পিতা-মাতা বা শিক্ষক সূত্র ধরিয়ে দেন বা প্রশ্ন করে সমাধান খুঁজতে সাহায্য করেন, তবে সেই কাজগুলো শিশুর জন্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে। শিশুর current abilities and potential abilities-এর মধ্যবর্তী যে এলাকা বা যে দূরত্ব, এটাই জোন অব প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট। ভিগটস্কির মতে, এই জোনের মাঝেই শিশুর শিখন ঘটে এবং এই জোন সর্বদা পরিবর্তনশীল।

ভিগটস্কির তত্ত্বানুযায়ী বিকাশের ধাপগুলোকে নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:



২.১১.১ প্রাক-শৈশবকাল

ভিগটস্কির মত অনুযায়ী, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে শিক্ষক ও পিতা-মাতা শিশুর শিখন প্রক্রিয়া বা তার চিন্তন প্রক্রিয়াকে ভাষা এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করতে পারেন। এই অবস্থাটিকে ইংরেজিতে স্ক্যাফোল্ডিং বলে, যাকে আমরা রাজমিস্ত্রি ও তার জোগানদাতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এক্ষেত্রে শিশু হলো রাজমিস্ত্রি আর শিক্ষক এবং বাবা-মা হলো জোগানদাতা। ভিগটস্কি বলেছেন, শিশু যখন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হবে তখন তাকে নিজ থেকেই সেটি সমাধানের সুযোগ দিতে হবে। কারণ শিখন বা সন্তান লালন-পালনের মূল লক্ষ্য হলো শিশুর স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা তৈরি হওয়া। কিন্তু কোনো সমস্যা যদি শিশুর জন্য অনতিক্রম্য হয় সেক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্করা সেটি সমাধান করে দেবেন। আবার সমস্যাটি যদি এমন হয় যে একটু সূত্র ধরিয়ে দিলেই শিশু নিজের মতো করে সমস্যাটির সমাধান করতে পারবে সেক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব হলো ইঙ্গিত দেয়া বা সূত্র ধরিয়ে দেয়া। শিশুর শিখন-চাহিদার ওপর নির্ভর করেই সে অনুযায়ী স্ক্যাফোল্ড করতে হবে।

২.১১.২ শিশুর শিখনে এ তত্ত্বের প্রভাব ও শিক্ষক হিসেবে করণীয়

কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যা যখন শিশুর সামর্থ্য বা চিন্তা ক্ষমতার কিছুটা ওপরের স্তরে থাকে তখন শিক্ষক ও পিতা-মাতা সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বা প্রশ্ন করে নিজে থেকে সমাধান খুঁজে পেতে শিশুকে সহায়তা করবেন। শিশুর শিক্ষা ও বিকাশে এ তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বেশিরভাগ গবেষক এ তত্ত্বটিকে শিশুর বিকাশে সরাসরি কাজের তথা শ্রেণিকক্ষে বা বিভিন্ন পরিবেশে শিশুর সাথে কাজ করাকে উৎসাহিত করেছে বলে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। কারণ, একজন শিশু শুধু নিজের বয়স ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কোনো ধারণা অর্জন করে না; এর জন্য তার বড়দের ধারাবাহিক সহায়তার মাধ্যমে তা সম্ভব হয় (স্ক্যাফোল্ডিং)। এ সহায়তা ছাড়া জ্ঞান অর্জনের চরম পর্যায়ে তাদের পক্ষে অনেক সময় পৌঁছানো সম্ভব হয় না। শিশুর প্রতিটা পর্যায়ে বিকাশের বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্তর রয়েছে। তাছাড়া, একটি বিশেষ বিষয়েও সে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না যদি তুলনামূলকভাবে সক্ষম সঙ্গী বা বড়দের ধারাবাহিক সহায়তা (স্ক্যাফোল্ডিং) না পায়। শিশুদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাকে এখানে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। একজন শিশু বিশেষ কোন স্তরে অবস্থান করছে এবং পরবর্তীতে কোন স্তরে যেতে হবে তা জানা জরুরি। এজন্য তার জোন অব প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট (জেপিডি) জানা ও বোঝা একজন শিক্ষক ও যত্নকারীর জন্য আবশ্যিক। আবার, তার অবস্থান অনুযায়ী তাকে স্ক্যাফোল্ডিং করার কৌশল জেনে তার সঠিক প্রয়োগ করাও বেশ জরুরি। সর্বোপরি, একজন শিক্ষক হিসেবে শিশুর শিখন ও বিকাশে কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে এ তত্ত্বের ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

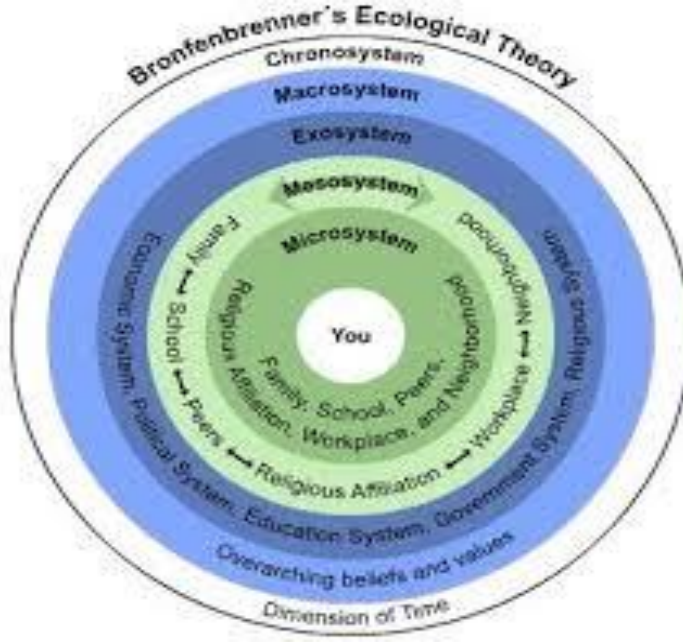
২.১২ ব্রনফেনব্রেনারের বাস্তুসংস্থান তত্ত্ব (Ecological System Theory)

শিশুর শিখন ও বিকাশে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সাধারণত তার নিকট পরিবেশ থেকে শেখে। শিশুর চারপাশের পরিবেশ তার জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। পরিবেশের প্রভাবের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে, গতানুগতিক ধারণা ও তত্ত্বের বাইরে অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী ও কার্যকরী ধারণার উদ্ভাবন করেন ব্রনফেনব্রেনার নামক একজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী। তাঁর এ তত্ত্ব বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্ব (Ecological system theory) নামে পরিচিত। এ তত্ত্বে শিশুকে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে দেখে তাকে সমাজের প্রতিটা স্তর বা সিস্টেম কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং তাঁর আচরণে কি প্রভাব ফেলছে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তার মতে, শিশু শুধু শিশু নয়, সে একটি পরিবারের অংশ, পাড়ার একজন সক্রিয় সদস্য, আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়/ ক্লাব/ দলের) সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও একজন নাগরিক। এই তত্ত্বে শিশুকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রতি জোর দিয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়। আধুনিক যুগে শিক্ষাবিজ্ঞানে এ তত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু তার নিকট পরিবেশ থেকে দেখে বা নিজে বাস্তবে প্রয়োগ করে অনেক কিছু শেখে। বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বের মূল কথা হলো- শিশুর পরিবেশ, পরিবেশের বিভিন্ন সদস্য ও উপাদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বৃহত্তর সমাজ ও এগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান সিস্টেম শিশুর শিখন ও বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। বাস্তু সংস্থান তত্ত্বটি সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল। এ তত্ত্ব শিশুর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও পরিবেশের ভিন্নতাকেই গুরুত্ব দেয় না, বরং তত্ত্বটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব

দিয়ে থাকে। শিশুর বিকাশে পরিবেশের এই প্রভাবকে এ তত্ত্বে খুবই সুসংগঠিতভাবে দেখানো হয়। বর্তমান যুগে এ তত্ত্বটি শিশু শিক্ষায় বেশ গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

তত্ত্বটিতে মানব উন্নয়নের ধারাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পরিবার, স্থানীয় সামাজিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম (রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন) রাষ্ট্র এবং বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী শিশু যে পরিবেশে বাস করে তার একটি প্রভাব তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পড়ে থাকে। এখানে পরিবেশ বলতে শুধু শিশুর পারিবারিক পরিবেশের কথা বলা হয়নি বরং তার চারপাশে যে পরিবেশ সেগুলোকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন-তার পরিবার, সহপাঠী ও খেলার সাথী, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন এবং নানা ধরনের সেবায়মী প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, যা তাকে প্রভাবিত করে। পারিবারিক পর্যায়ে যেমন-ভাইবোনের আচরণ, বাবা-মায়ের নির্দেশনা তাকে ভালো আচরণ বা নিয়মিত বিদ্যালয়ে হাজির হতে প্রভাবিত করছে; তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আইন বা বিধি (বিদ্যালয়ে শিশুদের কোনো শাস্তি প্রদান করা যাবে না, নির্দিষ্ট বয়সে টাকা দেয়া, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও অধিকারের প্রশ্নে) শিশুর শিখন ও বিকাশে প্রভাব ফেলছে, অনুরূপভাবে শিশুর প্রতি বৃহত্তর সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি (রাস্তায়/ মিডিয়াতে/ রাজনীতি/ খেলার মাঠ) শিশুর আচরণ ও বিকাশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বে শিশু তার পরিবেশের সাথে কিভাবে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় ও বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হয় তা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। এ তত্ত্বটি একটি সিস্টেমের বা চক্রের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রনফেনব্রেনারের বাস্তবসংস্থান তত্ত্ব



২.১২.১ বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বের ধাপসমূহ

১. **মাইক্রো সিস্টেম :** এ চক্রের প্রথম স্তরে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব, সকল অভিজ্ঞতা, সকল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সহযোগে মাইক্রো সিস্টেম অংশটি গঠিত। পরিবার, শিশু সেবাকারী এবং সহকারী, বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিশু চিকিৎসাসেবা, সামাজিক সেবা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। শিশুরা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানও শিশু কর্তৃক প্রভাবিত হয়। যেমন-শিশু তার পরিবারের লোকজন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক প্রভাবিত হয়। একইভাবে শিশুর আচরণের ফলে তাদেরও মানসিক পরিবর্তন আসে। শিশুর সামাজিক আচরণ শিক্ষকের নির্দিষ্ট ধরনের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়; একইভাবে শিক্ষক কী করবেন সেটি শিশুর আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
২. **মেসো সিস্টেম :** মাইক্রো সিস্টেমে একজন দ্বারা অন্যজনের প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণেই বাস্তববিদ্যার দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি হয়, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন মেসো সিস্টেম। এর মাধ্যমে একটি সম্পর্কের শক্তি ভিত গড়ে ওঠে। মেসো সিস্টেমে যখন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে দৃঢ় সহযোগিতা এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বানুযায়ী শিশুর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
৩. **এক্সো সিস্টেম :** শিশুর উন্নয়নের ওপর প্রভাবকারী পরিবেশের এই ধাপ (এক্সো সিস্টেম) যা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর সংযুক্তি তৈরি করে, তবে তা শিশুর জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না। কিন্তু, পরোক্ষভাবে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, সরকারি ব্যবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ভাবে শিশুর সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা না করলেও শিশুর পরিবার, পিতা-মাতাকে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সহায়তা

করে, যা পরোক্ষ ভাবে শিশুর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষভাবে শিশুর শিখন ও সার্বিক বিকাশে প্রভাব ফেলে। যেমন-একটি দেশ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করে, কিংবা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বা শিশু অধিকার সম্পর্কে কার্যকরী বিধি-বিধান প্রণয়ন করে, তা শিশুর বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৪. **ম্যাক্রো সিস্টেম :** এটা বাস্তবসংস্থান চক্রের শেষ বা চূড়ান্ত ধাপ। এখানে মূলত সমাজে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আদর্শের দিকগুলোর কথা বলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিশুর উন্নয়নে এর সংশ্লিষ্টতা নেই, কিন্তু বাস্তবে শিশুর সার্বিক উন্নয়নে এর গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-যে সমাজে শিশু নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে শিশু নির্যাতনের ঘটনা কম ঘটে। একইভাবে যে সমাজ বা রাষ্ট্র শিশুর বিকাশের উপযোগী আইন তৈরি করে (শিশুদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া, তার খেলা, কাজকে ও শিখনকে গুরুত্ব দেয়া হয়) সেখানে শিশু যেভাবে বেড়ে উঠবে, যে সমাজে এ ধরনের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নেই সেখানে অন্যভাবে বেড়ে উঠবে।

৫. **ক্রোনো সিস্টেম :** এটি ইউরি ব্রনফেনব্রেনার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ধাপ নয়। পরবর্তীতে বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বের ধাপগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শিশু এসব ধাপ দ্বারা সৃষ্ট প্রভাবের বাইরেও কোনো ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন-পারিবারিক বিপর্যয়, সামাজিক বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয় শিশুকে প্রভাবিত করে। বলা হয়ে থাকে, যে কোন প্রাকৃতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, যখন বাবামায়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে অথবা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয় তখন শিশুরাই মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। এসব ঘটনাকে ক্রোনো সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.১২.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রভাব

শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। একটি শিশু যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবেশের যাবতীয় উপাদান শিশুটির বিকাশ ও শিখনে প্রভাব ফেলে। যেমন-শিশুর পরিবারে তার বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন তাকে কিভাবে লালন-পালন করছে তার ওপর শিশুটির বেড়ে ওঠা তথা যাবতীয় বিকাশ নির্ভর করে। ক্রমান্বয়ে শিশুটি যখন বড় হতে থাকে তখন তার আশপাশে যে সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকে তারা শিশুটির বিকাশে ভূমিকা রাখে। একই সাথে ঐ সমাজের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রভাবও শিশুটির ওপর পড়তে থাকে। একটি দেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা কেমন তার ওপর নির্ভর করে শিশুটির সাথে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কী ধরনের আচরণ করছে বা সেবা প্রদান করছে এ সবই শিশুর আচরণ গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কেমন হবে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কেমন আচরণ করবেন, পাঠদান পদ্ধতি কেমন হবে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে, যা এই তত্ত্বেরই উপাদান। আবার, দেশে বড় ধরনের কোনো রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও শিশুদের বেশি প্রভাবিত হতে দেখা যায়। বাস্তবসংস্থান সংক্রান্ত তত্ত্বটি সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল। এটা শুধু সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকেই গ্রহণ করে না, বরং ভিন্নতাকে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত করার চেষ্টা করে। তত্ত্বটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক,

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিশুকে শুধু একক শিশু হিসেবে না দেখে তাকে একটি পরিবারের, নিকট পাড়া/গ্রাম, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয়, রাষ্ট্র ও সমাজের সদস্য হিসেবে দেখতে হবে। তাকে প্রতিনিয়তই প্রতিটা স্তরেই এক এক ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত হতে হয়, যা দ্বারা সে প্রভাবিত হয়। শিশুর উন্নয়নে তাই এসব বিষয়ও আমাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব হলো, শিশু-বান্ধব শিখন ও বিকাশ উপযোগী পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি, রাষ্ট্র ও সমাজ উপহার দেয়া যা তাকে সার্বিক বিকাশে বিকশিত করে তুলবে।

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৩.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে মাতৃগর্ভ থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সময় যখন শিশুর বিকাশের প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। তবে জন্মের প্রথম বছরগুলোতে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এরপর থেকে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন বাংলাদেশে শিশুর বয়স ৫ বছর হলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে (Reference) এবং বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিশুর বিভিন্ন ধরনের বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয় (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)। তবে শিশু হঠাৎ করেই বিদ্যালয় পরিবেশের উপযোগী হয়ে ওঠে না, এজন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ প্রস্তুতি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুর অংশগ্রহণের এই প্রস্তুতিকালকেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

৩.১.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার একটি বিস্তৃত পরিসরের সূচনার অংশ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। যদিও আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও পরিধি শুধু এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু জন্মের পর প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা, অনানুষ্ঠানিক শিখন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে তা তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করেই শিশু পরবর্তী ধাপে পৌঁছায়। প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশুর এ পরিবর্তনের হার অন্য সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শিশু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। প্রতিটি ধাপে শিশুর যথাযথভাবে বেড়ে উঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার ভিত্তি। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, আজীবন শিখন ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সুপারিশ করেছে। শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করে শিশুর প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। কৌশল হিসেবে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ ও আকর্ষণীয় উপকরণ, হাতের কাজ, ছড়া, গল্প, গান ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও

কৌতূহলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে যত্ন, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১) ।

শিশুদের দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলা ও শিশুদের উপযোগী কাজকর্মের মাধ্যমে কী শিক্ষা লাভ করবে, কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কখন শিখবে ইত্যাদি বিষয়ই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সময়কালকে অনেক মনোবিজ্ঞানী Pre-school বা স্কুলে যাবার আগের সময়ও বলে থাকেন। আবার, শিশুর মধ্যে এসময় স্কুলে যাবার প্রস্তুতি চলে বলে একে “হাতে খড়ির” সময়ও বলা চলে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির চূড়ান্ত ধাপ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুকে সফলভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে এবং প্রারম্ভিক বিকাশ (শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, বৌদ্ধিক, বিকাশ) নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে যা পরবর্তীতে দু’বছর মেয়াদী করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়-

শিশুর শারীরিক, মানসিক, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশু-বান্ধব পরিবেশে আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

৩.১.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

একটি শিশুর জন্মের পর তার মধ্যকার যে সত্তা আছে তাকে বিকশিত করার জন্য এবং তার সারা জীবনের শিক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি শিশুর বিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। নিম্নলিখিত ৩টি ক্ষেত্রেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ক্ষেত্রগুলো হলো-

ক. শিক্ষার্থী পর্যায়ে

খ. বিদ্যালয় পর্যায়ে

গ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

ক. শিক্ষার্থী পর্যায়ে:

- শিশুর উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে;
- সামাজিক দক্ষতা বাড়ে;

- স্কুলে উপস্থিতির হার বাড়ে;
- স্কুলে শিশুর পারফরম্যান্স (পারদর্শিতা) বাড়ে;
- পুনরাবৃত্তি/ বাড়ে পড়া হার কমে;
- শিশু শিখতে পছন্দ করে এবং নিজে নিজে শিখতে উদ্যোগী হয়।

খ. বিদ্যালয় ব্যবস্থা পর্যায়ে:

- প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বাড়ে;
- উল্লেখযোগ্যভাবে ঝরে পড়ার হার কমে;
- পুনরাবৃত্তির হার কমে;
- প্রত্যাশিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের হার কমে;
- সামাজিক ও কল্যাণমূলক অন্যান্য সেবার উপর নির্ভরতা কমে;
- সামাজিক অপরাধ প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

গ. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে:

- শিক্ষা ব্যয় কমে;
- মাথাপিছু আয় বাড়ে;
- উৎপাদনশীলতা বাড়ে,
- আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর হয়
- সার্বিকভাবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিনিয়োগের সামাজিক প্রতিদান (social return) বেশি হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয় (বিশ্বব্যাংক, ২০০৪)।

এর বাইরেও শিশুর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে এই গুরুত্বগুলো তুলে ধরা হল-

- **শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়তা:** একমাত্র প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর সার্বিক (সামাজিক, মানসিক, ব্যক্তিত্ব, আবেগীয়, জ্ঞানীয়, ভাষাগত ইত্যাদি) বিকাশ সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করে। নিচে শিশুর বিভিন্ন ধরনের বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করা হলঃ

- **মানসিক বিকাশ:** যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে শেখে, নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ-খাওয়াতে শেখে, ধারণার বিকাশ, সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট করে, সৃজনশীলতাকে বের করে আনে, বস্তুর নিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।
- **ভাষার বিকাশ:** সঠিক অনুকরণ ও পরিচালনার মাধ্যমে ভাষার সহজ নিয়মাবলি আয়ত্ত করা যেমন- শুদ্ধভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করা, অন্যের সাথে সাবলীলভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা, নতুন শব্দ শেখা।
- **সামাজিক বিকাশ:** একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিভিন্ন পরিবেশের অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়, দল গঠন করতে চায় ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, শিশু নিজেকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে, শিশু সঠিক সামাজিক মনোভাব ও আচরণ আয়ত্ত করে, যুক্তিসঙ্গত ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে শিখে। এছাড়াও কিছু সৎ গুণ যেমন: গণতান্ত্রিক উপায়ে মেশা, নিজের স্বার্থকে দলীয় স্বার্থে বিলিয়ে দেওয়া, সামাজিক কলাকৌশল শেখা ইত্যাদি। এছাড়াও শিশুর মধ্যে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব, নিয়ম মেনে চলা বাস্তবাদী হওয়ার মনোভাবও গড়ে ওঠে।
- **আবেগীয় বিকাশ:** সাধারণত ছোট শিশুদের মধ্যে আবেগ বেশি থাকে। তারা ছোট কিছুতেই হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি শুরু করে, জিনিসপত্র ছোঁড়া-ছুঁড়ি করে, ভেঙ্গে ফেলে। আবার দেখা যায়, শিশুরা লাফালাফি করে, গড়াগড়ি করে, জড়িয়ে ধরে, নেচে তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তাদের এই আবেগগুলো সঠিক অনুকরণ ও প্রশিক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বা সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- **শারীরিক ও অঙ্গসঞ্চালনের বিকাশ:** প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা যেমনঃ Block-building, ছবি আঁকা, মাটির জিনিসপত্র তৈরী, বল খেলা, সাইকেল চড়া ইত্যাদি শিশুর শারীরিক ও অঙ্গসঞ্চালনের দক্ষতার বিকাশ ঘটায় এবং তাদের পেশী আরও সুগঠিত করে।
- **ব্যক্তিত্বের বিকাশ:** গিলফোর্ড মনে করেন, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে- “The unique pattern of traits characterizing the individual”. অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একজন ব্যক্তির ঐ বয়সের সামগ্রিক নমুনা যার ভেতর দিয়ে তার স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু এ সময় থেকেই আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-প্রকাশ, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি প্রস্তর রচনা করে।
- **নৈতিকতাবোধের বিকাশ:** ৩-৫/৬ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা বোধের সূচনা হয়। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিশুর মধ্যকার এই ন্যায়-অন্যায়বোধের উপলব্ধিকে

আরও ত্বরান্বিত করা হয়। ফলে শিশু অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনায় ভোগে। শিশুর মধ্যে আদর্শবোধের সৃষ্টি হয় যা শিশুকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হতে দূরে সরিয়ে রাখে।

- **প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা:** শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান সময়ে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েনি তাদের তুলনায় যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করেছে। শিশুর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পাঠ প্রস্তুতির পাশাপাশি শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা, বিদ্যালয় ভীতি দূর করা এবং বিদ্যালয়কেন্দ্রিক নিয়ম-নীতি অভ্যাস চর্চা করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- **শিশুর সারা জীবনের শিক্ষার ভিত তৈরি:** শিশুর শিক্ষার ভিত তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর একটি স্বীকৃত স্তর। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মস্তিষ্ক গাঁথুনি তথা ভিত তৈরির জন্য কাজ করে। শিশুর বিকাশের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হলো উল্লেখযোগ্য সময় যা শিশুর পরবর্তীকালের শিক্ষার ভিত রচনা করতে সহায়তা করে (EFA Global Monitoring Report, 2007)। এই বয়সে শিশুর মস্তিষ্ক শেখার জন্য দ্রুত কাজ করে এবং বেশি সক্রিয় থাকে।
- **পরিবার ও বিদ্যালয়ের সেতুবন্ধন:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির পাশাপাশি পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। কেননা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত যে, শিশুকে বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত (Ready for school) করতে হলে শিশুর ও বিদ্যালয়ে পাশাপাশি তার পরিবার ও সমাজকেও প্রস্তুত করে তুলতে হয় অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের মাধ্যমে শিশু যখন প্রাথমিকে অংশগ্রহণ করে তখন শিশুর সফলতা/কাজক্ষমতা যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষক/বিদ্যালয় যেমন কাজ করে তার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজকেও একই সূত্রে কাজ করতে হয় যে কারণে পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে উঠে একটি নিবিড় বন্ধন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার (বিদ্যালয়ের) নিয়ম-নীতি চর্চা:** শিশুর বিদ্যালয়ে মানিয়ে নেয়া (Adjust) ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (ক্যারোল ও অন্যান্য, ২০০৩)। লেজার এবং ডারলিংটন (১৯৮২) পরামর্শ দিয়েছেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা শিশুদের নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় শিক্ষার্থীতে উন্নীত করে। বিভিন্ন রকম আনন্দদায়ক কাজ- ছড়া, গান, গল্প, খেলা, অভিনয় ও বিভিন্ন প্রকার খেলনার সাহায্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় বলে শিশুর কাছে বিদ্যালয় একটি আনন্দদায়ক স্থান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এর সাথে সাথে বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি যেমন- সময়মত বিদ্যালয়ে আসা, নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করা, নিয়ম মেনে কাজ করার অভ্যাসগুলো তৈরি হয় যা তাকে পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় মানিয়ে নিতে সহায়তা করে।

- **প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি:** বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রমানিত যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত, গাণিতিক ইত্যাদি যোগ্যতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। যার প্রতিফলন হিসেবে অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় ভালো করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (হোসনে আরা বেগম ও অন্যান্য, ২০০৪)। গবেষণায় আরো দেখা যায়, যেসব শিশু প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় ভালো ফল করেছে। যেমন- ভাষা শিক্ষা, গণিত, সমস্যা সমাধান, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় শিশুদের ভালো ফল করতে দেখা গেছে। অর্থাৎ একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুধু প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর বিকাশকে ত্বরান্বিত করেনা তা পরবর্তীতে শিশুর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার হারও বৃদ্ধি করে।
- **শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘ করা:** বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক গবেষণা (Reference) এবং নেপালের একটি গবেষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফল হিসেবে শিশুর বিদ্যালয়ে অকৃতকার্যতা, পুনরাবৃত্তি, অনুপস্থিতি এবং ঝরে পড়ার হার কম দেখা যায় (Arnold, ২০০৩)। এটা বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মসূচির ব্যয় কমায় (Miyors, ১৯৯২) যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুদের শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য অতীব জরুরি।
- **কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা:** শিশু বয়সে তার মধ্যে কার্যসম্পাদনের প্রবণতা দেখা যায়; যাকে Erikson (১৯৫৯), “sense of industry” বলেছেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের খেলার মাধ্যমে কার্যসম্পাদনের প্রবণতাকে আরও উদ্দীপ্ত করা হয়। যার ফলে শিশু হাতে-কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে আগ্রহী হয়। যার ফলে শিশুর শিক্ষা সহজে বোধগম্য ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- **দক্ষতা অর্জনে সহায়তা:** প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর পেশীর পরিণতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা যেমন: নিজের কাজ নিজে করতে শেখা, জামা পরা, জুতোর ফিতে বাঁধা, দাঁত ব্রাশ করা শেখার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।
- **মুক্ত চিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি:** প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর আগ্রহ, সামর্থ্য অনুযায়ী স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিখনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে শিশু যে কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন বিকল্প হতে সঠিকটি বাছাইয়ের সুযোগ পায় যা শিশুর সৃজনশীলতাকে আরও উদ্দীপ্ত করে।

সর্বোপরি গবেষণা ও বাস্তব নিরিখের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, যেখানে আমাদের দেশে মা-বাবার শিক্ষার নিম্নহার, নিরক্ষরতা, সচেতনতার অভাব ও দারিদ্রতার কারণে বেশির ভাগ পরিবারে শিশুর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার সুযোগ নেই, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সাফল্য নিশ্চিত করতে কার্যকরী প্রাক-প্রাথমিক

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এটা প্রমাণিত যে, শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুপস্থিতি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া ও স্কুল ভীতি-তৈরি করে এবং শিশু নিজেকে পড়ালেখার সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ে। শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও উন্নয়ন (৩-৬ বছর) হলো শিশুর অধিকার। তাই শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩.১.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে, যার মূল্য বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শিশুর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে তাকে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করা। ফলে এক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরা হল-

- **শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা:** এ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর স্বাধীনতা। আধুনিক প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীরা নিজের ইচ্ছেমত চলাফেরা, পছন্দমত দলগঠন করা, পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ করা, নানাবিধ বস্তু তৈরী করা, স্কুলের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি বহু বৈচিত্রপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করছে।
- **শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাভিত্তিক:** প্রাচীন ও মধ্যযুগ শিক্ষা ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ও পুঁথিভিত্তিক। সক্রিয়তাকে প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করা হত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সক্রিয়তাকে শিক্ষার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ হাতে কলমে ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু যে শিক্ষা লাভ করে তা শিশুর কাছে সহজ বোধগম্য, মূর্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- **শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক:** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই সর্বপ্রথম স্থান দেয়া হয়েছে। শিশু যে সমাজ থেকে এসেছে এবং যে সমাজে সে বড় হয়ে নিজের স্থান করে নেবে সেই সমাজের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলো শিশুর শিক্ষাক্রমে প্রধান বিষয়বস্তু হয়েছে। যেহেতু শিশুর সামাজিকীকরণই হল আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। সেহেতু বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে পূর্ণভাবে সমাজধর্মী করে তোলা হয় শিশু সেখানে বাস্তব জীবনের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করো স্কুলের সংবাদপত্র, ক্লাব, খেলার দল, সাংস্কৃতিক সংঘ, বয়স্কাউট, গার্লস গাইড প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু সমাজের প্রকৃত ও উপযোগী নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে।
- **অন্তর্জাত শৃঙ্খলা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জাত। শাসন, নিন্দা, প্রশংসা, পুরস্কার, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি কৃত্রিম পন্থার সাহায্যে এখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দরকার হয় না। শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশুদের আচরণের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়।

- **সৃজনশীলতা:** বাঁধা ধরা সুনির্দিষ্ট কর্মধারার মধ্যে শিশুর প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রেখে যাতে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার অভ্যন্তরীণ সৃজনস্পৃহা প্রকাশ হতে পারে তার জন্য যথেষ্ট উপকরণের ব্যবস্থা করা উচিত। কাঠের জিনিস তৈরি করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সৃজন প্রচেষ্টাকে অভিব্যক্ত করার প্রচুর সুযোগ দেয়া হয়।
- **ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশ:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর মানসিক দিকটি ছাড়াও তার শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকগুলোর সুসম ও সার্বিক বিকাশের প্রতি সমান দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে। এক কথায়, অপরিণত, অবিকশিত ও অসম্পূর্ণ শিশু যাতে একটি সম্পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে এটিই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য।
- **মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত:** আধুনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একদিকে যেমন সুচিন্তিত দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অপরদিকে তেমনই সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতির সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি। সেই নীতির অনুসরণে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীই নিজের সামর্থ্য ও সম্ভবনাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পাবে। তাছাড়া শিখন পরিণমন, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া, প্রবৃত্তি, আবেগ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নবলব্ধ বহু মনোবৈজ্ঞানিক নীতি ও তথ্যের সম্মিলন ঘটেছে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়।
- **উন্নত শিখন-শেখানো কলা-কৌশল:** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় উন্নত ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রয়োজন, সামর্থ্য, আগ্রহ ও বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি পরিকল্পিত হয়েছে।
- **ঘনিষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সহজ, স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিময়। শিক্ষক আজ শিক্ষার রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বি অধিপতি নন। তিনি এখন শিক্ষার্থীর সহকর্মী, সহায়ক, হিতৈষী পথ-প্রদর্শক ও বন্ধুমাত্র।
- **শিশুর প্রয়োজন-আগ্রহ-সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা:** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা আজ সম্পূর্ণভাবে শিশুর তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই তিনটি বৈশিষ্ট্য হল তার প্রয়োজন, আগ্রহ ও সামর্থ্য। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর এ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল অবহেলিত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান সর্বোচ্চ। শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাণই হল এক্ষেত্রে শিশুর প্রয়োজন, তার অবয়ব হল শিশুর সক্রিয় অভিজ্ঞতা এবং শিশুর আগ্রহ ও সামর্থ্য হল তার সাংগঠনিক শক্তি।
- **সহযোগিতা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব প্রশ্রয় না দিয়ে সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। সহযোগিতার মনোভাব তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও সংঘবদ্ধতা

আনে এবং সুখম ও স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তা গঠনে সাহায্য করে। তাই সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ পদ্ধতিই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি।

- **বিদ্যালয়-পরিবারের সংযোগ:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয় এবং শিশুর পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শিশুর কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বা তার সম্বন্ধে কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নেবার সময় তার পিতামাতার অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করা আজকাল সব প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- **অভিন্ন শিক্ষা ও জীবন:** অতীতে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে শিশুকে শিশু বলেই মনে করা হয় এবং তার অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন, বিকাশমুখিতা ইত্যাদি সবই বয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে গণ্য করা হয়। এই কারণেই বর্তমানে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে তার জীবন-ধারণার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

শিশু শিক্ষা বিষয়ে বিশ শতকের ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ইত্যাদি একুশ শতকে আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। শিশুদের শিক্ষার যে কোন কার্যাবলি পরিকল্পনায়, পরিচালনায় ও বাস্তবায়নে এসব দিক বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

৩.২ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

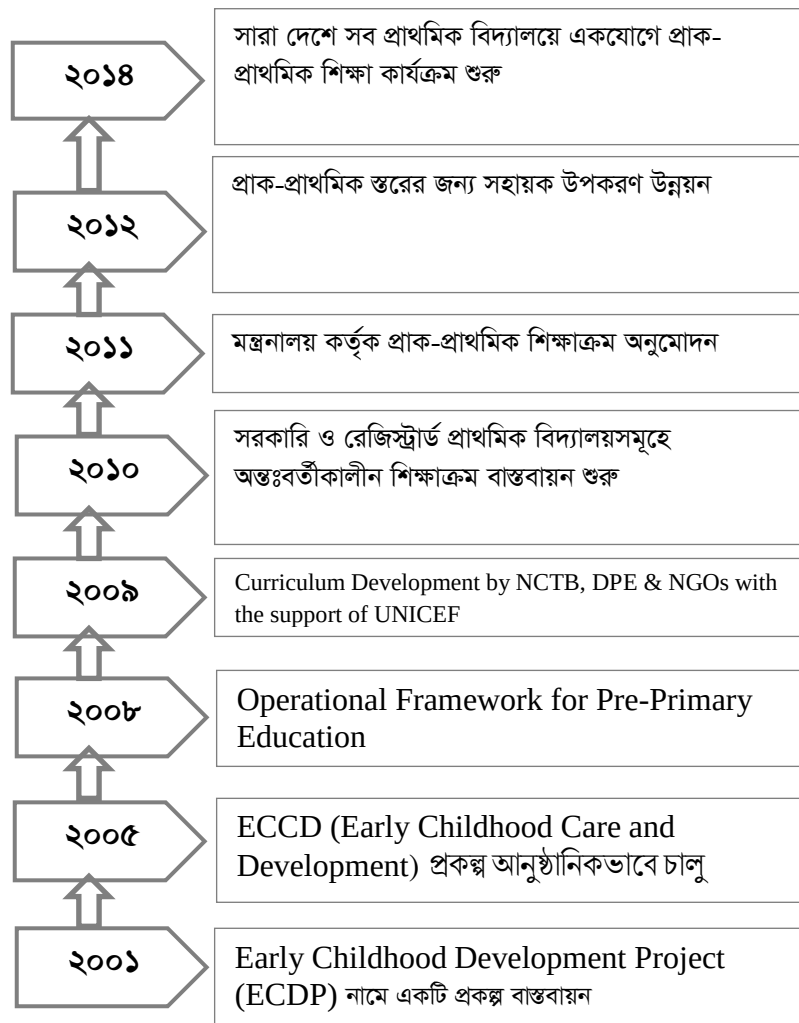
স্বাধীনতার পর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং ছোট শিশুদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলস্বরূপ দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নার্সারি স্কুলের আদলে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুদরাত-ই-খুদা (১৯৭৪) এবং মফিজউদ্দিন আহমেদ (১৯৮৮)-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশন শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশে এর প্রচলনের ওপর জোর সুপারিশ করেছে। এ শিক্ষা কমিশন শহর ও শিল্প এলাকায়, বিশেষত যাদের অভিভাবকগণ বাইরে কাজ করেন, সে সকল শিশুদের জন্য নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। মফিজউদ্দিন কমিশন যেখানে বেসরকারি উদ্যোগ নেই এরূপ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণি খোলার সুপারিশ করেছে।

১৯৯৫ সালে গঠিত সবার জন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ‘সবার জন্য শিক্ষা’ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ছোট শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৯৭ সালে গঠিত কমিটিও সুপারিশ করে যে, ১ম শ্রেণির প্রথম ছয়মাস প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যায়। কমিটি শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ করারও পরামর্শ দেয়।

সকল শিক্ষা কমিশনই প্রতিটি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ সুপারিশ করে যে, পাঁচ বছর বয়সের উর্ধ্বের শিশুদের জন্য একটি পৃথক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমানে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে শিশুশ্রেণি খোলার প্রচেষ্টা

গ্রহণ করা হয়েছে। এনজিও উদ্যোগ এবং গুরুত্ব চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারিভাবে কয়েক হাজার প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়, কিন্তু এগুলি চাহিদানুযায়ী যথেষ্ট নয়। তাই, শিশুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে অভিভাবক ও বড়দের কাছ থেকেই তাদের শিশুকালীন শিক্ষা লাভ করে থাকে। যে সকল শিশুর অভিভাবক ও অন্যান্য সদস্য শিক্ষিত নয়, তারা থেকে যায় অবহেলিত। তবে পাঁচ বছরের উপরের বেশিরভাগ শিশুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসে যোগদান করে আসছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও মান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেমন:



চিত্র: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রবাহ চিত্র

৩.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো ২০০৮, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের রূপরেখা, প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান ও অন্তঃবর্তীকালীন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং সেই সাথে জাতিসংঘ শিশু অধিকার

কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনা করে বাংলাদেশে ২০১১ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয় যেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

১.৩.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে আজীবন শিখনের ভিত্তি রচনা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

১.৩.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- ক) আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- খ) শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা;
- গ) শিশুর সৌন্দর্য, নান্দনিকতাবোধ ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশে সহায়তা করা;
- ঘ) শিশুকে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা;
- ঙ) নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার, কৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এর চর্চায় উৎসাহিত করা;
- চ) নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি বিকাশে সহায়তা করা;
- ছ) শিশুর স্বুল ও সূক্ষ্মপেশী তথা চলনশক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- জ) স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা;
- ঝ) শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা;
- ঞ) প্রারম্ভিক গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা;
- ট) পরিবেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারণ ও ফলাফল সম্পর্ক অনুধাবনে সহায়তা করা;
- ঠ) শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে সহায়তা করা;
- ড) শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা এবং নিজের কাজ নিজে করতে উদ্বুদ্ধ করা;

- ঢ) আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা;
- ণ) শিশুকে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভাগাভাগি করতে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা;
- ত) শিশুকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী করে তোলা ও মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করা;
- থ) শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।

৩.৪ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর দৈহিক, সামাজিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভাষাগতক বিকাশের সাথে সাথে তাকে বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে শিশুর বিভিন্ন ধরনের বিকাশ ঘটবে ও বিদ্যালয় পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিবে তা নির্ভর করে শিক্ষাক্রমে তা কীভাবে পরিকল্পিত হয়েছে তার ওপর। কারণ শিক্ষার সবকিছু শিক্ষাক্রমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। মূলত: শিক্ষাক্রম হলো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত দলিল যেখানে শিক্ষার পরিকল্পিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যাবলী ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার বিশদ বর্ণনা থাকে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ J. F. Kerr এর মতে “Curriculum comprises all the learning which is planned and guided by school whether it is carried on in groups or individually inside or outside the school” অর্থাৎ, শিক্ষাক্রম হলো বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন, যা বিদ্যালয়ের ভেতরে বা বাইরে দলগত কিংবা এককভাবে সম্পন্ন করা হয়।

৩.৪.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা তার পরিবার, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শেখার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বুঝে এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, বিস্তরণ, বাস্তবায়ন ও দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হবে এবং সকল কার্যক্রমে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। তবেই শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি ও বিশ্বাসসমূহকে মূলনীতিমালা হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

১. শিশু কেন্দ্রিকতা (Child centeredness): প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম মূলনীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার ক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ - এই

তিনটি পর্যায়েই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা শিশুর সুস্থ ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে ও একটি সমৃদ্ধ জীবন যাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুকে আজীবন শিখনের (Life-long learning) জন্য প্রস্তুত করা যাবে।

২. সক্রিয় শিখন (Children as active learner): শিশুরা সহজাতভাবেই জন্ম থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখে। জন্ম থেকে প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বড় হয়, সেখানে তার সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট ধরন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিশুর বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে শিশুর বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশ-সংশ্লিষ্ট চাহিদা সম্পর্কে জানা যায়। চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানবার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সহজাত মানসিকতার কারণে শিশুর প্রথম চাহিদা হচ্ছে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ। কেননা শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী। আর তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া যেহেতু বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয় সেহেতু সকল পর্যায়ে তার সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টিই শিশুর বিকাশ ও শিখনের মূলমন্ত্র।

৩. পরিবারের সম্পৃক্ততা (Family involvement): পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর গড়ে উঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ মাতাপিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মাতাপিতার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের নানা দিকের উপর প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে রয়েছে শিশুর নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিদ্যালয়ে তার শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাতাপিতা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

৪. স্কুল-সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান (School as responsive social institute): বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং এটি পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে স্কুলকে এমন কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয় যা শিশুর জানার আগ্রহে উদ্দীপনা দিতে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ও শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ তথা সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে অত্যন্ত জরুরি। বিষয়সমূহ হলো:

- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সাথে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা;
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো;

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

এক্ষেত্রে স্কুলকে সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুর প্রস্তুতির সঙ্গে যেহেতু পরিবার ও স্কুলের প্রস্তুতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেহেতু শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্কুলের ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫. একীভূততা (Inclusiveness): এক্ষেত্রে একীভূততা মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে এবং মেনে নিয়ে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা জরুরি। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় এবং শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা ও শিখন উপায়ের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যেন সকল শিশুর শেখার আগ্রহ বজায় থাকে এবং শিখন চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকে। তাই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে স্কুল ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে একীভূততাকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৬. দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখন (Local culture and heritage): আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংগে পরিচয় করিয়ে নিজের স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে, স্কুলে এবং সমাজে সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষাপরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিনির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৭. অন্যদের সাথে শিশুর সম্পর্ক (Children's relationship with others): শিশুর বিকাশ ও শেখা বহুগুণে বেড়ে যায় যদি তার সংগে অন্য শিশুর, শিক্ষকের কিংবা বড়দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার যখন পরিবারের সদস্য কিংবা সমাজের প্রতিনিধিদের সংগে শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠে তখন সার্বিকভাবে একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উদ্যোগের মানও বেড়ে যায় অনেকাংশে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যদের সাথে শিশুর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরবর্তিতে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ধাপে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনার উদ্দেশ্যে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

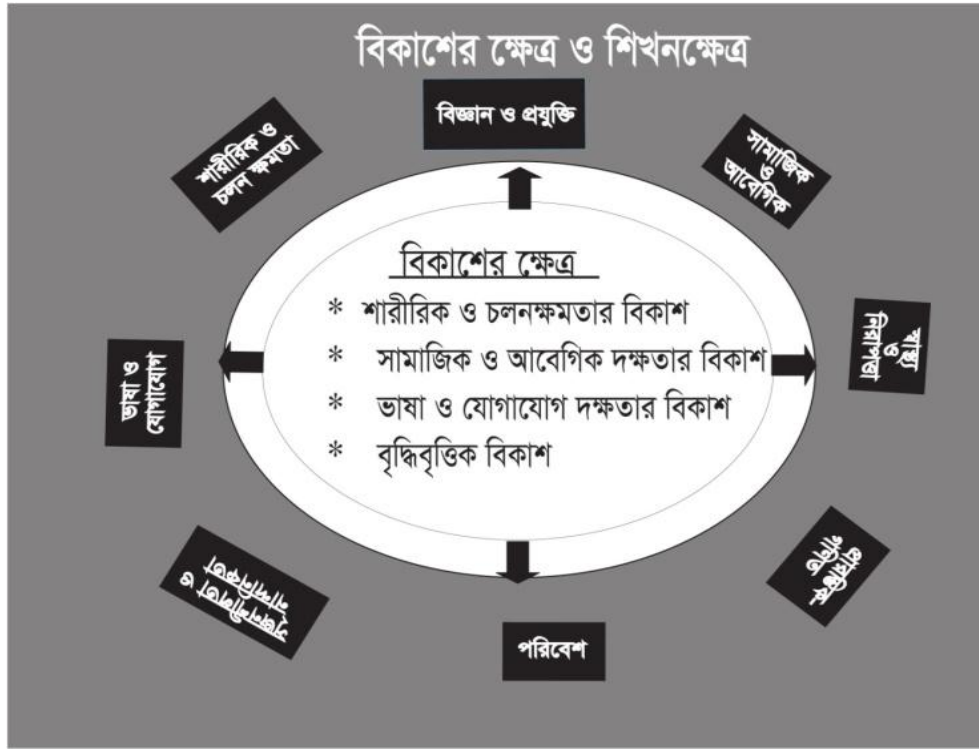
৮. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (Immediate environment): পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে প্রভাবিত করে। তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি-নির্দেশনাকে প্রভাবিত করে। আবার সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মাতাপিতার প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্যই তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের

প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। নিকট পরিবেশ ও চারপাশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য।

৯. পরিবেশ বান্ধবতা (Environment friendliness): প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দর্শনের বিচ্যুতি পুরো পৃথিবীকে মহা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর তার শিকার হচ্ছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিতরা। একটি পরিবেশ বান্ধব প্রজন্ম এই বিপর্যয় ঠেকাতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এই ধারণার লালন শুরু করতে হবে জীবনের শুরু থেকেই। সেই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে পরিবেশ বান্ধবতার বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করে এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সকল ধাপে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৪.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিখনক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শিখনফল, শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা। বাংলাদেশে ০ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুদের বিভিন্ন ধাপের বিকাশ উপযোগী অর্জনযোগ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের ক্ষেত্রগুলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু প্রণয়নের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও কারিগরি সংস্থার সহায়তায় শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের ৪টি Domain বা ক্ষেত্রকে প্রমিত মান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রগুলো Early Learning Development Standards বা ELDS নামে পরিচিত। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম, গবেষণা ও দলিল পর্যালোচনা করে শিশুদের প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের এই ৪টি ক্ষেত্রকে ৮টি শিখন ক্ষেত্রে (learning area) বিভাজন করা হয়েছে। শিশুর বিকাশের এ ৪ টি ক্ষেত্র অনুযায়ী ৮টি শিখন ক্ষেত্র নিচের চিত্রে উল্লেখ করা হলো।



চিত্র: বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র (উৎস: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পৃ. ১৮)

প্রতিটি শিখন ক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিপরীতে আবার একাধিক শিখনফল ও শিখন শেখানো কৌশল বা পরিকল্পিত কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি পরিকল্পিত কাজের মাধ্যমে একাধিক শিখনফল অর্জিত হতে পারে। আবার একটি শিখনফল একাধিক পরিকল্পিত কাজের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনক্ষেত্র, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সংবলিত শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স উপস্থাপন করা হলো।

৩.৫ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
১. শারীরিক ও চলনক্ষমতা	১.১ নিয়মিত হাঁটাচলা, দৌড়ানো, খেলা, শারীরিক কসরত ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা	১.১.১ ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটাচলা (উঁচু-নিচু দিয়ে হাঁটা, এক পায়ে হাঁটা, চোখ বাঁধা অবস্থায় হাঁটা, লাফানো, ওপরে-নিচে ওঠানামা, আঁকাবাকা হাঁটা, হঠাৎ থেমে যাওয়া ও দিক পরিবর্তন করা), দৌড়াতে পারবে।
		১.১.২ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে (যেমন : বইখাতা/খেলনা গোছানো, পাত্রে পানি ঢালা, দাঁত মাজা, গোসল করা ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করতে পারবে।
		১.১.৩ স্থানীয় ও অন্যান্য খেলা খেলতে পারবে।
		১.১.৪ বিভিন্ন শারীরিক কসরত করতে পারবে।
	১.২ বিভিন্ন জিনিস ধরতে, আঁকতে ও তৈরি করতে পারা	১.২.১ পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, তুলি, চক ইত্যাদি সঠিকভাবে ধরতে পারবে।
		১.২.২ ক্রেয়ন, পেন্সিল, তুলির সাহায্যে আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		১.২.৩ ছোট পাথর, বিচি, ব্লক ইত্যাদি ধরতে, বাছাই করতে এবং পছন্দমতো সাজাতে পারবে।
		১.২.৪ কাদা, মাটি, কাগজ, পাতা ইত্যাদি সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ইচ্ছেমতো খেলনা তৈরি করতে পারবে।
	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা	১.৩.১ চোখ ও হাতের সমন্বয় করে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে।
		১.৩.২ না দেখে স্পর্শ করে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।
		১.৩.৩ বিভিন্ন রকম গন্ধ শূঁকে তা শনাক্ত করতে পারবে।
		১.৩.৪ কোনো দৃশ্য, বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে প্রকাশ করতে পারবে।
		১.৩.৫ বিভিন্ন স্বাদের খাবার শনাক্ত করতে পারবে (মিষ্টি, ঝাল, টক, তেতো, নোনতা)
		১.৩.৬ শব্দ শুনে এর উৎস চিনতে পারবে।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে বড়দের সাথে যোগাযোগ ও আচরণ করতে পারা	২.১.১ বড়দের সালাম-আদাব দেয়ার অভ্যাস গঠন করবে।
		২.১.২ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে।
		২.১.৩ শিক্ষক ও বড়দের সাথে ভাব বিনিময় (কথা বলা, অনুভূতি প্রকাশ করা) করতে পারবে।
	২.২ বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পারা	২.২.১ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।
		২.২.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		২.২.৩ বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধু তৈরি করতে পারবে (বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে) এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.৩ সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারা	২.৩.১ নেতৃত্ব মেনে চলতে পারবে।
		২.৩.২ নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন ও প্রদর্শন করতে পারবে।
		২.৩.৩ ছোটখাট দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবে।
		২.৩.৪ মতের ভিন্নতা মেনে নেয়ার মনোভাব দেখাবে।
		২.৩.৫ সহপাঠীদের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মেনে নেয়ার মানসিকতা অর্জন করবে।
		২.৩.৬ পছন্দ ও অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৩.৭ সহযোগিতা ও ভাগাভাগির (শেয়ারিং) মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে।
		২.৩.৮ বাড়ি, শ্রেণি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে।
		২.৩.৯ অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৩.১০ প্রয়োজনে অন্যকে সহযোগিতা করতে ও অন্যের সহযোগিতা চাইতে পারবে।
		২.৩.১১ জাতীয় সম্পদের প্রতি যত্নশীল হবে।
	২.৪ আত্মসচেতন হওয়া, আত্ম নিয়ন্ত্রণ করা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারা	২.৪.১ নিজের আবেগ-অনুভূতি (যেমন : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, ভয়, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি) স্বাভাবিকভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৪.২ নিজের সম্পর্কে অন্যকে বলতে পারবে।
		২.৪.৩ নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৪.৪ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে এবং তা পালন করতে পারবে।
		২.৪.৫ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করতে পারবে।
		২.৪.৬ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৪.৭ কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে পুরো নির্দেশনা শুনবে।
	২.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া	২.৫.১ ভুল করলে বা কাউকে কষ্ট দিলে দুঃখ প্রকাশ করবে।
		২.৫.২ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।
		২.৫.৩ ভালো কাজের প্রশংসা করতে পারবে।
	২.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা	২.৬.১ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানবে এবং জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে।
		২.৬.২ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।
		২.৬.৩ জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।
		২.৬.৪ জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		২.৬.৫ সামাজিক ও লোকজ বিভিন্ন উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।
		২.৬.৬ জাতীয় ও স্থানীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, ফলমূল চিনবে ও এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবে।
		২.৬.৭ স্থানীয় খেলায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।
		২.৬.৮ স্থানীয়/লোকজ শিশুতোষ ছড়া, গান ও নাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে।
৩. ভাষা ও যোগাযোগ	৩.১ ভাব গ্রহণ (দেখা এবং কোনো) ও প্রকাশ (বলা বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি) করতে পারা	৩.১.১ মৌখিক নির্দেশনা (আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ) অনুসরণ করতে পারবে।
		৩.১.২ প্রশ্ন করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
		৩.১.৩ ছোট ছোট গল্প শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।
		৩.১.৪ দেখে বা শুনে কোনো কিছু শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.১.৫ অপরিচিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে ও এর অর্থ বুঝতে পারবে।
		৩.১.৬ পরিচিত বস্তু, ছবি বা দৃশ্যপট সম্পর্কে বলতে পারবে।
		৩.১.৭ ছড়া, গান, গল্প বলতে পারবে।
		৩.১.৮ স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্যভাবে কথা বলতে পারবে।
		৩.১.৯ কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
		৩.১.১০ কথোপকথন ও দলীয় আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।
		৩.১.১১ নতুন পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে পারবে।
		৩.১.১২ অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করে বলতে পারবে।
		৩.১.১৩ সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলতে পারবে।
	৩.২ পড়তে পারা (প্রাক-পঠন)	৩.২.১ পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.২ বাক্য থেকে শব্দ আলাদা করতে পারবে।
		৩.২.৩ একই রকম শব্দ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৪ একই রকম শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবে।
		৩.২.৫ শব্দ থেকে ধ্বনি আলাদা করতে পারবে।
		৩.২.৬ একই রকম ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৭ একই রকম ধ্বনি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করতে পারবে।
		৩.২.৮ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৯ শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.১০ দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল শব্দ পড়তে পারবে।
		৩.২.১১ ছবি/চিত্রভিত্তিক ধারাবাহিক কাহিনী বা গল্প বলতে (পড়তে) পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		৩.২.১২ বই ব্যবহার করতে (বই ধরতে, পাতা উল্টাতে, বাম থেকে ডানে যেতে, ওপর থেকে নিচে যেতে) পারবে।
		৩.২.১৩ নিজের লেখা নাম চিনতে পারবে।
		৩.২.১৪ বিভিন্ন সংকেত/প্রতীক চিনতে/পড়তে পারবে।
	৩.৩ লিখতে পারা (প্রাক-লিখন)।	৩.৩.১ ইচ্ছেমতো আঁকিবুঁকি করতে পারবে।
		৩.৩.২ প্যাটার্ন/আকৃতি আঁকতে পারবে।
		৩.৩.৩ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		৩.৩.৪ ছবি/চিত্র/বস্তু/দৃশ্য দেখে আঁকতে পারবে।
		৩.৩.৫ নিজের নাম দেখে লিখতে পারবে।
		৩.৩.৬ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) লিখতে পারবে।
		৩.৩.৭ দুই বা তিন বর্ণের পরিচিত সরল শব্দ লিখতে পারবে।
৪. প্রারম্ভিক গণিত	৪.১ প্রাক-গাণিতিক ধারণা অর্জন করা	৪.১.১ ডান-বাম, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটাচিকন, ভারী-হাল্কা চিহ্নিত করতে পারবে।
		৪.১.২ বাহির-ভেতর, ওপর-নিচ, সামনে-পেছনে, উঁচু-নিচু, কাছে-দূরে চিহ্নিত করতে পারবে।
		৪.১.৩ বিভিন্ন আকার-আকৃতি (বড়, ছোট, মাঝারি) ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজাতে পারবে।
		৪.১.৪ রং, আকার-আকৃতি (গোল, তিনকোনা, চারকোনা) অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু শ্রেণিকরণ করতে পারবে।
		৪.১.৫ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনমুদ্রণ ও পরিমাপ করতে পারবে।
		৪.১.৬ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে বণ্টন করতে পারবে।
	৪.২ সংখ্যার ধারণা অর্জন করা	৪.২.১ '১ - ২০' পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।
		৪.২.২ '১ - ২০' পর্যন্ত ছবি দেখে গণনা করতে পারবে।
		৪.২.৩ '১ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবে (ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট)।
		৪.২.৪ '১ - ৯' পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক চিনতে ও বলতে পারবে।
		৪.২.৫ '১ - ৯' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে।
		৪.২.৬ '১ - ৯' পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে।
		৪.২.৭ শূন্যের সহজ ধারণা দিতে পারবে ও প্রতীক চিনতে ও বলতে পারবে।
		৪.২.৮ '১০ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে ও বলতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		৪.২.৯ ‘১০ - ২০’ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা মিলাতে পারবে।
		৪.২.১০ ‘১০ - ২০’ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা মিলাতে পারবে।
	৪.৩ সংখ্যা লিখতে পারা	৪.৩.১ ‘১ - ২০’ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।
		৪.৩.২ ‘১ - ২০’ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা লিখতে পারবে।
	৪.৪ সংখ্যার তুলনা করতে পারা	৪.৪.১ ‘১ - ২০’ পর্যন্ত বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গণনা করে কম-বেশি নির্ণয় করতে পারবে।
		৪.৪.২ ‘১ - ২০’ পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
		৪.৪.৩ ‘১ - ২০’ পর্যন্ত যে কোনো ৫টি সংখ্যা ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট সাজাতে পারবে।
	৪.৫ যোগের ধারণা অর্জন করা	৪.৫.১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে যোগ করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না)।
		৪.৫.২ এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না)।
		৪.৫.৩ যোগ সংক্রান্ত সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না)।
	৪.৬ বিয়োগের ধারণা অর্জন করা	৪.৬.১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিয়োগ করতে পারবে (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না)।
		৪.৬.২ এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না) বিয়োগ করতে পারবে।
		৪.৬.৩ বিয়োগ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না)।
৫. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৫.১ চারু ও কারুকাজের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা	৫.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের দৃশ্যপটসহ ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		৫.১.২ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন জিনিস (যেমন : পুতুল, ফল, ফলু, বল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারবে।
		৫.১.৩ জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।
	৫.২ ছড়া, নাচ, গান, গল্প ও অভিনয়ের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা	৫.২.১ দলে ধারাবাহিক গল্প তৈরি করতে ও বলতে পারবে।
		৫.২.২ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া, কবিতা, গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
		৫.২.৩ ছন্দের তালে তালে স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য শিশুতোষ গান গাইতে পারবে।
		৫.২.৪ ছন্দের তালে তালে স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য নাচ নাচতে পারবে।
		৫.২.৫ স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য শিশুতোষ ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
		৫.২.৬ জাতীয় সংগীত গাইতে পারবে।
		৫.২.৭ স্থানীয় সাধারণ বাদ্যযন্ত্র চিনতে ও বলতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
	৫.৩ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে নান্দনিকতার প্রকাশ করতে পারা	৫.৩.১ নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজসজ্জা ও পোশাক)। ৫.৩.২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে।
৬. পরিবেশ	৬.১ পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারা	৬.১.১ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (যেমন : ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, যানবাহন, মাটি, পানি ইত্যাদি) চিনতে ও নাম বলতে পারবে। ৬.১.২ ফসলের ক্ষেত, নদী, পাহাড়, বন, সমুদ্র চিনতে পারবে। ৬.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা যেমন : বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারবে। ৬.১.৪ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র চিনবে এবং এগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে। ৬.১.৫ পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয়দের (মা-বাবা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু, ফুপু-ফুপা) সম্পর্কে বলতে পারবে। ৬.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণীর (৩টি) সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে। ৬.১.৭ বৈশিষ্ট্যের আলোকে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের পার্থক্য করতে পারবে। ৬.১.৮ দিনের বিভিন্ন অংশ (সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত) আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।
	৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারা	৬.২.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে। ৬.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। ৬.২.৩ গাছ-পালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল হবে।
৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৭.১ বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া	৭.১.১ পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ৭.১.২ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহের শ্রেণিকরণ, তুলনা ও উপস্থাপন করতে পারবে। ৭.১.৩ অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। ৭.১.৪ ছোটখাট বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
	৭.২ জড়, জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারা	৭.১.৫ ছোটখাট সমস্যার সমাধান করতে পারবে। ৭.২.১ জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারবে। ৭.২.২ উদ্ভিদ ও প্রাণী পার্থক্য করতে পারবে।
	৭.৩ দৈনন্দিন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারা	৭.৩.১ দেশের সর্বত্র প্রচলিত ও পরিচিত প্রযুক্তির (ঘড়ি, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, ধান মাড়াইয়ের কল, সেচযন্ত্র, ট্রাক্টর) নাম ও কাজ বলতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
	৭.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা	৭.৩.২ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি চিনতে পারবে।
		৭.৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন) নাম জানবে ও শনাক্ত করতে পারবে।
		৭.৪.২ তথ্য ও যোগাযোগের বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে পারবে।
		৭.৫.১ স্থলপথের যানবাহন সম্পর্কে বলতে পারবে।
		৭.৫.২ জলপথের যানবাহন সম্পর্কে বলতে পারবে।
		৭.৫.৩ আকাশপথের যানবাহন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৮. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	৮.১ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দৈনন্দিন কাজ করতে এবং খাবার ও বিশ্রামের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা	৮.১.১ শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ বলতে পারবে।
		৮.১.২ নিয়মিত দাঁত মাজতে, হাত ধুতে, চুল আঁচড়াতে, হাঁচিকাশির সময় মুখ ঢাকতে ও টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গঠন করবে।
		৮.১.৩ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর খাবার চিহ্নিত করতে পারবে।
		৮.১.৪ বিভিন্ন প্রকার খাবার (ভাত/রুটি/পাউরুটি, মাছ-মাংস/ডাল, শাক-সব্জি, ফলমূল) আলাদা করতে পারবে।
		৮.১.৫ খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়মিত নিজে নিজে খাবার খেতে পারবে।
		৮.১.৬ খাবারের আগে ও পরে প্লেট নিজে ধোবে।
		৮.১.৭ পরিষ্কার পাত্রে খাবার ঢেকে রাখবে।
		৮.১.৮ ফলমূল ধুয়ে খাবে।
		৮.১.৯ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম নেবে।
		৮.১.১০ সাধারণ রোগ (জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, ডায়রিয়া ইত্যাদি) সম্পর্কে জানবে।
		৮.১.১১ অসুস্থবোধ করলে তা বলতে পারবে।
		৮.১.১২ নিরাপদ পানির উৎস বলতে পারবে।
	৮.২ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।	৮.২.১ বিপজ্জনক বস্তু বা বিপদের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে, যেমন, আগুন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ, কীটনাশক, ভাঙা গ্লাস, ছুরি, কাঁচি, দা, দেয়াশলাই, ডোবা, পুকুর, নদী-নালা, গাছে উঠা ইত্যাদি।
		৮.২.২ নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সাঁতার কাটতে উৎসাহিত হবে।
		৮.২.৩ নিরাপত্তাজনিত সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে পারবে এবং রাস্তা, গাড়ি বা বাইরে চলাচলের সময় তা মেনে চলতে পারবে।
		৮.২.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া যেতে পারে তা শনাক্ত করতে পারবে এবং সহায়তা চাইতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		৮.২.৫ অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু(চকলেট, খেলনা, টাকা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে না ও অপরিচিত কারোসাথে যাবে না।
		৮.২.৬ প্রতিকূল পরিস্থিতি বুঝে সে অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করবে।
		৮.২.৭ হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ বুঝতে পারবে এবং মাবাবা/ অভিভাবক/ শিক্ষককে জানাতে পারবে।

সূত্র: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১১ থেকে সংকলিত

৩.৬ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে শিশু এমন অনেক ধাপ অতিক্রম করে এবং প্রতিটি ধাপে শিশুর যথাযথ বেড়ে ওঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার ভিত্তি। ভর্তির পূর্বে এই ভিত্তি বিনির্মাণ করাই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর প্রস্তুতি, যা ছাড়া কোনোভাবেই শিশু প্রাথমিক শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া পারিবারিক পরিবেশ থেকে সামাজিক পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে (যেমন স্কুল) গিয়ে যথাযথভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্যও শিশুর যথাযথ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োজন যা শিশুর শিক্ষা শুরুর প্রস্তুতিরই অংশ। শিশুর স্কুলে ভর্তির প্রস্তুতি শুধুই একমুখীভাবে (unidirectional) হলে শিশুর প্রস্তুতি হবে না, বরং এটি প্রকৃত অর্থে বহুমুখী (multidirectional)। এগুলো হলো: পরিবারের প্রস্তুতি, সমাজের প্রস্তুতি, স্কুলের প্রস্তুতি এবং শিশুর প্রস্তুতি। সারা বিশ্বে এ সংক্রান্ত প্রচলিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে :

- শিশুর যথাযথ বেড়ে ওঠা ও বিকাশ নিশ্চিতকল্পে বাবা-মার দক্ষতা বৃদ্ধি (parenting education): এ ধরনের কার্যক্রমে সাধারণত শিশু গর্ভে থাকা সময় থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বাবা-মা, পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ সমাজে যে ধরনের সেবা, সহায়তার প্রয়োজন হয় তা নিশ্চিত করা হয়।
- পরিবারের ছোট-বড় সকলকে সম্পৃক্ত করা যেন তারা শিশুর বয়সভিত্তিক চাহিদা বুঝে সহায়তা প্রদান করতে পারে (০-৬) (age-appropriate care & support): প্রারম্ভিককালে শিশুর বিকাশ অতিদ্রুত ঘটে বিধায় প্রতিনিয়ত শিশুদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনগুলোও পরিবর্তিত হতে থাকে। শিশুর এই চাহিদাসমূহকে সঠিকভাবে বিবেচনা করে তাকে প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা যেমন-পুষ্টিকর খাবার, টীকা, নিরাপত্তা, খেলার সুযোগ ইত্যাদি প্রদান করতে পারলে শিশুর সর্বাধিক বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু বয়সভিত্তিক শিশুর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বুঝে কিভাবে সহায়তা করতে হয় সে ব্যাপারে অনেক মানুষই সচেতন না হওয়ায় এ ধরনের কার্যক্রমে সাধারণত এসব বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়।

- **দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুযোগ সৃষ্টি (৬ মাস - ৪ বছর) (day care facilities):** সাধারণত কর্মজীবী মা বাবা যেসব শিশুর বাড়িতে করার লোক থাকে না সেসব ক্ষেত্রে মা যেন শিশুকে একটি নিরাপদ পরিবেশে রেখে নিশ্চিন্তে কাজে যেতে পারেন সে কারণে কেন্দ্রভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- **শিশু বিকাশ কেন্দ্র (শিখন বিষয়ক প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ) (৩ বছর - ৫ বছর) (early childhood development center):** এ কার্যক্রমগুলো মূলত ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কমিউনিটি/কেন্দ্রভিত্তিক প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিখন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। কিছুসংখ্যক শিশু নিয়ে সমাজের সুবিধাজনক স্থানে আগ্রহী কোনো ব্যক্তির সহায়তায় সাধারণত এই কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হয়। এসব কেন্দ্রে শিশুরা তাদের বয়সোপযোগী ছড়া, গান, গল্প ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের বিকাশের অর্জিত লক্ষ্যে পৌঁছায়।
- **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৫ বছর - ৬ বছর) (pre-primary education):** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির চূড়ান্ত ধাপ।

উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি বা স্কুল ট্রান্সজিশন একটি যৌথ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যেখানে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমান দায়িত্ব রয়েছে। (১) মাতা-পিতা বা পরিবার, (২) শিক্ষক ও বিদ্যালয় এবং (৩) কমিউনিটি বা সমাজ। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ দায়িত্বই পারে বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা প্রদান করতে। শিশুকে প্রথম দিন বিদ্যালয়ে এসে ক্রমাগত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে এবং নতুন নতুন মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়, যা তার সামর্থ্যের তুলনায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথাযথভাবে প্রস্তুত করে তোলা। গবেষণায় দেখা গেছে, ‘কিন্ডারগার্টেন কিংবা প্রাইমারি স্কুলে প্লে-গ্রুপ থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সময়কালে একটি শিশুর যে কর্মকাণ্ড সেটি তার পরবর্তী স্কুলজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বিদ্যালয়ই প্রত্যাশা করে তাদের প্রতিটি শিশু শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিদ্যালয়ে আসবে, যদিও বাস্তবতা হলো সব শিশু বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না (Position statement on school readiness 1990)। একটি শিশু যখন প্রথমবারের মতো বাড়ি থেকে স্কুলে পড়তে যায় তখন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকায় শিশুরা নানা সমস্যায় পড়ে। সহপাঠীদের সাথে তার মেলামেশায় সমস্যা হয়। শিক্ষকের কথা বুঝতে পারে না। স্কুলের নতুন সামাজিক পরিবেশে তার স্বাভাবিক আচরণ হারিয়ে ফেলে। ফলে কখনো কখনো সে এক ধরনের বিষণ্ণতায় ভুগতে শুরু করে। কোনো কোনো শিশুর বেলায় সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়, বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মের শিশুরা। অন্যদিকে কোনো কোনো শিশু ঠিকই স্কুলের নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য অপ্রস্তুতির কারণে হয়। বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা গবেষক, নীতি-নির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকগণ সবার কাছে চিন্তার বিষয়।

একটি শিশু তখনই বিদ্যালয়ে সফলতা খুঁজে পায় যখন তার মধ্যে বিদ্যালয় ও শেখা নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে; তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠীদের সহায়তামূলক সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে; তখন শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের কাজে ইতিবাচকভাবে অংশ নিতে পারে। আমাদের সমাজে এসবের অনেক কিছুই প্রায় অনুপস্থিত দেখা যায়, যা শিশুকে বিদ্যালয়ের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। আবার অনেক সময় আমরা শুধু বয়সের ভিত্তিতেই একটি ছেলে কিংবা মেয়েকে বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাই যখন কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়া বিদ্যালয়ে যায়, যা তার জন্য কোনো ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বয়ে আনে না। শিশু ধারাবাহিকভাবে পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে খাপ খাওয়াতে পারে না। শিশুর বিকাশ ও যত্নের বিষয়টি বাড়ি থেকে শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই বাড়ি ও বিদ্যালয়ে যারা শিশুর যত্ন ও বিকাশের সাথে সরাসরি জড়িত তাদের সকলের বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার। যে কারণে গবেষকগণ (Reference) বলে থাকেন, বাড়ি ও বিদ্যালয়ে শিশু যত্নের সঙ্গে যে বা যারা যুক্ত থাকবেন তাঁদের সকলকে কিভাবে শিশুর যত্ন ও শিক্ষায় সহায়তা করতে হয় তা ভালোভাবে জানতে হবে।

সর্বোপরি বলা যায়, শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি শিশুর সারা জীবনের শিক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি শিশুর বিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৩.৭ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিখন পরিবেশ (Learning environment)

জন্মলগ্ন থেকেই শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। শিশুর শিখন প্রক্রিয়ায় যে উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেটি হলো শিশুর চারপাশের পরিবেশ। যদিও আনুষ্ঠানিক অর্থে শিশুর শিখন পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই শিখন পরিবেশ শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। বাড়ি বা শিশুর পারিবারিক পরিবেশ হচ্ছে প্রথম জায়গা যেখানে শিশু সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগের মধ্য দিয়ে তার চারপাশের জগত সম্পর্কে জানার ও আনুষ্ঠানিকভাবে শেখার সুযোগ পায়। সেই অর্থে পরিবার হলো শিশুর জীবনের প্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিখন পরিবেশ ৫+ বয়সের শিশুর শিখন ও মনস্তত্ত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। তাই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া যে শিখন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পরিবেশ ঠিক বাড়ির মত পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক না হলেও, প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির মত পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রেণির পরিবেশ এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত যা শিশুকে যথাযথভাবে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে ধীরে ধীরে অভিযোজিত হতে সহায়তা করতে পারে। এই পরিবেশ তাই হতে হবে আনন্দময়, আরামদায়ক ও উষ্ণ যেখানে শিশু নিরাপদ বোধ করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে, শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং কোনভাবেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করবে না। সর্বোপরি পরিবেশটি হতে হবে শিশুবান্ধব, অর্থাৎ শিশুকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত যেখানে শিশু ইচ্ছেমত

খেলাধুলা, ছোটোছুটি ও কল্পনা করার সুযোগ পায়। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির দেয়ালের রং হতে হবে উজ্জ্বল ও বর্ণিল, পরিসর হতে হবে যথাসম্ভব বড় যাতে সকলে ইচ্ছেমত চলাফেরা করার সুযোগ পায়, দেয়ালে নানা ধরনের ছবি সংবলিত পোস্টার ঝোলানো থাকতে পারে, আসবাবপত্রগুলো হতে হবে শিশুর জন্য আরামদায়ক ও নিরাপদ, পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রি ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে থাকবে যাতে শিশু নিয়মিত এগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) করার সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের স্বত্বাধিকার (Ownership) প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আঁকা বিভিন্ন চিত্র, ছবি ও অন্যান্য কাজ প্রদর্শনের (Display) সুযোগ থাকতে হবে, যাতে তারা মনে করে এটি তাদের একান্তই নিজের জায়গা। মোটকথা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে শিশুর একান্ত নিজস্ব জগতের সাথে সংগতিপূর্ণ যা তাকে আনন্দ ও নিরাপত্তার অনুভূতি এবং সম্পৃক্ত হওয়ার উৎসাহ যোগাবে ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে উৎসাহিত করবে।

৩.৮ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিখন-শেখানো কাজে শিখন সামগ্রী ও উপকরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১১ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করে। প্রণয়নকৃত নতুন কারিকুলামের আলোকে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ হতে সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর ট্রাইআউট করা হয়েছে এবং ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে পরিমার্জিত শিখন-শেখানো সামগ্রী সারাদেশে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) ০৮ (আট) ধরনের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও বিতরণ করছে। শিখন-শেখানো সামগ্রী নিম্নরূপ:

১. শিক্ষক সহায়িকা
২. আমার বই
৩. স্বরবর্ণ চার্ট ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট
৪. ফ্লিপচার্ট
৫. ফ্লাসকার্ড (৭০টি কার্ডের একটি সেট)
৬. গল্পের বই (১০টি গল্পের বই এর একটি সেট)
৭. এসো লিখতে শিখি
৮. সম্পূরক শিখন সামগ্রী
৯. ছড়া, গান, খেলা ও ব্যায়াম
১০. হাজিরা খাতা ও মূল্যায়ন

নিম্নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ও ব্যবহার নির্দেশনা:

১. শিক্ষক সহায়িকা : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর মধ্যে অন্যতম ও প্রধান সামগ্রী হলো শিক্ষক সহায়িকা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত শিক্ষকের জন্য সকল তথ্য শিক্ষক সহায়িকাতে সন্নিবেশ করা আছে। শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিকের মূল শিখন শেখানো সামগ্রী। শিক্ষক মূলত শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করবেন। প্রতিবছর বিদ্যালয়ে এই সামগ্রীটি সরবরাহ করা হয়না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি মাত্র শিক্ষক সহায়িকা সরবরাহ করা হয়।

২. আমার বই : আমার বই মূলত শিশুদের জন ওয়ার্কবুক। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে আমার বই সরবরাহ করা হবে। শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশুরা ‘আমার বই’-এ কাজ করবে ও অনুশীলন করবে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিখনফল আমার বইতে প্রতিফলন ঘটানো হয়নি। সুতরাং ‘আমার বই’-এর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে করাতে হবে। প্রতি বছরে এটি সরবরাহ করা হয়।

৩. স্বরবর্ণ চার্ট ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্টে ছড়ায়-ছন্দে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিত করানো হয়েছে। এটি শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সব সময় ঝুলানো থাকবে। কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি বছরে এটি সরবরাহ করা হয়না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুই সেট করে সরবরাহ করা হয়।

৪. ফ্লিপচার্ট : পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় ফ্লিপচার্টে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। ফ্লিপচার্টে মোট ১৩টি পাতা রয়েছে। ফ্লিপচার্টের ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন পাতায় বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনার আলোকে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করবেন। এটি শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সব সময় ঝুলানো থাকবে। প্রতি বছরে এটি সরবরাহ করা হয়না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুই সেট করে সরবরাহ করা হয়।

৫. ফ্লাসকার্ড (৭০টি কার্ডের একটি সেট): এক সেটে মোট ৭০টি ফ্লাসকার্ড রয়েছে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ৫০টি বর্ণের জন্য ৫০টি বর্ণ কার্ড এবং ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ২০টি সংখ্যাকার্ডসহ প্রতি সেটে মোট ৭০টি কার্ড রয়েছে। এছাড়া বর্ণ ও সংখ্যা কার্ডের বর্ণ ও সংখ্যার পেছনে বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত রয়েছে। চিত্রগুলো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট (যেমন-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি)। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বর্ণ ও সংখ্যা কার্ডের পেছনের চিত্রের সাথে বর্ণ ও সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। বর্ণ, সংখ্যা ও পেছনের চিত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকগণ ব্যবহার করবেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪ সেট ফ্লাসকার্ড সরবরাহ করা হবে। এটি প্রতি বছর সরবরাহ করা হয়না।

৬. গল্পের বই (১০টি গল্পের বই এর একটি সেট): গল্পের বই-এর এক সেটে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের উপযোগী ১০টি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের বই রয়েছে। গল্পের বই ব্যবহারের পদ্ধতি ও নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা ও পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গল্পের বই দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম চালাবেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩ সেট গল্পের বই থাকবে। গল্পের বইগুলো হলো :

❖ লাল পোকার অপূর বিড়াল

- ❖ কোথায় আমার মা
- ❖ টিং টং এর কান্ড
- ❖ ফুল ফোটোর আনন্দ
- ❖ মজার মামা
- ❖ গল্প
- ❖ চাচা বাজারে যান
- ❖ বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি
- ❖ বেড়ানোর একদিন
- ❖ খুশি একদিন কুসুমপুরে।

গল্পের বই গুলো প্রতিবছর সরবরাহ করা হয়না। গল্পের বইয়ের আলোকে শিক্ষকসহায়িকায় নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক নিজ নিজ এলাকা প্রচলিত গল্প, ছড়া, গান ইত্যাদি শিশুদের শোনাবেন এবং শিশুদের দিয়ে বলতে উৎসাহিত করবেন।

৭. এসো লিখতে শিখি : ‘এসো লিখতে শিখি’ খাতা শিশুদের লেখার অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ। এটি ব্যবহারের নির্দেশনা ও পদ্ধতি শিক্ষক শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। লেখার কাজের জন্য খাতাটি ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি শিশুর জন্য একটি করে ‘এসো লিখতে শিখি’ খাতা সরবরাহ করা হবে। প্রতি বছর এটি সরবরাহ করা হবে।

৮. সম্পূরক শিখন সামগ্রী : উপর্যুক্ত শিখন উপকরণ ছাড়াও শিশুদের শেখা ও খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে খেলার জন্য হাড়িপাতিল, পুতুল, লেগোসহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সরাসরি এসব উপকরণ সরবরাহ করে না, তবে এজন্য বিদ্যালয়কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়া হয় যেন এসব উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। এসব উপকরণ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের ৪টি কর্নারে ব্যবহার করা হয়। নিচের ছকটিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রীর নামসহ ৪টি কর্নারে উপস্থাপিত হলো:

সারণি: কর্নারভিত্তিক সম্পূরক শিখন সামগ্রী

কল্পনার কর্নার	ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্নার	বই ও আঁকার কর্নার	বালি ও পানির কর্নার
১. অ্যালুমিনিয়ামের/ প্লাস্টিকের	১. কাঠের/ প্লাস্টিকের/ তৈরি	১. গল্পের বই: অপূর	১. প্লাস্টিকের তৈরি

তৈরি রান্না করার সামগ্রী (হাঁড়িপাতিল, কড়াই, চুলা) ২ সেট ২. অ্যালুমিনিয়ামের/প্লাস্টিকের তৈরি খাবার পরিবেশন করার সামগ্রী (৬টি থালা, ৬টি বাটি, ৬টি চামচ, ৬টি গ্লাস) ৩. মাটির/ কাঠের/ কাগজের তৈরি আসবাবপত্র (খাট, চেয়ার, ৪. টেবিল, আলনা) ২ সেট ৫. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি ৬. টেলিফোন ২টি, মোবাইল সেট ২টি ৭. কাপড়ের তৈরি পুতুল ৪টি (২টি বড়, ২টি ছোট) ৮. কাপড়ের তৈরি টেনিস বল (৪টি) ৯. মাটির তৈরি বিভিন্ন ফল (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আপেল, পেয়ারা, কমলা, ১০. নারিকেল, তাল) ১১. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি বিভিন্ন খেলনা (টেলিভিশন, গাড়ি, পশুপাখি) ১২. মাটির তৈরি বিভিন্ন মিস্তি সামগ্রী ১৩. কাগজের তৈরি রঙিন ফুল ১৪. পাটের/ খড়ের তৈরি বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, শিকার, থলে) ১৫. বাঁশ/ নারিকেল পাতা দিয়ে তৈরি ঝুড়ি (৪টি) ১৬. কাঠ/ কাগজ দিয়ে খেলনা বাদ্যযন্ত্র ১৭. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি পশুপাখি (২ সেট) ১৮. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি মাছ (১০ টি) ১৯. তেঁতুলের/ সিমের বিচি (১ বৈয়াম) ২০. বাঁশের/ পাটের কাঠি (৬ ইঞ্চি লম্বা- ১০০টি) ২১. পাটের/ খড়ের তৈরি বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, শিকার, থলে) ২২. বাঁশ/ নারিকেল পাতা দিয়ে তৈরি	বিভিন্ন আকৃতির ব্লক: বর্গাকার বিভিন্ন আকারের ৩০টি আয়তাকার, ৪০টি ত্রিভুজাকার, ২০টি কলাম, ২০টি কিউব, ৪ রঙের ৪০০, প্যাটার্ন ব্লক ৬ ধরনের ৬ রঙের ৬০০ পিস (ব্লক দিয়ে মজার খেলা বইসহ) ২. পাজল: ৮ টুকরা পাজল (৬টি), ১২ টুকরা পাজল (৬টি), ১৬ টুকরা পাজল (৬টি) ৩. বিন ব্যাগ - ৫টি ৪. থ্রেডিং টয়েজ (বিভিন্ন রঙের ৪০ পিছ)- ৪টি ৫. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি পশুপাখির সেট ৪ সেট ৬. বোতাম-১ বৈয়াম	বিড়াল, কোথায় আমার মা, টিং টিং এর কাভ, ফুল ফোটোর আনন্দ, মজার মামা, লাল পোকার গল্প, চাচা বাজারে যান, বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি, বেড়ানোর একদিন, খুশি একদিন কুসুমপুরে এ ধরনের আরো অনেক ছবির মাধ্যমে গল্পের বই রাখা যেতে পারে ২. আঁকার সামগ্রী ক্রেয়ন (বিভিন্ন রঙের) ৩. পেন্সিল-৩০টি, কাগজ-প্রয়োজন অনুযায়ী ৪. অন্যান্য উপকরণ, ছবি আঁকার বই, বর্ণের কার্ড, সংখ্যার কার্ড ৫. মোটা কাগজের তৈরি মুখোশ মুকুট এবং মুখোশ (৪টি)	গামলা (২৪ লিটার)- ২টি ২. পানি - আধা গামলা ৩. বালি - আধা গামলা ৪. প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন রঙের বাটি - ৬টি ৫. প্লাস্টিকের তৈরি মাছ - ১০টি ৬. প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন আকারের বোতল - ৬টি ৭. প্লাস্টিকের তৈরি নৌকা - ৪টি ৮. প্লাস্টিকের তৈরি ফানেল - ৪টি ৯. প্লাস্টিকের তৈরি ছাঁকনি - ২টি ১০. বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট পাথর (৩০-৪০টি) ১১. পেঁপে গাছের ডাটা ১২. প্লাস্টিকের তৈরি পানি মাপার কৌটা ইত্যাদি ভাসে এবং ডোবে ১৩. এমন প্রাকৃতিক ১৪. উপকরণ
---	--	--	--

ঝুঁড়ি (৪টি) ২৩. কাঠ/কাগজ দিয়ে খেলনা বাদ্যযন্ত্র ২৪. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি পশুপাখি (২ সেট) ২৫. প্লাস্টিকের/ মাটির তৈরি মাছ ২৬. (১০ টি) ২৭. তেঁতুলের/সিমের বিচি (১ বৈয়াম) ২৮. বাঁশের/ পাটের কাঠি (৬ ইঞ্চি লম্বা- ১০০টি) ২৯. প্লাস্টিকের/কাঠের তৈরি গাড়ি, ট্রাক (৪টি) ৩০. প্লাস্টিকের/ কাঠের/কাগজের/ মাটির তৈরি নৌকা (৪টি) ৩১. নারকেল পাতা/ প্লাস্টিকের তৈরি হাত ঘড়ি (৪টি) ৩২. লাফানোর জন্য দড়ি/স্কিপিং রোপ ৩৩. (৩ টি) ৩৪. বাঁশের তৈরি বাঁশি ৩৫. লেইসিং বোর্ড (তিনকোনা, চারকোনা, আয়তাকার, তারা)- ৪টি ৩৬. ডমিনো (ডট ও সংখ্যা) - ৪ সেট বিভিন্ন রঙের পাথর ৩৭. বিচি			
---	--	--	--

৯. ছড়া, গান, ব্যায়াম ও খেলা: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকায় ১৪টি গান, ২৬ টি ছড়া, ১৩টি গল্প, ১০ টি ব্যায়াম, ২০টি নির্দেশনার খেলা রয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ব্যবহার করে দৈনিক রুটিনে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষক এ কাজগুলো করবেন।

১০. হাজিরা খাতা ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় হাজিরা খাতার নমুনা শিক্ষক সহায়িকায় দেয়া হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় দেয়া নমুনার মতো করে শিক্ষক হাজিরা খাতা তৈরি করবেন। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির পাশাপাশি তাদের মূল্যায়ন রেকর্ড করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়বে। যেমন-পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোট ইটের টুকরা বা পাথর ইত্যাদি। পাঠ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষককে ক্লাস গুরু পূর্বেই প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ বা তৈরি করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের ইচ্ছেমতো খেলার জন্য চারটি কর্নারের বিভিন্ন উপকরণ শিক্ষক/শিক্ষিকা কমিউনিটির সহযোগিতায় এবং নিজে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। সেইসাথে অনেক উপকরণ নিজে তৈরি ও সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া শিক্ষক শিশুদের পিতা-মাতা ও স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় বিভিন্ন খেলনা সংগ্রহ করতে পারেন, তবে তা হতে হবে শিশুবান্ধব এবং নিরাপদ। তবে উপকরণ তৈরি ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যায়।

শ্রেণীকক্ষে সংগৃহীত উপকরণগুলো দীর্ঘদিন আকর্ষণীয় ও টেকসই রাখার জন্য যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেন অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। শ্রেণিতে বিভিন্ন কাজের সময় শিশুরা যেসব খেলনা তৈরি করবে শিক্ষক সেগুলোকেও কর্নারে দেয়ার জন্য সংরক্ষণ করবেন। উপকরণ সংরক্ষণে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিদিন কাজের শুরুতে যেখানে যে উপকরণ প্রয়োজন, সে অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজিয়ে রাখবেন। প্রতিদিন কাজ শেষে উপকরণগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন। এক্ষেত্রে শিশুদেরকে সম্পৃক্ত করে দায়িত্ব দেয়া যায়। তবে কোন কোন দায়িত্ব কে কে পালন করবে, তা দিনের শুরুতে শিশুদের জানিয়ে দিতে হবে। তাতে শিশুদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে উঠবে। স্থানীয় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে মনোযোগী হতে হবে।

শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী যে সমস্ত শিখন শেখানো সামগ্রী ও উপকরণ শ্রেণি পর্যায়ে পৌঁছানো প্রয়োজন যথাসময়ে যথাযথভাবে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য অনুপূঞ্জ বিশ্লেষণপূর্বক এই সামগ্রী ও উপকরণসমূহ উন্নয়ন করা হয়েছে বিধায় এগুলোর যথাসময়ে সরবরাহ ও কার্যকর ব্যবহার বিদ্যুত হলে কাজক্ষিত ফল অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া শিখন শেখানো কার্যক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের সামগ্রী/উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে শ্রেণি পর্যায়ে তাও নিশ্চিত করা জরুরি।

৩.৯ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার মত নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ/শিখনফল অর্জনকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রমের কাজক্ষিত শিখনফল অর্জন করে বিষয়বস্তু (content) এর মাধ্যমে যেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষাক্রম কাজক্ষিত যোগ্যতাসমূহ/শিখনফল অর্জন করে পরিকল্পিত কাজ/শিখন শেখানো কৌশল এর মাধ্যমে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ভিত্তিক নয়, যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিশুর জ্ঞানগত (cognitive) অর্জনকে প্রাধান্য না দিয়ে দক্ষতা (skill)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাসম্ভব কর্মকেন্দ্রিক এবং পরিকল্পিত কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীর লব্ধজ্ঞান ও দক্ষতার যোগসূত্র স্থাপন এক্ষেত্রে অপরিহার্য। শিখনে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, বহুমুখী শিখন কৌশল প্রয়োগের সুযোগসহ শিশুর

সামগ্রিক বিকাশই শিখন-শেখানো কার্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখানে মূল্যায়ন করা হয় শিশুর কার্যক্রমের ভিত্তিতে, পেপার-পেন্সিল টেস্টের মাধ্যমে নয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল কাজের মধ্যে রয়েছে শিশুদের শারীরিক ও চলনক্ষমতার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। এছাড়া শিশুরা যেন সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে তাও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় ও কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। শিশুরা বিভিন্ন কাজ ও খেলার মাধ্যমে তাদের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, চিন্তা এবং কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করা শিখবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কাজসমূহ এবং এসব কাজ করানোর পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

৩.৯.১ পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

শিশু পরিবার থেকে বিদ্যালয়ে আসার পর প্রথম যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা হচ্ছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। বিদ্যালয় যেহেতু বাড়ির পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুতরাং প্রথমেই শিশুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের একটি আন্তরিক ও আনন্দঘন পরিচিতি তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ নামে বেশ কিছু কাজ রাখা রয়েছে, যা বিদ্যালয়ের শুরুতেই শিশুদের নিয়ে করা হবে। বৈশ্বিক ধারণার আলোকে পরিবার থেকে বিদ্যালয়ে উত্তরণের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত এ কাজগুলো শিশুদের সহজ ও স্বতস্ফূর্তভাবে জীবনভিত্তিক শিখনযাত্রা শুরু করতে সহায়তা করবে। মূলত যেসকল কাজ নিয়ে পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ কার্যক্রম সাজানো হয়েছে তা হলো-

পরিচিতি	দৈনিক সমাবেশ
■ নিজের পরিচিতি ■ বিদ্যালয় পরিচিতি ■ সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি ■ শিখন সামগ্রীর পরিচিতি	■ শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় ■ জাতীয় সংগীত ■ ভাব বিনিময় ■ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

এখানে উল্লেখ্য যে পরিচিতির কাজগুলো শিক্ষক প্রথম মাসে করাবেন। পরবর্তীতে সারা বছরব্যাপী দৈনিক সমাবেশের কাজগুলো চলতে থাকবে।

নিম্নে পরিচিতি এবং সমাবেশ থেকে আলাদা আলাদা দুইটি কাজের শিখন শেখানো প্রক্রিয়া নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হলো।

পরিচিত: নিজের পরিচিতি

শিখন-শেখানো পদ্ধতি

- শিক্ষক প্রথমে নিজের পরিচয় শিশুদের দেবেন এবং স্পষ্ট করে নিজের নাম বলবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের নাম বলতে বলবেন।
- পরবর্তীতে প্রত্যেক শিশুকে নিজের নাম বলে তার পরের শিশুর নাম জিজ্ঞেস করতে বলবেন। আমার নাম, তোমার নাম কী?
- এবার শিশুদের প্রত্যেককে একটি করে আমার বই দেবেন।
- সবাইকে আমার বইয়ের পৃষ্ঠা. ২ খুলে ‘আমার ছবি’ বের করতে বলবেন।
- প্রত্যেক শিশুকে আমার ছবির বক্সে তার নিজের ছবি আঁকতে বলবেন।
- আঁকা শেষ হলে প্রত্যেকের বইয়ে আমার ছবির নিচে শিশুটির নাম লিখে বুঝিয়ে দেবেন যে এখানে তাদের নাম লেখা হয়েছে। এখন থেকে এই বইটি তার। পরবর্তীতে আমার বইয়ের যে কোনো কাজে শিশু যেন তার বইটিই পায় শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।
- পরবর্তীতে শিক্ষক শিশুদেরকে তাদের নিজের ছবি (সম্ভব হলে) আনতে বলতে পারেন এবং ছবি পেলে আমার ছবির বক্সে তা লাগিয়ে দিতে পারেন।

দৈনিক সমাবেশ: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শিখন-শেখানো পদ্ধতি

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- এজন্য করণীয় কাজগুলো হলো-নিয়মিত ঝাড়ু দেয়া, ঝুল পরিষ্কার করা ও উপকরণগুলো মুছে রাখা।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরের চারপাশ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- সকল কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব দেবেন এবং শিক্ষক নিজেও অংশগ্রহণ করবেন।
- খাবারের উচ্ছিষ্ট যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে এবং নির্দিষ্ট জায়গা না পেলে নিজে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে, এ বিষয়ে শিক্ষক সচেতন করবেন। শিক্ষক শিশুদের নিয়ে নিম্নলিখিত গান গাইতে গাইতে বিদ্যালয়ের মাঠ, বারান্দা ও আঙিনা পরিচ্ছন্নতার কাজ করবেন এবং বাড়িতেও যেন শিশুরা এভাবে করে তা বলবেন।

কাগজের টুকরা কাগজের টুকরা

পড়ে আছে ঐ পড়ে আছে ঐ

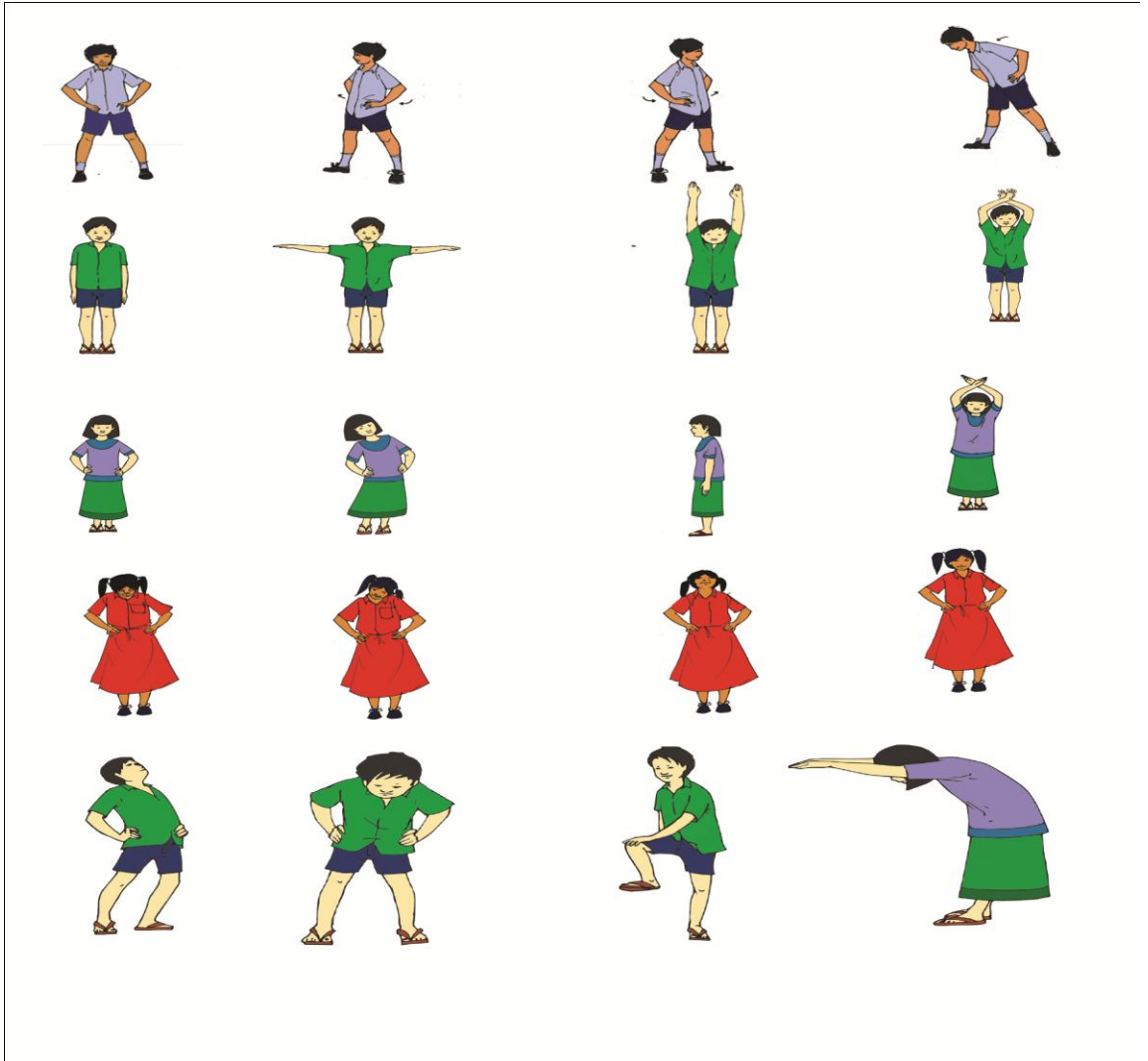
জায়গা করে নোংরা জায়গা করে নোংরা

তুলে নেই, বিনে ফেলে দেই।

- কাগজের টুকরার জায়গায় পড়ে থাকা বিভিন্ন রকম অন্যান্য জিনিসের নাম উল্লেখ করে শিক্ষক পরিচ্ছন্নতার কাজ করে শিশুদের শেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন-পোশাক, জুতা পায়ে স্কুলে আসা, গোসল, হাত ধোয়া, চুল, নখ, দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি বিষয় তদারক করবেন।
- খেলা অধ্যায়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বেশ কিছু খেলা রয়েছে, যা এখানেও খেলা যেতে পারে।
- শিশুদের বলে দেবেন প্রতিটি ক্লাস শেষে খাতা, কলম, খেলনা যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত দলকে কী কী কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে বলে দেবেন (যেমন : স্যান্ডেল বাইরে রাখা, খেলনা উপকরণ যেখানে-সেখানে ফেলে না রাখা, কাগজের টুকরা, খাবারের বর্জ্য ফেলে নোংরা না করা)।
- শিক্ষক লক্ষ রাখবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত দলের কাজগুলো শিশুরা সঠিকভাবে করছে কি না।
- শিশু একক বা দলীয় দায়িত্ব পালন করতে পারলে সবার সামনে হাততালি দিয়ে কাজের প্রশংসা করবেন যাতে পরবর্তীতে অন্য দল কাজে উৎসাহিত হয়।

৩.৯.২ ব্যায়াম

একটি কর্মক্ষম, হাসি-খুশি, সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য প্রত্যেক শিশুর সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন প্রয়োজন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যায়াম অন্যতম উপায়। ব্যায়াম শিশুদের পেশি সঞ্চালনের দক্ষতা এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক জড়তা নিরসন, আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য ব্যায়াম একটি কার্যকর মাধ্যম। এসব বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ১০টি ব্যায়ামের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হলো-১) হাঁটা, ২) হাতের ব্যায়াম-ফুলকপি, ৩) হাতের ব্যায়াম-হাত নাড়ানো, ৪) হাত ও ঘাড়ের ব্যায়াম-প্যাঁচা, ৫) ঘাড়ের ব্যায়াম-ঘাড় নাড়ানো, ৬) কোমরের ব্যায়াম-কোমর দোলানো, ৭) হাঁটুর ব্যায়াম, ৮) হাত ও পায়ের ব্যায়াম-তালি বাজানো, ৯) হাত-পা ও পিঠের ব্যায়াম : ডান-বাম দৃষ্টি, ১০) হাত ও পিঠের ব্যায়াম-হাতি।



চিত্র ১: বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অন্য কার্যক্রম গুরুত্ব পূর্বে পর্যায়ক্রমে ব্যায়ামগুলো করাতে হবে। ব্যায়াম করার সময় ধাপগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিক্ষক শিশুর অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্যই নিজে ব্যায়ামগুলো করে দেখাবেন। নিয়মিত এ ব্যায়ামগুলো করা হলে শিশুদের-

- হাত ও পায়ের পেশি সবল হবে।
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন-হাত, পা, ঘাড়, কোমর) সঞ্চালিত হবে।
- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়বে।
- অলসতা দূর হবে ও সতেজতা বৃদ্ধি পাবে।
- শরীরের ভারসাম্য রক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- শৃঙ্খলাবোধ বাড়বে।
- মনোযোগ বাড়বে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হবে।
- পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হবে।

৩.৯.৩ শিক্ষকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

- ব্যায়াম করানোর সময় শিশুর শরীরের কোনো অংশে ব্যথা বা অন্য কোনো রকম সমস্যা বোধ হচ্ছে কি না শিক্ষক তা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।
- ব্যায়ামের পর শিশুদের কিছু সময় বিশ্রাম (Relax) দেবেন।
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় মাসওয়ারি ব্যায়ামের তালিকার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম ৫টি ব্যায়াম, মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রথম ৫টি ব্যায়ামের সাথে নতুন একটি ব্যায়াম সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্যায়ামের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষক সেই অনুসারে ব্যায়ামের সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন।
- শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাদেরকে বাড়িতেও নিয়মিত ব্যায়ামগুলো করার জন্য উৎসাহিত করবেন।
- ব্যায়ামগুলো শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

৩.৯.৪ সৃজনশীল কাজ

প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে ছড়া, গান ও নাচ, গল্প, অভিনয়, চারু ও কারু এ কাজগুলোকে সৃজনশীল কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সৃজনশীলতা হল শিশুর নিজস্ব, নতুনত্ব, নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কোন কাজ। কোন কাজে বা দক্ষতায় নতুনত্ব ও স্বকীয়তা, নিজস্বতা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতা থাকতে হবে। শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গীতে ছড়া, গান, গল্প বলা এবং ছবি আঁকা, কোন কিছু বানানো বা তৈরি করা এবং কিছুকে দেখানো হল সৃজনশীলতা। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সৃজনশীল কাজ অন্যতম। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। শিশুদের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সৃজনশীল ক্ষমতা। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও কাজের মাধ্যমে সৃজনশীল দক্ষতার বিকাশ না ঘটলে শিশুর এই সম্ভাবনা কমে যায়।

বিভিন্ন বিষয়ে শেখা ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেক শিশুরই স্বকীয়তা ও শেখার নিজস্ব ধরন আছে। ইচ্ছেমতো খেলা শিশুর স্বকীয়তা বজায় রেখে সৃজনশীলতা প্রকাশের অন্যতম পদ্ধতি। এ ধরনের খেলার মাধ্যমে শিশু একাকী কিংবা অন্য শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী যা কিছু করতে চায় বা খেলতে চায় তাই করার সুযোগ পায়। শিশুর সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক সহায়িকায় ২৬টি ছড়া, ১৪টি গান, ১৩টি গল্প সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ১০টি গল্পের আলাদা আলাদা বই প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুদের সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে অভিনয় এবং চারু ও কারুতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

ছড়া

প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ২৬ টি ছড়া পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ২৪টি বাংলা এবং ২টি ইংরেজি ছড়া। শিশুরা বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সবগুলো ছড়া শিখবে। (শিক্ষক সহায়িকা পৃষ্ঠা-৫২)।

ছড়া শেখানোর নিয়ম

- শিশুদের ছড়া শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি ছড়া ভালোভাবে নিজে আয়ত্ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো ছড়াটি শিশুদের সামনে শুদ্ধ উচ্চারণে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে কয়েকবার
- আবৃত্তি করবেন এবং খুব সহজভাবে ছড়া অনুসারে কথা বলে পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে ছড়াটির প্রতি
- শিশুদের আগ্রহ তৈরি হয়।
- অতঃপর ছড়াটির দু'লাইন শিক্ষক নিজে সুন্দরভাবে আবৃত্তি করবেন এবং শিশুদেরকেও করতে বলবেন।
প্রথম দু'লাইন সবার আয়ত্ত্ব হলে পরের দু'লাইন শেখাবেন।
- এভাবে দু'লাইন দু'লাইন করে পুরো ছড়াটি শেখাতে হবে।
- যে সব শিশু আগে ছড়াটি আয়ত্ত্ব করতে পারবে তাদেরকে অন্য শিশুদের সামনে দাঁড় করিয়ে আবৃত্তি
- করতে উৎসাহ দেবেন।
- ছড়াটি সব শিশুর শেখা হয়ে যাওয়ার পর তারা হাততালি দিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, নেচে নেচে, বিভিন্নভাবে

➤ ছড়াটি আবৃত্তি করবে।

নির্বাচিত ছড়ার তালিকা

১. বাক বাকুম পায়রা	১০. আতা গাছে তোতা পাখি	১৮. ওয়ান গেল মাছ ধরতে
২. আয় আয় চাঁদ মামা	১১. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো	২০. ABCDEFG
৩. হাট্টিমা টিম টিম	১২. খোকন খোকন ময়না	২১. পিঁপড়া পিঁপড়া কয়টা
৪. খোকন খোকন ডাক পাড়ি	১৩. খোকা যাবে মাছ ধরতে	২২. জাম জামর কদবেল
৫. আম পাতা জোড়া জোড়া	১৪. আয়রে আয় টিয়ে	২৩. নখকাটি চুল কাটি
৬. নোটন নোটন পায়রা	১৫. গোল করো না	২৪. লাল শাক কচু শাক
৭. সিংহ মামা সিংহ মামা	১৬. সকালে উঠিয়া আমি	২৫. কমলাফুলি কমলাফুলি
৮. হুঁদুর ছানার ছড়া	১৭. Twinkle Twinkle	২৬. চড়ুই ডাকে কিচির মিচির
৯. ঐ দেখা যায় তাল গাছ	১৮. ভোর হলো দোর খোল	

গান

প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য পাঠ্যসূচিতে ১৪টি গান রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ছড়া গান, দেশাত্মবোধক ও আঞ্চলিক গান রয়েছে। সপ্তাহে ২ দিন করে মাসে ৯ দিনে ১ টি গান শিখবে ও পূর্বে শেখা গানগুলো অনুশীলন করবে যাতে শেখা গানগুলোর শব্দ, সুর, ছন্দ স্থায়ীভাবে অর্জন করতে পারে। উপকরণ : শিক্ষক সহায়িকা, ঘুঙুর, তবলা, হারমনিয়াম, জিপসি এবং স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র।

গান শেখানোর নিয়ম

- শিশুদের গান শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি গান নিজে ভালোভাবে আয়ত্ব করে নিবেন।
- প্রথমে পুরো গানটি শিশুদের সামনে গাইবেন এবং তারপর শিশুদের কাছে জানতে চাইবেন যে গানটি তাদের ভালো লাগছে কি না অথবা তারা শিখতে চায় কি-না।
- শিশুরা আগ্রহী হলে তাদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন এবং শিক্ষক গানটির প্রথম অংশ শিশুদের নিয়ে গাইবেন। একটি অংশ শিশুরা ভালোভাবে আয়ত্ব করার পর পরবর্তী অংশ শেখাবেন। গানের শব্দ, সুর, ছন্দ, শেখার পর শিশুরা হাততালি দিয়ে সকলে মিলে গাইবে।
- গানের কোনো শব্দ, ভাববস্তু বা অর্থ যদি মনে হয় বোঝানো প্রয়োজন তবে খুব সহজ ও সরলভাবে শিক্ষক শিশুদের তা বলবেন।
- এভাবে পুরো গানটি শিশুদের শিখাবেন।
- পুরো গানটি শেখা হলে শিশুদেরকে একাকী এবং দলে গাইতে উৎসাহ ও সহায়তা দেবেন।
- গানের সুর, তাল, লয় ইত্যাদি সঠিকভাবে শেখার জন্য এবং ভুল শোধরানোর জন্য বার বার চর্চা করতে হবে।
- গান গাওয়ার দলীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।



চিত্র ২: শিক্ষকের সহায়তায় শিশু গান শিখছে

গানের তালিকা:

১. ঝড় এলো এলো ঝড়	৬. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী	১১. মেঘের কোলে রোদ
২. মাথা, কাধ, হাটু, পায়ের পাতা	৭. আমরা সবাই রাজা	১২. এক ছিল টোনা
৩. লাল বুটি কাকাতুয়া	৮. আমরা করব জয়	১৩. প্রজাপতি
৪. আয় আয় চাঁদ মামা	৯. দোল দোল দোলনী	১৪. ক যে কলা খ যে খাই
৫. এমন মজা হয় না	১০. একদিন ছুটি হবে	

৩.৯.৫ ভাষার কাজ

ভাষা ভাবের বাহন, যোগাযোগের মাধ্যম। শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে তখন সে ইতিমধ্যে ভাষার বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করে আসে। যেমন-মাতৃভাষায় কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারা ও কথা বলার মাধ্যমে তার আবেগ-অনুভূতি প্রয়োজন মতো প্রকাশ করতে পারা। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের শোনা ও বলার দক্ষতাকে আরো শক্তিশালী করা, বর্ণমালার আনুষ্ঠানিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, আনন্দের সাথে অর্থপূর্ণভাবে কোনো বলা পড়া লেখার নানা কাজে শিশুকে সম্পৃক্ত করে শিশুর প্রারম্ভিক ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক সূচনা ঘটানো হয়।

এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

শোনা ও বলা	প্রাক-পঠন	প্রাক-লিখন
- কথোপকথন - অভিজ্ঞতার গল্প - পশুপাখির ডাক - পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ - নাম থেকে ধ্বনি	- ছবির গল্প পড়া - নাম পড়া - দেখে পার্থক্য বের করা - বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন - শব্দ পঠন	- ইচ্ছেমতো আঁকা - প্যাটার্ন আঁকা - বর্ণাংশ লিখন - বর্ণ লিখন - শব্দ লিখন

• ধ্বনির চর্চা ও ধ্বনি দিয়ে শব্দ বানানো • শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি • ধারাবাহিক গল্প বলা	• প্রতীক পড়া	
---	---	--

৩.৯.৬ গণিতের কাজ

যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক এ প্রারম্ভিক গাণিতিক ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুদের গাণিতিক ধারণা দেয়ার জন্য প্রাক-প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

প্রাক-গাণিতিক ধারণা	সংখ্যার ধারণা ও লেখা	যোগ-বিয়োগ
ডান-বাম, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন, ভারি-হালকা, বাহির-ভেতর, ওপর-নিচ, সামনে-পেছনে, উঁচুনিচু, কাছে-দূরে, বিভিন্ন আকার আকৃতি (বড়, ছোট, মাঝারি) ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজানো, রং, আকার-আকৃতি (গোল, তিনকোনা, চারকোনা) অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু শ্রেণিকরণ করা, বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমান ও পরিমাপ করা, বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে বণ্টন করা	‘১-২০’ পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গণনা, ছবি দেখে গণনা, ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট গণনা। সংখ্যা প্রতীক চিনতে ও বলতে পারা, যে কোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলানো, যে কোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলানো, সংখ্যা চিনতে ও বলতে পারা, যেকোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা মিলানো, যেকোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা মিলানো। সংখ্যা লিখতে পারবে।	(যোগফল ৯ এর বেশি হবে না এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না) বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে যোগ করতে পারা, এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ করতে পারা, যোগ সংক্রান্ত সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারা বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিয়োগ করতে পারা, এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার বিয়োগ করতে পারা, বিয়োগ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারা

নিচে প্রতিটি কার্যক্রম থেকে একটি করে কাজের নমুনা শিখন শেখানো পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

ক) প্রাক-গাণিতিক ধারণা নমুনা কাজ নং: ১. বিষয়বস্তু: ডান-বাম

উপকরণ: প্রয়োজন নেই।

শিখন শেখানো পদ্ধতি

- শিশুরা যে হাত দিয়ে ভাত খায় সে হাত তুলে দেখাতে বলবেন।
- একজন শিশুকে জিজ্ঞেস করুন সে যে হাত তুলেছে সেটি কোন হাত। সে না পারলে অন্যদের জিজ্ঞেস করবেন।
- এবার ক্লাসের সকল শিশুকে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন। শিশুদের ডান বললে ডান হাত ও বাম বললে বাম হাত উঁচু করতে বলবেন। এভাবে ৮ থেকে ১০ বার অনুশীলন করাবেন। শিশুদের দিয়েও একই প্রক্রিয়ায় অনুশীলনটি পরিচালনা করানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন কেউ ডান বললে বামহাত বা বাম বললে ডান হাত তুলে কিনা। এক্ষেত্রে শিশুদের সঠিক হাত উঁচু করতে সহযোগিতা করবেন।
- দুইজন দুইজন করে শিশুকে মুখোমুখি দাঁড়াতে বলবেন। শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন, তার সামনে দাঁড়ানো বন্ধুটির ডান হাত ও বাম হাত কোনটি। সামনে দাঁড়ানো বন্ধুর ডান ও বাম হাত কোনটি, এ বিষয়ে প্রত্যেকের ধারণা পরীক্ষার হওয়ার পর, ডান বললে সামনের বন্ধুর ডান হাত ও বাম বললে বাম হাত ধরতে বলবেন। এভাবে ৮ থেকে ১০ বার অনুশীলন করাবেন। শিশুদের দিয়েও একই প্রক্রিয়ায় অনুশীলনটি পরিচালনা করানো যেতে পারে।
- শিশুর দিক পরিবর্তনে ডান ও বাম পরিবর্তনের বিষয়টি বর্ণনা করবেন। এক্ষেত্রে নিচের কার্যক্রমটি পরিচালনা করা যেতে পারে-
- দুইজন শিশুকে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলবেন। যেকোনো একজন শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন তার বন্ধুটি তার কোন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এবার ঐ শিশুকে উল্টো ঘুরে দাঁড়াতে বলবেন। আবার জিজ্ঞেস করবেন তার বন্ধুটি এখন তার কোন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে শিশুদের দিকপরিবর্তনের কারণে বাম ও ডান পাশ পরিবর্তনের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। একইভাবে অন্য শিশুদের দিয়েও অনুশীলন করাবেন।

নমুনা কাজ নং: ২. বিষয়বস্তু: বিভিন্ন রকম আকৃতি

উপকরণ: গোলাকার প্লেট ও ত্রিভুজ আকৃতির বস্তু, বই এবং আমার বই।

শিখন শেখানো পদ্ধতি

- শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করবেন। একটি দলকে প্লেট, একটি দলকে বই ও একটি দলকে ত্রিভুজাকৃতির বস্তু দিবেন। প্রতিটি দল তাদের দেওয়া বস্তুটির আকৃতি নিয়ে দলে আলোচনা করবে। আলোচনার পর দলীয়ভাবে বস্তুটির আকৃতি খাতায় অংকন করবে এবং উপস্থাপন করবে। শিশুরা মৌখিকভাবে বস্তুটির আকৃতি কারণসহ বলবে। অন্যদল তাদের উপস্থাপনা লক্ষ্য করবে এবং প্রয়োজনে আকৃতি চিনতে সহায়তা করবে।
- এবার দলীয়ভাবে শিশুরা নিজেদের হাত ধরাধরি করে তিনটি আকৃতি প্রদর্শন করবে। এ কার্যক্রমে শিক্ষক শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- কারু কাজ হিসেবে শিশুদের নিয়ে কাগজ ও মাটি দিয়ে গোল, তিনকোণা ও চারকোণা আকৃতি তৈরির অনুশীলন করাবেন।
- খেলা নম্বর ২০ : আকৃতি বানাই অনুশীলন করানো যেতে পারে।
- এবার নতুন করে তিনটি দল গঠন করবেন। একদলকে শ্রেণির গোলাকার জিনিস, একদলকে ত্রিকোণাকার জিনিস ও আরেকদলকে চার কোণাকার জিনিস পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। দলে আলোচনা করে শ্রেণীতে কোনগুলো গোলাকার, কোনগুলো ত্রিকোণাকার ও কোনগুলো চার কোণাকার বস্তু আছে তা বলতে বলবেন। যদি কোন আকৃতির বস্তু না থাকে তাহলে কাগজ কেটে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করে এ কাজটি করা যেতে পারে। এভাবে গোলাকার, ত্রিকোণাকার ও চারকোণাকার আকৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা সুদৃঢ় করবেন।
- আমার বই এর ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা অনুশীলন করাবেন।

খ. সংখ্যার ধারণা ও লেখা

নমুনা কাজ নং: ১ বিষয়বস্তু: সংখ্যা ১ থেকে ২০ ধাপ-

১: সংখ্যা ছড়া

- শিশুদের সাথে নিয়ে প্রথমে আমার বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠায় সংখ্যা ছড়ার ১-৫ পর্যন্ত অংশ আবৃত্তি করবেন। বিভিন্নভাবে ছড়াটি আবৃত্তি করে শিশুরা সংখ্যার নামগুলো জানবে এবং সংখ্যার ধারাবাহিকতা শিখবে।
- শিশুদের গোল হয়ে বসে যে কোনো শিশু থেকে প্রথমে ১, পরের শিশু ২ তারপরের শিশু ৩ এভাবে ৫ পর্যন্ত গণনা করার পর পরের শিশু আবার ১ থেকে শুরু করবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ১-৫ সংখ্যা বার বার গণনা করতে দিবেন।

ধাপ- ২: বাস্তব উপকরণ গণনা

- শিশুদের বাস্তব উপকরণ (৫টি) যেমন- বিচি, পাথর, পাতা ইত্যাদি নাড়া-চাড়া করতে দিবেন এবং গুণতে বলবেন। প্রতিটি শিশু যাতে বিভিন্ন রকম বাস্তব উপকরণ গণনা করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবেন।
- আপনি যখন যেই সংখ্যা বলবেন, শিশুরা সেই সংখ্যক উপকরণ গণনা করে সামনে রাখবে।
- খেলা নম্বর-৩ নৌকা নিয়ে খেলাটি এখানে ১-৫ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করে খেলা যেতে পারে।

ধাপ-৩: অর্ধ-বাস্তব উপকরণ গণনা

- অর্ধবাস্তব উপকরণ (আমার বই ও সংখ্যা কার্ড) এর সাহায্যে সংখ্যার ধারণা দিবেন। বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ মিল করতে দিবেন। যেমন- আমার বই বা কার্ডে ৪টি ফল থাকলে শিশুদের সমান সংখ্যক বাস্তব উপকরণ মিল করতে দিবেন। সংখ্যা কার্ডের পিছনের ছবির সাথে সমান সংখ্যক বাস্তব উপকরণ মিল করতে দিবেন।
- সংখ্যা কার্ডের পেছনের ছবি ব্যবহার করে নৌকা নিয়ে খেলাটি খেলানো যেতে পারে।

ধাপ-৪ : সংখ্যা গণনা

- যখন যে সংখ্যা বা সংখ্যাগুলো শেখানো হবে সে সংখ্যাটি বোর্ডে লিখবেন। যে সংখ্যাটি বোর্ডে লেখা হয়েছে ততটি বাস্তব উপকরণ দেখাতে বলবেন। একইভাবে আমার বই বা সংখ্যা কার্ডের ঐ সংখ্যক বস্তুর ছবি মিলাতে বলবেন।
- সংখ্যা কার্ড ব্যবহার করে বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ মিলানোর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।
- ১-৫ সংখ্যা শেখানোর পর সেই সংখ্যার কার্ডগুলো নিয়ে পাঁচজন শিশুকে ডাকবেন। এক এক করে শিশুকে একটি কার্ড টানতে বলবেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সাথে শিশুদের সংখ্যা কার্ড মিলাতে বলবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে এ কাজটি করা যেতে পারে।
- অর্ধবাস্তব উপকরণ যেমন- কার্ডের চিত্র, আমার বইয়ে ব্যবহৃত চিত্রের সাথে সংখ্যা কার্ড মেলাতে দিবেন।
- সংখ্যা কার্ড দেখিয়ে “নৌকা নিয়ে খেলা” খেলতে দিবেন।
- আমার বই অনুশীলন করাবেন।
- চকবোর্ডে ছোট ছোট বৃত্ত আঁকবেন। একজন একজন করে শিশুকে ডেকে বিভিন্ন সংখ্যা কার্ড দেখিয়ে সেইসংখ্যক বৃত্ত ভরাট করতে বা কেটে দিতে বলবেন।
- আমার বই অনুযায়ী লেখার অনুশীলন করাবেন।

বিঃদ্র: একই পদ্ধতিতে ৬-১০, ১১-১৫ ও ১৬-২০ পর্যন্ত সংখ্যা শিশুদের নিকট পরিচিত করাতে হবে। তবে ১০ এর পরে গুণের ধারণা দিতে হবে। ৬-১০ এর ধারণার জন্য সংখ্যা ছড়া আমার বই পৃষ্ঠা ১০৬ এবং শিক্ষক সহায়িকা ছড়া নং ৮ অনুশীলন করানো যেতে পারে।

৩.৯.৭ খেলা

খেলা শিক্ষাক্রমের প্রায় সকল অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনেই সহায়তা করে এবং খেলা শিশুর দৈনন্দিন পছন্দনীয় কাজের মধ্যে অন্যতম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর জন্য খেলা হলো শেখার অন্যতম উপায়। বিভিন্ন বিষয়ে শেখা ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা যেমন একা একা ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করেনি তেমনি অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোট বা বড় দলে খেলতেও তাদের ভালো লাগে। এসব বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব খেলাকে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা- (ক) ইচ্ছেমতো খেলা ও (খ) নির্দেশনার খেলা।

ইচ্ছেমতো খেলা

ইচ্ছেমত খেলার সময় শিশুরা ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে ৪ কর্নারে সাজিয়ে রাখা উপকরণ নিয়ে ঘুরে ঘুরে ৪টি কর্নারেই খেলবে। শিক্ষক শিশুদেরকে শুধু ৪টি কর্নারের নাম বলবেন। শিশুরা তাদের পছন্দমতো কর্নারে গিয়ে সেখানে রাখা উপকরণ (এই পাঠের উপকরণ অংশে তালিকা দেয়া আছে) নিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো খেলবে। তবে কেউ ইচ্ছে করলে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে যে কোনো জায়গায় খেলতে পারবে। তাছাড়া খেলার সময় শিশুরা ইচ্ছেমতো খেলা (Free Play), নির্দেশনার খেলা (Guided Play)। শিশুরা যাতে এককভাবে, জোড়ায় জোড়ায় বা ছোট দলে তাদের পছন্দ অনুযায়ী মুক্তভাবে খেলতে পারে সেটাই ইচ্ছেমতো খেলার মুখ্য বিষয়।

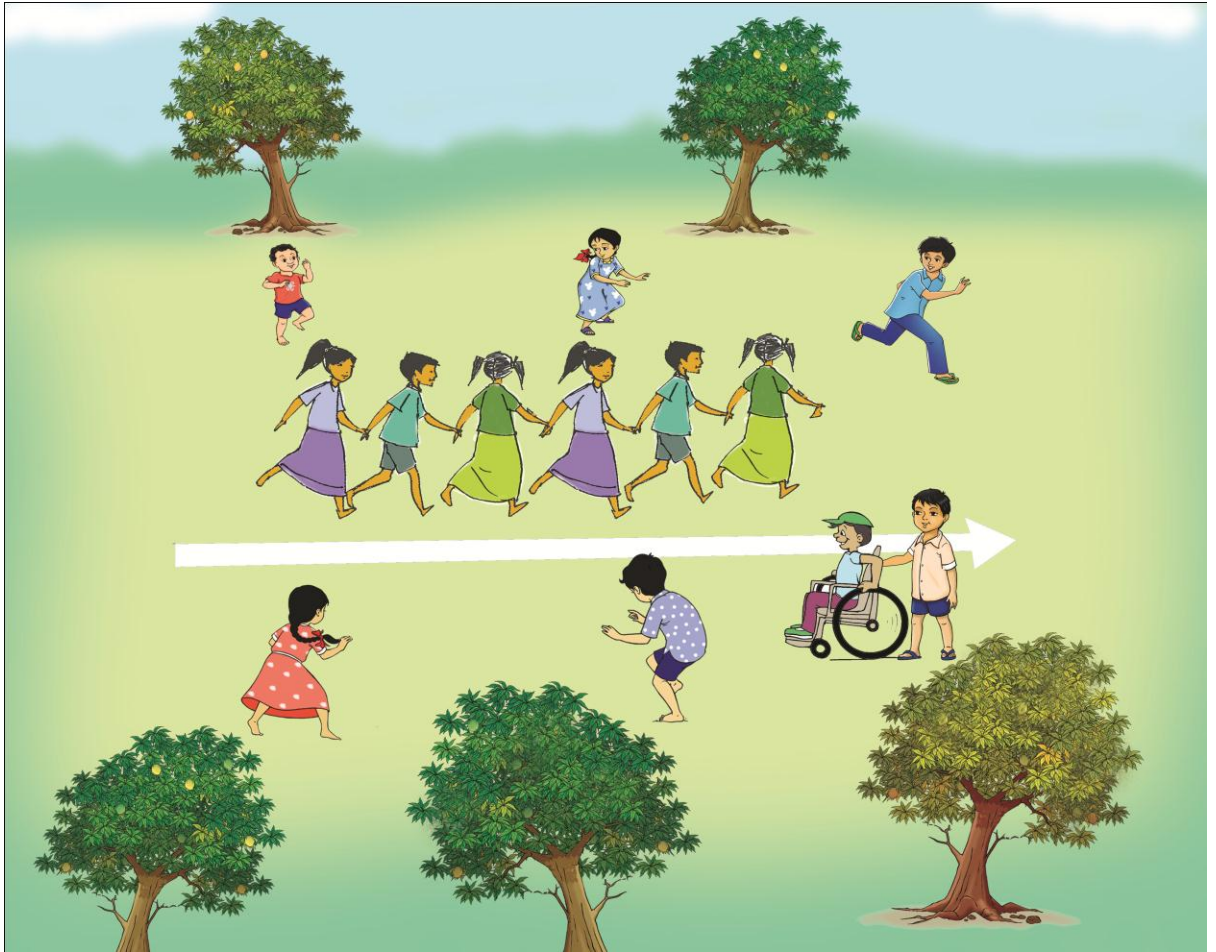


চিত্র : শিশুদের ইচ্ছেমত খেলার কয়েকটি দৃশ্য

ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনার নিয়ম

প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে খেলা একটি দৈনন্দিন কাজ। ইচ্ছেমতো খেলার সময় শিশুরা ৪টি ভাগে ভাগ হয়ে কর্নারে সাজিয়ে রাখা উপকরণ নিয়ে ঘুরে ঘুরে ৪টি কর্নারেই খেলবে। শিক্ষক শিশুদেরকে শুধু ৪টি কর্নারের নাম বলবেন। শিশুরা তাদের পছন্দমতো কর্নারে গিয়ে সেখানে রাখা উপকরণ নিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো খেলবে। তবে কেউ ইচ্ছে করলে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে যে কোনো জায়গায় খেলতে পারবে। তাছাড়া খেলার সময় শিশুরা এক কর্নারের উপকরণ অন্য কর্নারে নিয়ে যেতেও পারবে। শিশুরা যাতে এককভাবে, জোড়ায় জোড়ায় বা ছোট দলে তাদের পছন্দ অনুযায়ী মুক্তভাবে খেলতে পারে সেটাই ইচ্ছেমতো খেলার মুখ্য বিষয়। ৪ টি কর্নার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে রাখা হলেও শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যে কোনো উপকরণ নিয়ে খেলতে পারবে এবং তাদের পছন্দমতো কিছু তৈরি বা গঠন করতে পারবে। এসময় শিক্ষক তাদেরকে কোনো ধরনের নির্দেশনা না দিয়ে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখবেন, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করবেন। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই ইচ্ছেমতো খেলা পরিচালনা করতে হবে।

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য উপকরণগুলো সব সময় বাইরে থেকে না-ও পাওয়া যেতে পারে বা আংশিকভাবে পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক অভিভাবকদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে যা সহজলভ্য বা তৈরি করা সম্ভব সেসব উপকরণ বিভিন্ন কর্নারে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন-মাটি দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র, কাঠের ব্লক, বাঁশের টুকরা, পাতার তৈরি বিভিন্ন বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, পাথর, বিচি, কাগজের তৈরি মুখোশ, বোতলের তৈরি ঝুনঝুনি, বোতাম, দড়িলাফ খেলার দড়ি ইত্যাদি। শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের খেলনা বানিয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করে কিংবা সমাবেশে তাঁদের দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে খেলনা তৈরি করিয়ে কেন্দ্রে শিশুদের খেলার জন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া শিশুরা চারু ও কারু ক্লাসে যেসব উপকরণ তৈরি করবে তা-ও শিক্ষা কেন্দ্রে ইচ্ছেমতো খেলার জন্য থাকতে পারে।



চিত্র : শিশুরা নিয়ম মেনে খেলছে

ইচ্ছেমতো খেলায় শিক্ষকের করণীয়

ইচ্ছেমতো খেলা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক মূলত: দুই ধরনের কাজ করবেন—

- প্রস্তুতিমূলক কাজ এবং
- খেলা চলাকালীন কাজ।

প্রস্তুতিমূলক কাজ

- চারটি কর্নারকে উপকরণ দিয়ে সাজাবেন।
- কর্নারের সব উপকরণ একসাথে না দিয়ে কিছু উপকরণ রেখে দেবেন। পরে বাকি উপকরণ দিয়ে আবার কিছু উপকরণ তুলে রাখবেন। এভাবে কর্নারের উপকরণে বৈচিত্র্য আনবেন।
- প্রতিটি কর্নারের ধরন অনুযায়ী উপকরণগুলো এক জায়গায় রাখবেন, যেমন-বড় ব্লকগুলো এক জায়গায়, কিউবগুলো এক জায়গায়, তিনকোনাগুলো এক জায়গায়।
- উপকরণগুলো কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইনে সাজিয়ে রাখবেন না, এতে শিশুরা মনে করতে পারে এ উপকরণগুলো দিয়ে এভাবেই ডিজাইন করতে হয়।
- চারটি কর্নার সম্পর্কে শিশুদের বুঝিয়ে বলবেন।
- কোনো কর্নারে নতুন উপকরণ যোগ হলে তা শিশুদের জানাবেন।

খেলা চলাকালীন কাজ

- শিশুদেরকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী ৪টি ভাগে ভাগ হতে বলবেন।
- কে কী খেলবে বা কার সাথে খেলবে তার পরিকল্পনা করতে বলবেন এবং শিশুদের সাথে নিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ইচ্ছেমতো কর্নারে গিয়ে খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদেরকে ঘুরে ঘুরে ৪টি কর্নারেই খেলতে উৎসাহিত করবেন।
- কোনো নির্দিষ্ট কর্নারে যদি বেশি ভিড় হয়, তাহলে খালি কর্নারে গিয়ে শিক্ষক নিজেই খেলবেন। শিক্ষককে খেলতে দেখে দু-এক জন শিশু তার সাথে খেলতে উৎসাহী হবে। যদি কোনো শিশু খালি কর্নারে খেলতে উৎসাহী না হয় তাহলে জোর করবেন না।
- শিশুরা যদি কোনো উপকরণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, সেক্ষেত্রে তাদের কোনো একটি আকর্ষণীয় উপকরণ দিয়ে আকৃষ্ট করে কাড়াকাড়ি থামাবেন।
- কোনো শিশু খেলতে উৎসাহিত না হলে তাকেও অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করবেন।
- শিশুরা যেন অন্য সাথির মতো একই ধরনের খেলা না করে নিজস্ব কিছু করে, তাদের খেলায় যেন সৃজনশীলতা থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

- শিশুরা যেন একই খেলা বারবার বা প্রতিদিন না করে সে দিকটিতে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।
- শিশুদের অভিনয়মূলক খেলায় উৎসাহিত করবেন।
- বই ও ছবির কর্নারে যেসব বই থাকে শিশুরা বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখার সময় তারা যদি তারা গল্প শুনতে শিক্ষক তাদের গল্প পড়ে শুনাবেন।
- কর্নারে খেলার সময় শিশুরা যেসব ছবি আঁকে সেই ছবিতে তাদের নাম ও তারিখ লিখে দিয়ে সেগুলো শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন।

নির্দেশনার খেলা

নির্দেশনার খেলার (Guided Play) তালিকায় খেলার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় রেখে মোট ২০টি খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খেলাগুলো সহজ থেকে কঠিন (Easy to Complex) এই নিয়ম অনুসারে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে।

১. রেলগাড়ি বিকষিক	৮. আয়না	১৫. তোমরা কি সব বলতে পারো
২. কাকে তুমি বন্ধু চাও	৯. রং ছোঁয়া	১৬. কানামাছি ভোঁ ভোঁ
৩. নৌকা নিয়ে খেলা	১০. ওপেনটি বাইস্কোপ	১৭. ইঁদুর-বিড়াল
৪. রহস্যভরা থলে	১১. স্মৃতির খেলা	১৮. সাতকাহন
৫. ইচিং বিচিং চিচিং চা	১২. যত পারো তুলে নাও	১৯. বর্ণ চেনার খেলা
৬. পাখি ওড়ে	১৩. ফুলটোকা	২০. আকৃতি বানাই
৭. বল তো কী ভাবছি	১৪. এসো বল খেলি	

শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষক শিশুদের নিয়ে এই খেলাগুলো খেলবেন। শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়া শিশুদের নিয়ে শিক্ষক স্থানীয় খেলাও বিভিন্নভাবে খেলতে পারেন। তবে খেলায় রাখতে হবে খেলাগুলো যেন প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বয়স উপযোগী হয় এবং শিশুরা যেন সহায়ক নিরাপদ পরিবেশে খেলতে পারে।

নির্দেশনার খেলা পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

বার্ষিক এবং সাপ্তাহিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক পর্যায়ক্রমে খেলাগুলো পরিচালনা করবেন। এই খেলাগুলো খেলার জন্য শিশুরা যাতে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা-ছোটাছুটি করতে পারে সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হবে। তাই শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুরা খেলতে পারলেই ভালো। তবে বাইরে জায়গার অভাব থাকলে শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই খেলাগুলো করাতে হবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে খেলা হলে খেলা শেষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শিশুদের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসতে হবে। শিশুদের সাথে শিক্ষক নিজেও খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ, ভীতিহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি খেলা পরিচালনা করবেন। তবে সব খেলার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নিয়মসমূহ শিক্ষক মেনে চলবেন:

- খেলা পরিচালনা করার আগে খেলার নির্দেশনা পড়ে খেলাটি পরিচালনার নিয়ম আয়ত্ত করে নেবেন।
- উপকরণের প্রয়োজন হলে আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন।

- খেলা শুরু করার আগে খেলার নিয়মাবলি শিশুদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে খেলাটি শিশুদের দিয়ে খেলাবেন।
- খেলায় সব শিশু যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- যে কোনো খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- কোনো খেলা শিশুদের আয়ত্তে এলে তাদের দিয়ে খেলা পরিচালনা করাবেন। পর্যায়ক্রমে যাতে প্রত্যেক শিশু খেলা পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

অন্যান্য কাজ ও প্রজেক্ট ওয়াক:

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর জন্য আমাদের চারপাশের পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও প্রজেক্ট ওয়াক ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

পরিবেশ	বিজ্ঞান	প্রযুক্তি	স্বাস্থ্য	নিরাপত্তা	সমাপনী	প্রজেক্ট ওয়াক
যা নিয়ে আমাদের পরিবেশ আমার প্রিয় জিনিসগুলো ফসলের মাঠ, নদী, পাহাড়, বন, সাগর আমার কাছের মানুষগুলো আমার প্রিয় প্রাণী আমার সারা দিন: দিনের বিভিন্ন অংশ গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকাল বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প বাড়ি ও বিদ্যালয় রাখবো পরিচ্ছন্ন গাছপালা ও পশুপাখি আমার বন্ধু	কী হচ্ছে কেন হচ্ছে রৌদ্র-ছায়ার খেলা ভাসা-ডোবার খেলা বাতাসে পাতা নড়ে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় সুইচ টিপলে বাতি জ্বলে জড় ও জীব উদ্ভিদ ও প্রাণী	সাধারণ সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি ঘুরে বেড়াই যানবাহনে প্রচলিত ও পরিচিত প্রযুক্তি আমরা সবাই কাছাকাছি	আমার শরীর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বিষয়ক কথকতা হরেক রকম খাবার দাবার নিরাপদ পানি খাবার আগে ও পো বিশ্রাম অসুস্থতা	নিরাপত্তা সাঁতার পথ চলি নিয়ম মেনে রাস্তা পারাপারের খেলা বিপদে আমি ভয় করি না হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ	উল্লেখযোগ্য কাজ নিয়ে আলোচনা শিশুদের থেকে জানা শিশুদের হাজিরা শ্রেণিকক্ষ গুছিয়ে রাখা হাত ধোয়া বিদায় জানানো	পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ বীজের অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া আমাদের পছন্দের ফুল, ফল, সবজি ও মাছ

৩.১০ কয়েকটি বিশেষ শিখন-শেখানো পদ্ধতি

উপরে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিখন শেখানো কাজ ও এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এর বাইরেও প্রাক-প্রাথমিক স্তরে কয়েকটি বিশেষ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিচে এরকম কয়েকটি বিশেষ শিখন-শেখানো পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো—

৩.১০.১ চেইন ড্রিল

এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন শিখনক্ষেত্র ও বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে শিশুরা সম্মিলিতভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের ধারণা বা অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাবে। চেইন ড্রিলের মূল বিষয় হলো, একজন একটি কাজ বা ধারণা শুরু করবে এবং বাকিরা ধারাবাহিকভাবে একজন একজন করে সেখানে তাদের নিজস্ব কাজ বা মতামত সংযুক্ত করে কাজটিকে বা ধারণাটিকে একটি অর্থপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাবে। যেমন-একজন একটি গল্প শুরু করে তাতে অন্য সবাই নিজেদের সৃজনশীল ধারণা যুক্ত করে গল্পটির একটি সফল পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। আবার কোনো একটি কাজ একজন শুরু করতে পারে এবং সেখানে ধারাবাহিকভাবে অন্যরা যুক্ত হয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে।

নিচে ভাষার কাজের ধারাবাহিক গল্প বলা অংশে কিভাবে চেইন ড্রিল ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হলো:

- শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে বসবেন। সবাইকে বলবেন, “আমরা সবাই মিলে আজ একটি গল্প তৈরি করব। প্রথমে আমি গল্প বলা শুরু করব। তারপর যে জায়গায় আমি থেমে যাব, সেখান থেকে আমার পরের জন শুরু করবে। এভাবে একে একে সবাই মিলে গল্পটি চালিয়ে যাব।”
- এবার শিক্ষক মজা করে একটি গল্প বলা শুরু করবেন। এক্ষেত্রে গল্পটি শিক্ষক নিজেই তৈরি করে বলতে পারেন বা তার জানা কোনো গল্প বলতে পারেন; যেমন -একটি ডোবার পাশে থাকত একটি ব্যাঙ। তার ছিল একটি ছানা। ছানার নাম বেন্দু। মা আর ছানা দুজনে মিলে সারাদিন ডাকে -ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ [শিশুদেরকে সাথে নিয়ে বলবেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ]। হঠাৎ একদিন বেন্দু গেল হারিয়ে.....
- এবার শিশুদের একে একে গল্পটি চালিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবেন। কারো বলতে অসুবিধা হলে সহায়তা করবেন। গল্পটি কোথাও থেমে গেলে শিক্ষক নিজে চেইনে অংশগ্রহণ করে গল্পটিতে নতুন মোড় বা আকর্ষণ যোগ করবেন। এভাবে শিশুরা যতক্ষণ আনন্দ পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক কাজটি করবেন।

৩.১০.২ ছবি বর্ণনা বা ছবির গল্প পড়া

ছবির বর্ণনা বা ছবি থেকে গল্প পড়ার কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদেরকে একটি ছবি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করানো ও ছবির ভেতরের বিভিন্ন উপাদান/ অংশ শনাক্ত করার দক্ষতা অর্জন করানো। এর মাধ্যমে শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সৃজনশীল দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বলার বা উপস্থাপন করার দক্ষতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রথমে ছবি বা চিত্র ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। চিত্রটি সম্পর্কে নিজের মতো করে একটি ধারণা তৈরি করবে। চিত্রটি সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করবে। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আমার বইয়ের ১৫ থেকে ২৪ পৃষ্ঠায় কিছু ছবি দেয়া আছে। প্রথমে একক ছবি, তারপর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ছবি

রয়েছে। একক ছবি পড়ার পর শিশুরা একাধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছবি পড়ার কাজ করবে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ১০টি গল্পের বই রয়েছে, সে অংশেও এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নিচে ভাষার কাজের ছবির গল্প পড়া অংশে কিভাবে ছবি বর্ণনা বা ছবির গল্প পড়া ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হলো:

- শিক্ষক প্রথমে শিশুদের ৪টি ছোট দলে বসতে বলবেন।
- তারপর আমার বইয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা (পৃষ্ঠা ১৬-১৭) খুলতে বলবেন। ছবিটি/ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবিতে কী কী আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলবেন। এভাবে শিশুর মাঝে ছবি পড়ার/বোঝার দক্ষতা তৈরি হবে।
- ছবিতে গল্পের ক্ষেত্রে (পৃষ্ঠা ১৮-২০ ও ২১-২৪) শিশুরা ছবি দেখে ঘটনা পরম্পরা বোঝার চেষ্টা করবে এবং ছবিগুলো দিয়ে একটি গল্প তৈরি করার চেষ্টা করবে। গল্পগুলো হলো-হাঁস ও মুরগি এবং হাঁসের ছানার লেজ।
- এরপর শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে গল্পটি শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অনেক সময় শিশুরা গল্পটি মূল গল্পের থেকে ভিন্নভাবেও বলতে পারে। শিক্ষক এই ভিন্নতাকে বাঁধাগ্রস্ত না করে বরং উৎসাহিত করবেন।

৩.১০.৩ প্রাত্যহিক কাজের অনুশীলন

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুদের নিজের কাজ নিজে করার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিশুদের আত্মসম্মানবোধ অর্জন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই বয়স থেকে তাদের জন্য প্রযোজ্য কাজগুলো নিজে নিজে করার অভ্যাস তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত প্রাত্যহিক যেসব কাজের সাথে শিশুরা সংশ্লিষ্ট, সেসব কাজ যাতে শিশুরা নিজে নিজে করে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

নিচে শিক্ষক সহায়িকার অন্যান্য কাজ ও প্রজেক্ট ওয়ার্কের স্বাস্থ্য বিষয়ে ‘খাবার আগে ও পরে হাত ধোয়া’ অংশে কিভাবে প্রাত্যহিক কাজের অনুশীলন ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হলো:

- শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন-খাবার আগে ও পরে কোনো কাজটি করা অবশ্যই প্রয়োজন? শিশুদের মধ্য থেকেই হাত ধোয়ার বিষয়টি বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে। হাত ধোয়ার উপকারিতা ও হাত না ধুয়ে খাবার খেলে কী ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবেন।
- খাবার আগে নিজের খাবার প্লেট নিজে ধুয়ে খেতে বসা এবং খাবার শেষে তা নিজেই পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা প্রতিটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষের জন্য অবশ্য করণীয়। এ নিয়ে শিশুদের সাথে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।

- শিশুদের উৎসাহিত করবেন, যাতে প্রত্যেকেই বাড়িতে খাবার আগে ও পরে নিজের খাবার প্লেট ও হাত নিয়মিত পরিষ্কার করে।
- ফ্লিপ চার্টের পৃষ্ঠা ৯ দেখিয়ে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অনুশীলন করা যেতে পারে।
- পরিষ্কার পাত্রে খাবার ঢেকে রাখার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করবেন।
- ফল পানি দিয়ে ধুয়ে খাবার বিষয়ে শিশুদের মতামত নেবেন ও উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ৪টি দলে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দলে খাবার আগে, খাবার সময় ও খাবার পরের পুরো প্রক্রিয়া, সেই সঙ্গে খাবার আগে ফলমূল ধুয়ে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে অতিরিক্ত খাবার পরিষ্কার পাত্রে ঢেকে রাখার ভূমিকাভিনয় করাবেন।
- অভিভাবক সভায় শিশুদের বাড়িতে নিয়মিত খাবার আগে ও পরে নিজের খাবার প্লেট ও হাত পরিষ্কার করা, খাবার ঢেকে রাখা, ফল ধুয়ে রাখার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে উৎসাহ দিতে বলবেন এবং শিশুরা নিয়মিত তা না করলে শিক্ষককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করবেন।

৩.১০.৪ পরিদর্শন

যেসব ক্ষেত্রে শিশুদের আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করা হয় তা পরিদর্শন হিসেবে বিবেচ্য। শিশুরা মূলত তার পরিবেশ থেকে শেখে। তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করা এবং সে সম্পর্কে তার নিজের ধারণা তৈরি হওয়া শিশুদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শন পদ্ধতিতে শিশুরা সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় অবলোকন বা পর্যবেক্ষণ করে। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে শিশুদের দ্বারা পরিলক্ষিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা বা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি শিশু নিজের পর্যবেক্ষণ বিষয়ে সকলের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পায়।

নিচে শিক্ষক সহায়িকার অন্যান্য কাজ ও প্রজেক্ট ওয়ার্কের পরিবেশ বিষয়ে যা নিয়ে আমাদের পরিবেশ অংশে কিভাবে পরিদর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখানো হলো:

- শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন। অতঃপর তাদের বলবেন “আজ আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী জিনিস আছে তা দেখব।”
- এ কাজের জন্য শিশুদের সবাইকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন। খেয়াল রাখতে হবে শিশুরা যেন খুব বেশি দূরে না যায় এবং ছোট্টাছুটি না করে। শিশুরা প্রত্যেকে আশেপাশে যা কিছু দেখেছে তা মনে রাখতে বলবেন। দেখা শেষ হলে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনবেন।
- এবার শিশুদের বলবেন ‘তোমরা যা কিছু দেখেছ তা একজন একজন করে বলো।’ শিশুদের উত্তর বোর্ডে লিখে একটি তালিকা তৈরি করবেন। তালিকাটি শিশুদের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাবেন।

- এবার প্রথমে আমার বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠার চিত্র ‘আমার পরিবেশ’ এবং পরে চার্টের পৃষ্ঠা ১, ২ ও ৩ প্রদর্শন করে আশেপাশের গাছপালার পাশাপাশি মাছ, পশুপাখি, সূর্য, চাঁদ, যানবাহন, মাটি, পানি ও বাতাস যে আছে তা মুখে বলতে বলবেন।
- বিদ্যালয়ের আশেপাশে শিশুরা যা দেখেছে তার একটি করে ছবি আঁকতে বলবেন। আঁকা শেষে ছবি দেয়ালে লাগানো কাগজে আঠা দিয়ে লাগাতে বলবেন। এভাবে একটি বড় পোস্টার তৈরি করতে বলবেন। পোস্টারটি দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবেন।

৩.১০.৫ কার্যকারণ অনুসন্ধান

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তোলার জন্য, বিভিন্ন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, শিশুদের নিয়োজিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। শিশুরা বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে। ঘটনার পেছনের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। দলে বসে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করবে। কার্যকারণ অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

এখানে শিক্ষক সহায়িকার অন্যান্য কাজ ও প্রজেক্ট ওয়ার্কের বিজ্ঞান বিষয়ে ‘কী হচ্ছে কেন হচ্ছে’ অংশে কীভাবে কার্যকারণ অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখানো হলো:

বাতাসে পাতা নড়ে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়

শিশুদের শ্রেণির বাইরে একটি গাছের কাছে নিয়ে যাবেন। গাছের পাতা নড়াচড়া করছে কি না পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এবার প্রশ্ন করবেন।

- তোমরা কি বলতে পারো গাছের পাতা কেন নড়ছে? শিশুদের উত্তরগুলো শুনবেন। শিশুরা যা-ই উত্তর দিক তার প্রশংসা করবেন। সম্ভব হলে তাকে অন্য শিশুদের বলা কারণ নিয়ে মন্তব্য করতে বলবেন।
- এবার গাছের পাতা বাতাসে নড়ে তা সবাইকে বলবেন।
- কিছু ছোট কাগজের টুকরা ফ্লোরে বা টেবিলে রেখে শিশুদের ফুঁ দিতে বলুন। কেন কাগজগুলো নড়ে উঠল তা জানতে চান।
- শিশুদের কাগজ দিয়ে কাগজের পাখা বানাতে সহায়তা করবেন। কাগজের পাখা দিয়ে বাতাস করে গাছের পাতা বা কোনো হালকা জিনিস নাড়াতে বলবেন। কেন নড়ল তা আলোচনা করবেন।
- এবার প্রত্যেক শিশুকে ছোট ছোট কাগজ ব্যবহার করে চরকি বানাতে বলবেন। কীভাবে চরকি বানাতে হয় তা শিশুদের দেখিয়ে দেবেন। চরকি বানানো শেষ হলে প্রত্যেককে চরকি নিয়ে দৌড় দিতে বলবেন। চরকি কেন ঘোরে তা শিশুদের কাছে জানতে চান।

- এভাবে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে বাতাসে পাতা নড়ার বিষয়টি শিশুরা বুঝবে।
- শিশুদের শ্রেণির বাইরে খোলা আকাশ দেখতে দেবেন। খোলা আকাশে সাদা তুলার মতো ভেসে বেড়ানো জিনিসগুলোর নাম কী জানতে চান। শিশুর উত্তরে সহায়তা করে বলবেন-এগুলো মেঘ।
- এবার অন্য আর একদিন বৃষ্টি গুরুর আগে আকাশে মেঘ দেখতে দেবেন। মেঘ দেখতে কেমন প্রশ্ন করে জেনে নিন। অথবা বৃষ্টি যখন হয় তখন আকাশ কেমন থাকে তা শিশুদের কাছে জানতে চান। এ মেঘ কেন কালো হলো তা বলতে বলবেন। শিশুদের উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন। বলবেন-সাদা মেঘ ভারি হলে কালো হয়ে যায়। এ কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।
- শিশুদের মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ার ছবি আঁকতে বলবেন।
- এভাবে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন।

৩.১১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড

গুণগত মান বজায় রেখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই শিশুর সহায়তা ও জীবনব্যাপী শিখনের মজবুত ভিত্তি স্থাপন এবং অন্যান্য সুফল অর্জন করা সম্ভব। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কাজক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করে কিছু নির্দেশক বা মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়েছে। এই মানদণ্ডগুলো প্রচলিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুবান্ধব এবং গুণগত মান অর্জনের পথ আরো সুগম করবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, এগুলোকে ক্ষেত্র হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৮টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি মূল ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটি করে উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে। মানগুলোকে বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যাতে গুণগত মানের সাথে কাজক্ষিতমানের সেতুবন্ধ করা যায়।

৩.১১.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাবাস্তবায়ন মানদণ্ডের মূলক্ষেত্র ও উপাদানসমূহ

জাতীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুণগতভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মানদণ্ডসমূহকে আটটি ক্ষেত্রে বিন্যাস করা হয়েছে। এগুলো হলো-

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (১) ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশ | (২) শিখন শেখানোর পরিবেশ |
| (৩) কর্মী সংক্রান্ত | (৪) মনিটরিং এবং সুপারভিশন |
| (৫) পিতা-মাতা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ | (৬) প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন |
| (৭) ব্যবস্থাপনা এবং | (৮) প্রশাসনিক। |

প্রতিটি ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটি করে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। এসকল উপাদানের ভিত্তিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে মানদণ্ড এবং উপাদানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করা হলো:

১. **কাঠামোগত পরিবেশ (Physical Environment)** : বিদ্যালয়ের কাঠামোগত পরিবেশ যেমন-বিদ্যালয়ের অবস্থান, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, খেলার মাঠ ইত্যাদি শিশুদের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত বাস্তবায়নের জন্য কাঠামোগত পরিবেশ অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। কাঠামোগত পরিবেশের উপাদানসমূহ শিশুদের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। সেগুলো হলো-স্কুলের অবস্থান, স্কুলের প্রাঙ্গণ, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা।
২. **শিখন শেখানো পরিবেশ (Learning Environment)**: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন শেখানো পরিবেশ এমন হবে, যেখানে প্রতিটি শিশুর ক্ষমতাকে সম্মান করা হয়, শিশুদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ, স্বনির্ভরতা এবং নিজে নিজে করার মানসিকতা জাগিয়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে শিখন শেখানো পরিবেশের যে উপাদানসমূহ বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-শ্রেণিকক্ষ সংগঠন, শিখন শেখানো উপকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, দৈনন্দিন রুটিন এবং শিখন শেখানো প্রক্রিয়া/পেডাগজি।
৩. **কর্মী নিয়োগ (Staffing)**: শিশুর বিকাশ এবং শিখনকে খুব বেশি প্রভাবিত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কিংবা বড়দের সাথে শিশুদের সম্পর্ক। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুসম্পর্কের এই সুযোগটুকু নিতে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাজক্ষিত সঠিক অনুপাতের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে একটি প্রগতিশীল ও উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রের জন্য কাজের সঠিক বণ্টন এবং শিক্ষক-সহকারী, সুপারভাইজার, মনিটরিং অফিসার, ম্যানেজারের সঠিক অনুপাতও অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক, সহকারী/স্বেচ্ছাসেবী, তত্ত্বাবধায়ক, মনিটর, ব্যবস্থাপক উপাদানসমূহ শিশুর বিকাশ এবং শিখনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।
৪. **মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধান (Monitoring and Supervision)**: প্রতিটি কাজই পূর্ণতা পায় যখন এটি একটি যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিংয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কোনো কাজের সর্বোত্তম ফলের জন্য সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত এবং চাহিদা অনুযায়ী গুণগত এবং পরিমাণগত দুই ধরনের সুপারভিশন এবং মনিটরিংয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে যে সুপারভিশন এবং মনিটরিংয়ের উপাদানসমূহ বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো- তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের অনুপাত, কাজের ধরন, সময়, প্রক্রিয়া, টুলস/উপকরণ, রিপোর্টিং সিস্টেম, ফলো-আপ ম্যাকানিজম।
৫. **পিতা-মাতা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ (Parents and Community Involvement)**: একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন পিতা-মাতা। শিশুর ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র্য, আত্ম-ধারণা এবং মূল্যবোধের বিকাশে পিতা-মাতা ও

পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ কমিউনিটির প্রচলিত রীতি-নীতি দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়। বিদ্যালয়ে কমিউনিটির অংশগ্রহণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ম-কানূনের প্রভাবক হিসাবে কাজ করে এবং সামাজিক সংস্কৃতিক ও প্রবণতা শিশুর শিক্ষা বিষয়ে পিতা-মাতার চাহিদা নিরূপণে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবার তথা শিশুর চারপাশের পরিবেশের মধ্যে অনেক কিছু বিদ্যমান, যা থেকে শিশু অনানুষ্ঠানিকভাবে অনেক কিছু শেখে। সুতরাং বড়দের সাহায্য নিয়ে বাড়ি, বিদ্যালয় এবং সমাজে সাংস্কৃতিক শিখন নিশ্চিতকরণের জন্য পিতা-মাতা ও কমিউনিটির কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কারণ শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই সাথে তারা বিদ্যালয়েরও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাই বলা যেতে পারে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুর প্রতিটি সাফল্যের জন্য অপরিহার্য উপাদান হলো অভিভাবক সভা, পিতা-মাতা ও পিটিএ, ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা কমিটি।

৬. **প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন (Training and Professional Development):** একজন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষককে হতে হবে তথ্যসমৃদ্ধ, তার জ্ঞানভান্ডারে থাকতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান। তাঁকে শিশুদের সামাজিক, আবেগিক, শারীরিক বিকাশের উন্নয়ন ঘটে এমন একটি কার্যক্রমের পরিকল্পনা করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ হতে হবে। এছাড়াও তাঁকে শিশুর বিকাশ অবলোকন, প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা এবং পিতা-মাতার জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়ার পরিকল্পনা করার মতো সামর্থ্য থাকতে হবে। এজন্য শিক্ষকের প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে যে উপাদানসমূহ প্রভাবিত করে সেগুলো হলো-শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ, মনিটর প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ।
৭. **ব্যবস্থাপনা (Management):** কোনো কর্মসূচির গুণগত মান নির্ভর করে সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার ওপর। কার্যক্রমের বিঘ্নহীন পরিচালনার জন্য সুগঠিত ও পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মানদণ্ড বা নির্দেশক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। আর এর ফলে কিছু ফলাফল দৃশ্যমান হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপাদান, যেমন শিখন শেখানো উপকরণ সরবরাহ, শিখন শেখানো উপকরণ প্রতিস্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, কেন্দ্রীয়/বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, পেশাগত উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে।
৮. **প্রশাসনিক (Administrative):** প্রশাসনিক মানদণ্ড নির্দেশ করে একটা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পদ্ধতিগতভাবে এবং কার্যকরভাবে কতটা সহায়তা পাচ্ছে। কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের রেকর্ড এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক উপাদান, যেমন-হাজিরা খাতা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন খাতা, অভিভাবক সভার খাতা, বার্ষিক

পরিকল্পনা ও ক্লাস রুটিন, শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ক রেকর্ড, জরুরি যোগাযোগ রেজিস্টার, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, প্রশাসনিক ফোকাল পারসন, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, ডাটাবেজ/তথ্যভান্ডার প্রশাসনিক মানদণ্ড নির্দেশ করে।

৩.১১.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ডের গ্রেডিং/ স্তর

মানগুলোকে বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রেড/ স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যাতে গুণগত মানের সাথে কাক্ষিত মানের সেতুবন্ধ সহজেই করা যায়। সেবা প্রদানের মানদণ্ড সমূহকে ৩টি গ্রেড/ স্তরে বিভাজন করা হয়েছে। যথা-

- গ্রেড/ স্তর - ০১ : ন্যূনতম/ মৌলিক
- গ্রেড/ স্তর-০২ : কাক্ষিত/ মধ্যম,
- গ্রেড/ স্তর-০৩ : অগ্রাধিকারযোগ্য/ খুবই ভালো/ উদাহরণযোগ্য

গুণগত মানের কোনো চূড়ান্ত স্তর বা মান বলে কিছু নেই। বরং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, যা বর্তমানে বিরাজমান প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে অধিকতর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে কিছু ধারণা/ নির্ধারকের আলোকে মানদণ্ড উন্নয়ন করা হয়েছে। এই একই কারণে মানদণ্ডের গ্রেড/ স্তর ভাগ করা হয়েছে, যাতে বর্তমান গুণগত মানের অবস্থা এবং কাক্ষিত গুণগত মানের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ তৈরি করা যায়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের মানদণ্ডসমূহের মূল ক্ষেত্র, উপাদানসমূহ এবং ১-৩ স্তরের (স্তর -০১ ন্যূনতম, স্তর-০২ কাক্ষিত/ মধ্যম, স্তর-০৩ খুবই ভালো/ দৃষ্টান্তমূলক) জন্য ভৌত অবকাঠামো বা কাঠামোগত পরিবেশ (Physical Environment), শিখন শেখানো পরিবেশ (Learning Environment), মনিটরিং ও সুপারভিশন বিষয়ক মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য নির্ধারক/ নির্দেশক যেগুলো প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রযোজ্য সেগুলো নিচে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানদণ্ডসমূহের ক্ষেত্রসমূহ, উপাদান এবং স্তর নমুনা সংযুক্তি-২ এ দেখুন।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

৪.১ প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো শিক্ষার বুনিয়াদী স্তর। প্রাথমিক স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে। শিশুর পারিবারিক গণ্ডি থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ মূলত শিশুর পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজ-জীবন ও জগতের সাথে রচনা করে অনন্ত সম্ভাবনার এক সেতুবন্ধন। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা নাগরিক অধিকার এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও অঙ্গীকার আইন ও সংবিধানে সুরক্ষিত করা হয়েছে। যে বয়সে শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তা মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বয়সের অভ্যাস-অনভ্যাস, আগ্রহ-অনাগ্রহ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, চেতনা-মূল্যবোধ, প্রকাশভঙ্গীর অনেককিছুই পরিণত বয়স ও বাকি জীবনে বয়ে বেড়ায়। তাই উন্নত এবং অধিক বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা যথাযথ সংবেদনশীল ও শিশু-বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে বাংলাদেশ সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও তাদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে জানার জন্য শুরুতেই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে জানা দরকার। ইতিহাসের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছে প্রশ্ন-বলুন তো কবে থেকে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল? আর কখন থেকেই বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বর্তমান ধারা শুরু হয়? আমাদের এ উপমহাদেশে কবে থেকে শিক্ষার যাত্রা? কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলো? চলুন সংক্ষেপে জেনে নেয়া যাক সেই ইতিহাসটুকু।

৪.১.১ প্রাচীনকাল

শিক্ষা শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার শুরুর প্রথম থেকেই। অর্থাৎ মানুষ যখন বুঝতে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে এবং নিজেকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে তখন থেকেই শিক্ষার শুরু। আমরা আগেই জেনেছি শিক্ষা হলো ব্যক্তির আচরণের কাক্ষিকত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন। সুতরাং আচরণের সে পরিবর্তন সুদূর অতীতে প্রাচীন গুহায় বসবাসকারী আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আধুনিক মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে শিক্ষার ধারা। শিক্ষার ধারা তিনটি-আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক। বিদ্যালয় গৃহে নির্দিষ্ট সময় ধরে, সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পরিকল্পনা অনুসারে বয়ঃক্রমিক ও স্তরভিত্তিক, সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা তা-ই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এটি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও পূর্ণকালীন হয়ে থাকে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো

নিয়মতান্ত্রিকতা এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট বিতরণ করা। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো নির্ধারিত পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রম, সময়সীমা বা বয়সসীমা নেই। নেই শেখার নির্দিষ্ট জায়গা কিংবা পরীক্ষা-সার্টিফিকেটের বালাই। মূলত প্রতিনিয়ত জীবনযাপন করতে গিয়ে অনেক কিছুই আমরা দেখে, ঠেকে কিংবা করে শিখি। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা যা শিখি তা-ই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আর এ দুয়ের মাঝামাঝি হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এক ধরনের নমনীয় প্রকৃতির শিক্ষা আয়োজন, যেখানে কোনো কিছুতেই কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলা হয় না; বরং শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য, সময়, মেয়াদ, বয়স, শিক্ষার স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এখানে কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই, বরং প্রয়োজনে যে কোনো বয়সের মানুষই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। পাসের সার্টিফিকেট এর লক্ষ্য নয়, বরং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সরবরাহ করা এর লক্ষ্য (লতিফ, ২০০৭)।

আসলে মানুষের শিক্ষার শুরু হয়েছিল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায়। নানা কাজ আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখে, ঠেকে এবং করে তার শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। আগুন জ্বালানো, পাথর ঘষে অস্ত্র বানানো, শিকার করা, কৃষিকাজের সূচনা, গুহায় বসবাস, পরিবার গঠন ইত্যাদি সবই মানুষ অনানুষ্ঠানিক ধারায় অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে দলবদ্ধ জীবনযাপন করতে গিয়ে মানুষের কার্যবিভাজন শুরু হলো—একেকজন একেক ধরনের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠল। শুধু তা-ই নয়, কেউ কেউ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের গভীরতার গুণে অন্যদের থেকে বেশি শিখতে শুরু করল। তখন অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ব্যক্তির তরফে যেত সে বিষয়টি শিক্ষার জন্য, কিংবা ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে তার কাছে শেখার জন্য। এভাবেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা। বিভিন্ন পেশায় শিক্ষানবিশি শুরু হয় এবং হাতে-কলমে কাজ করে মানুষ শিখতে শুরু করে। একসময় মানুষের কাজের পরিধি বাড়ে, প্রয়োজন বাড়ে এবং শেখার চাহিদাও বাড়ে। অবসরের ঐটুকু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিক্ষায় তার চাহিদা পূরণ হয় না। তখন নির্দিষ্ট সময় ধরে, পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষকের কাছে শেখা শুরু হয়। শুরু হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা, সূচনা হয় একটা নতুন অধ্যায়ের।

এ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রারম্ভের ইতিহাস। তবে সেটি ঠিক কবে ছিল তা দিনক্ষণ গুনে বলা সম্ভব নয়। এসবই অনুমান মাত্র। একইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষার সূচনালগ্নিও ঠিক ঠিক হিসেব করে বলা সম্ভব নয়। ধারণা করা হয় যে আজ থেকে আনুমানিক ৩০০০ বছরেরও পূর্বে এ উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বীজ রোপিত হয় (বেগম ও আখতার, ২০০০)।

৪.১.২ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা।

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা

আর্যদের ধর্ম ও জীবনদর্শন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। এ সময়ের শিক্ষা মূলত বেদকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো। শিক্ষা বলতে বেদের শিক্ষা এবং বিদ্যালয় বলতে ঋষি বা গুরুগৃহকে বোঝানো হতো। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনের জন্য গুরুগৃহে যেত। গুরু তখন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত মনে করলে তাঁদের শিষ্যত্ব প্রদান করতেন। শিষ্যকে পুত্রের মতো স্নেহে নিজ পরিবারের সদস্যরূপে শিক্ষাদান করতেন। শিষ্যকে এ সময় কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে গুরুগৃহে নানা ধরনের কাজকর্ম করতে হতো। গুরুর মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানকে পরবর্তীতে শিষ্যরা অনুরূপভাবে যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিতেন। এজন্য গুরু কোনো ধরনের অর্থকড়ি পেতেন না। শিষ্য নানা কাজকর্মে সাহায্য করত এবং তার দীক্ষালাভ শেষ হলে গুরুদক্ষিণা হিসেবে কোনো উপঢৌকন দেয়া হতো (আজিজ ও অন্যান্য, ২০০০)।

এ যুগের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ শিশুদের পুরোহিত করে তোলা এবং শিক্ষা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বা ঋষি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত এবং বিষয়বস্তু ছিল বেদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ। শিষ্যরা বেদের বিভিন্ন শ্লোক, স্তোত্র বা মন্ত্র শিক্ষালাভ করত। এ সময়ের শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক এবং গুরুই নির্ধারণ করতেন শিক্ষাক্রম বা শিক্ষাসূচি কী হবে। একসময় গুরুকেন্দ্রিক এই শিক্ষার পরিসর বাড়তে থাকে এবং বাইরে থেকে শিক্ষার্থীরা এসে এসব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে শুরু করে। আর এ কারণেই খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৮০০ সালের দিকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র বা স্কুল গড়ে উঠল। এসময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই ৪টি বর্ণের মধ্যে কেবল শূদ্র ছাড়া অন্য সকল গোত্রের জন্য তাদের কাজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল (বেগম ও আখতার, ২০০০)। তখন মোটাদাগে ৩ ধরনের বিদ্যালয় ছিল—পরিষদ, টোল এবং পাঠশালা। পরিষদে প্রবীণরা, টোলে ব্রাহ্মণরা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে নিয়োজিত পাঠশালায় দেশের আদিম অধিবাসী ও শূদ্র সম্প্রদায় ছাড়া সকলে লেখাপড়ার সুযোগ পেত (আজিজ ও অন্যান্য)।

‘স্বীকরণম’ নামে পরিচিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শুরু হতো, যা ছিল অনেকটা ‘হাতেখড়ি’ অনুষ্ঠানের মতো। এ অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীর ৫ বছর বয়সে অনুষ্ঠিত হতো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকদের যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১৯ বছর বয়সে ‘উপনয়ন’ পর্বের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে

হতো মাথামুগুন বা চূড়াকর্মের ভেতর দিয়ে (বেগম ও আখতার, ২০০০)। পাঠশালায় লেখা, পড়া, গণনা ও পৌরাণিক কাহিনী পড়ানো হতো। পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি বেতন পেতেন না। পূজা-পার্বণসহ ফসল ওঠার সময় তিনি ফসলের একটা বিশেষ অংশ পেতেন।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা

বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পর হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথাভিত্তিক বৈষম্যের কারণে নিম্নবর্ণের লোকেরা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতি ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাদেরকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। জরা-দুঃখ-দারিদ্র্যকে জয় করে নির্বাণ বা মুক্তি লাভই বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য এবং এটাই বৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। প্রায় ১৫০০ বছর ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছে (বেগম ও আখতার, ২০০০)। বৌদ্ধ যুগের শিক্ষার মূলকথা ছিল অষ্টমার্গ বা অষ্টপন্থায় নির্বাণ লাভ করা। এই অষ্টপন্থা হলো-১. সৎচিন্তা, ২. সৎবাক্য, ৩. সৎকার্য, ৪. সৎবিশ্বাস, ৫. সৎ উপার্জন, ৬. সৎ ধ্যান, ৭. সৎ প্রচেষ্টা, ৮. সৎস্মৃতি।

শিক্ষালাভের জন্য শিশুকে ৮ বছর বয়সে ‘প্রব্রজ্যা’ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাথা মুণ্ডন করে হলুদ বস্ত্র পরে শিক্ষার্থীরূপে মঠ বা সংঘে প্রবেশ করতে হতো। পরবর্তীকালে পাওয়া যেত ভিক্ষু উপাধি। বহু সাধনার পর আচার্য উপাধি লাভ করা যেত। তবে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারীরা ১২ বছর পাঠ শেষে মঠ ত্যাগ করত। আর সন্ন্যাস ব্রতকারীরা মঠেই থেকে যেত।

বৌদ্ধ আশ্রমকে বলা হতো বৌদ্ধবিহার। মূলত এই বৌদ্ধবিহারেই গুরু-শিষ্যের ধর্মচর্চা, শাস্ত্র আলোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, গুরুর উপদেশ নেয়া, পাঠ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি কার্যক্রম চলত। ত্রিপিটককেন্দ্রিক এই শিক্ষা কার্যক্রমে ধর্মচর্চা ও শাস্ত্র আলোচনার বাইরেও রচনা ও ব্যাকরণ পড়তে হতো। এখানে গল্পের মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে সাধারণত মুখে মুখে শিক্ষার্থীদের ধর্ম শিক্ষা দেয়া হতো। অনেক সময় আলোচনা ও বিতর্ক সভারও ব্যবস্থা থাকত। আপনারা নিশ্চয়ই পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, শালবন বিহার কিংবা নালন্দা বিহারের কথা শুনেছেন? এগুলোর প্রত্যেকটাই ছিল একেকটা শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসত শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এর মধ্যে নালন্দা বিহার ছিল অন্যতম, যা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। এখানে ১৫০০ শিক্ষক এবং ৯০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন (আজিজ ও অন্যান্য, ২০০০)।

৪.১.৩ মধ্যযুগীয় শিক্ষা বা মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা

অষ্টম শতাব্দীতে মোহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে। কিন্তু সমগ্র ভারতে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে আরো সময় লাগে। মূলত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুহম্মদ ঘুরীর সময় (১১৭৪-১২০২) ভারতে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটে। এরপরই ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির নদীয়া আক্রমণের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এসময় ভারতে ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে আরবি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে এবং পুরো মোগল শাসনকালের শেষ অবধি এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। মুসলিম শাসনামলে শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। অনেক শাসক তাঁদের ক্রীতদাসদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শাসকরা এখানে বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেন। এসময় শিক্ষা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ছিল এবং মসজিদ ও মন্দিরকে ঘিরেই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মসজিদের সাথে মক্তব প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, আর পাঠশালায় হিন্দু ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শহর আর গ্রাম উভয় অঞ্চলেই শিশুদের পড়ালেখার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। আবার বিত্তবান পরিবারে গৃহশিক্ষক রেখেও পড়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে পড়া, লেখা ও গণনা— এই তিনটি বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পাশাপাশি মক্তবগুলোতে মুসলিম ছেলেমেয়েরা কোরআন পড়া শিখত। আর মাদ্রাসা ছিল উচ্চ ইসলাম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসা সাধারণত শহরাঞ্চলে স্থাপিত হতো এবং গ্রামাঞ্চলের লোকজন এসব সুবিধা পেত না। এসব প্রতিষ্ঠানে কোরআন শিক্ষাসহ দরবেশ-পীর-পয়গম্বরদের জীবনী, ফারসি কাব্য ইত্যাদি পড়ানো হতো। এছাড়া ব্যাকরণ, হন্দ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও পড়ানো হতো। শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি ও ফারসি (বেগম ও আখতার, ২০০০)।

এসময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেয়া হতো না বরং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হতো। অধিকাংশ মাদ্রাসাই ছিল আবাসিক যেখানে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে অবস্থান করতে হতো। শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল বক্তৃতানির্ভর। তবে বিষয়ভেদে ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর, পুনরালোচনা এবং বিতর্কও চলত। পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল মাদ্রাসাকেন্দ্রিক। অনেক শিক্ষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেন এবং বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। অনেকে মাসিক ভিত্তিতে, কেউ কেউ এককালীন সরকারি বেতন-ভাতাদি পেতেন। পর্দাপ্রথাসহ নানা সামাজিক-ধর্মীয় কারণে নারী শিক্ষা ছিল অনেকটা পিছিয়ে। মেয়েরা কেউ কেউ নিজেদের বাসায়, আবার কেউ কেউ নিকটবর্তী শিক্ষকের বাসায় গিয়ে শিক্ষা লাভ করত। তা সত্ত্বেও সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এসময় শিক্ষার অনেক বিস্তার ঘটে এবং ব্রিটিশ শিক্ষা বিস্তারের আগে ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলাদেশে ৮০০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বলে মিশনারি ম্যাক মুলারের বিবরণী থেকে পাওয়া যায় (আজিজ ও অন্যান্য, ২০০০)।

৪.১.৪ ব্রিটিশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর শাসনকার্য চালাতে গিয়ে তারা বুঝতে পারে এদেশের মানুষকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাদেরকে বুঝতে হবে এবং বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি অনুগত একটি শ্রেণি তৈরি করতে হবে। সেই লক্ষ্যে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে টেলে সাজানোর জন্য ১৮৮৩ সালে লর্ড ম্যাকলেকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশে এমন এক শ্রেণির মানুষ (Brown Englishman) সৃষ্টি করতে হবে, যারা রক্তে ভারতীয় হলেও রুচি, সংস্কৃতি ও নৈতিকতায় হবে ইংরেজদের মতো এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থেকে কাজ করবে। আরো বলা হয়, ইংরেজ সরকার সকল ভারতীয়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে না, বরং সমাজের উঁচু স্তরের কিছু লোকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং ক্রমে তা সকল স্তরে পৌঁছাবে। তার এই নীতিকে বলা হয় ‘নিম্নগামী পরিশ্রবণ নীতি’ (Downward Filtration Theory)। এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি (আজিজ ও অন্যান্য)। ম্যাকলের নীতির ফলে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ তার অস্তিত্ব হারাতে বসল। ইংরেজরা মিশনারি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা শুরু করল। পরবর্তীকালে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর জরিপ চালিয়ে স্যার উইলিয়াম অ্যাডামস ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে তিনটি রিপোর্ট প্রকাশ্য মাধ্যমে বাংলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করেন। প্রথম রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয় রিপোর্টে রাজশাহী জেলার শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরা হয় এবং তৃতীয় রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করা হয়। রিপোর্টে দেখা যায়, তৎকালীন বাংলা ও বিহারে ১ লক্ষ স্কুল ছিল এবং প্রতি ৪০০ জন লোকের জন্য একটি করে বিদ্যালয় ছিল। নাটোরের এক জরিপে দেখা যায়, সেখানে সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে পারিবারিক বিদ্যালয় ছিল অনেক অনেক বেশি। এসব স্কুল মূলত দেশীয় প্রচেষ্টায় স্থাপিত এবং অধিকাংশই চলত বিত্তশালীদের দান-দক্ষিণায়। অ্যাডামস তাঁর রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বসবাসের জন্য শিক্ষকদের ভূমি প্রদান এবং শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য জেলা স্কুল পরিদর্শক (District Inspector of Schools) নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন (আজিজ ও অন্যান্য)।

ইংরেজ আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে আরেক উল্লেখযোগ্য দলিল হলো উডের ডেসপ্যাচ। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত এই ডেসপ্যাচের সুবাদে পরের বছর এ দেশের ৫টি বিভাগে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান ছিলেন জনশিক্ষা পরিচালক (DPI)। এই ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয় বিধায় বহু নতুন প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৮৫৭ সালে ঢাকায় ও ১৮৬৯ সালে চট্টগ্রামে নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ নামে পরিচিত। মূলত

উডের ডেসপ্যাচেই উপমহাদেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামোর (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) সুপারিশ করা হয়।

১৮৮২ সালে গঠিত হান্টার কমিশন এক বছর পর ১৮৮৩ সালে তৈরিকৃত প্রতিবেদনে সুপারিশ করে যে, সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন না করে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সহযোগিতা করা উচিত। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পণের মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো হয়। এই কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসময় দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে দেশীয় গণিত, হিসাব-নিকাশ, জমি জরিপ ইত্যাদি বিষয় পাঠের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু এই বিলটি পরিষদে পাস হয়নি। তবে ১৯১৯ সালে ঠিকই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাস হয়। যদিও এ আইন তখন কেবল পৌরসভা এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে আইনের সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলও এর আওতায় আসে।

১৯৩০ সালের দিকে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়, যাতে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। তবে নানা সমস্যার কারণে সেটা কার্যকর করা যায়নি। ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ৩০ বছরব্যাপী এক পরিকল্পনা ছিল। এতে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নার্সারি স্কুল এবং ৬-১৪ বছরের শিশুদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুপারিশ ছিল। কিন্তু এ রিপোর্ট বাস্তবায়নের আগেই ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয় (বেগম ও আখতার, ২০০০)।

৪.১.৫ পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

পাকিস্তান আমলে এদেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্য ৪টি শিক্ষা কমিশন এবং ১টি শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে—

- মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি -১৯৫২
- আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন -১৯৫৭
- এস এম শরীফ শিক্ষা কমিশন -১৯৫৯

- বিচারপতি হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন -১৯৬৪
- এয়ার মার্শাল নূর খান শিক্ষা কমিশন -১৯৬৯

এসব কমিটির রিপোর্টের মধ্যে আকরম খাঁ শিক্ষা কমিটি রিপোর্টে মহকুমা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে বিন্যস্ত করা, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ বছর করা ইত্যাদি ইতিবাচক কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল এবং এর থেকে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ১০ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ২৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের একটি কাজ শুরু হয়। ১৯৫২ সালের মধ্যে ৫০৫৮টি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ৩ জন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়ে কার্যক্রম চালু হয়। এছাড়া একই বছর পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম চালু হয়, যা সমগ্র প্রদেশের জন্য অভিন্ন ছিল। ১৯৫৭ সালের আতাউর রহমান কমিশন রিপোর্টও আকরম খাঁ কমিটির রিপোর্টের ওপর জোর দেয় এবং ৮ বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। ১৯৫৯ সালে প্রাদেশিক সরকার এক অধ্যাদেশ বলে ৫০০০ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে পরিণত করে এবং স্কুল বোর্ড উঠিয়ে দিয়ে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অন্যান্য কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অনেক সুপারিশ করে কিন্তু খুব অল্প সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়।

৪.১.৬ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

স্বাধীনতার পরে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশের মাধ্যমে তৎকালীন ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়। অন্যদিকে দেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্য ১৯৭২ সালে ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন ১৯৭৪ সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন এই রিপোর্টে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুসহ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক হারে নারী শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি শিক্ষা কমিশন/কমিটি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করে। এর কোনোটিরই বাস্তবায়নে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। কমিশনগুলো হচ্ছে যথাক্রমে—

- কাজী জাফর আহমেদ/ আব্দুল বাতেন অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতি-১৯৭৯
- আব্দুল মজিদ খান কমিশন-১৯৮৩
- মফিজ উদ্দীন খান শিক্ষা কমিশন-১৯৮৬

- আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন টাঙ্কফোর্স-১৯৯৩ (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উন্নয়নের জন্য)
- শামসুল হক শিক্ষা কমিশন-১৯৯৭
- জাতীয় শিক্ষা কমিটি-২০০০
- এম এ বারী কমিশন-২০০২
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশন-২০০৩

১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে সরকার মহকুমা (বর্তমানে জেলা) পর্যায়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করে। এরপর ১৯৮২ সালে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে এসে একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা দীর্ঘদিন থেকে চিন্তা করা হলেও ১৯৯০ থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐ বছরই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০) পাস হয়। এই আইনের বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৯৯৩ সালে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এই আইন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সফল অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

২০০৯ সালে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির রিপোর্ট ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষাসহ অনেক আধুনিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এবং এর বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

সর্বশেষ ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি বড় ধরনের মাইলফলক রচিত হয়। এ বছর সরকারি এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের ২৬১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এর শিক্ষকদের চাকরি সরকারি করা হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়।

অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার যে সূচনা ঘটেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলে, আজকের দিনে এসে তা আনুষ্ঠানিক ধারায় সংগঠিত রূপ লাভ করেছে। এই শিক্ষাকে সামনে এগিয়ে নেয়া আমাদের দায়িত্ব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরাই শিক্ষার অগ্রযাত্রার দায়িত্ব নেব। কারণ আমরাই শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের পথনির্দেশনা দেই। আমাদের যথাযথ প্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ।

একনজরে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনাপঞ্জি

- ১৮০০ সাল- উইলিয়াম কেরি কর্তৃক মিশনারী কাজের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু।
- ১৮১৩ সাল- সনদ আইন গ্রহণ যার মাধ্যমে ম্যাকলে বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি অনুসরণ করেন।
- ১৮৩৫ সাল- উলিয়াম অ্যাডাম কর্তৃক (১৮৩৫-৩৮) এ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ১৮৫৪ সাল- উডের ডেসপ্যাচ বা শিক্ষা প্রস্তাব প্রদান।
- ১৮৮৩ সাল- উইলিয়াম হান্টার এর নেতৃত্বে প্রথম ইন্ডিয়ান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ১৯১০ সাল- গোপালকৃষ্ণ গোখলে কর্তৃক অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কর আরোপের প্রস্তাব আইন পরিষদে পেশ।
- ১৯১৯ সাল- শিক্ষা সংস্কারের আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ।
- ১৯২৯ সাল- হার্টগ কমিটি'র প্রতিবেদন প্রদান।
- ১৯৩০ সাল- বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ।
- ১৯৪৪ সাল- সার্জেন্ট কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ১৯৫২ সাল- 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন' কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ১৯৫৪ সাল- নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা উল্লেখ।
- ১৯৫৭ সাল- ৫০০০ কম্পালসরি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল এবং বাকী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নন-মডেল নামকরণ।
- ১৯৫৯ সাল- আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ১৯৬৫ সাল- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় একীভূত করে 'ম্যানেজড ফ্রি প্রাইমারি স্কুল' হিসাবে ঘোষণা।
- ১৯৭২ সাল- ২৪ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' গঠন।
- ১৯৭৩ সাল- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ।

১৯৭৪ সাল-	৩০ মে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ।
১৯৭৬ সাল-	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন।
১৯৭৮ সাল-	মৌলিক শিক্ষা একাডেমির যাত্রা শুরু।
১৯৮১ সাল-	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বতন্ত্র পরিদপ্তর স্থাপন।
১৯৮৩ সাল-	মজিদ খান শিক্ষা কমিশন গঠন।
১৯৮৫ সাল-	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) নামে কার্যক্রম পরিচালনা।
১৯৮৭ সাল-	মফিজ উদ্দীন আহমদকে প্রধান করে 'বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ।
১৯৯০ সাল-	প্রাথমিক শিক্ষাকে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ঘোষণা ৫ থেকে ৯ মার্চ থাইল্যান্ডের জমতিয়েন শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
১৯৯২ সাল-	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পৃথক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প কার্যক্রম শুরু।
১৯৯৩ সাল-	সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু।
১৯৯৩ সাল-	শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু।
১৯৯৭ সাল-	অধ্যাপক এম শামসুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন।
১৯৯৭ সাল-	পিইডিপি কার্যক্রম শুরু।
২০০৩ সাল-	পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন এবং দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
২০১০ সাল-	'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন।
২০১৩ সাল-	তালিকাভুক্ত সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি, বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা।
২০১৪ সাল-	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ উন্নীতকরণ এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ।
২০১৮ সাল-	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা।

৪.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ নং ধারায় দেশের সকল শিশু শিক্ষার আওতায় আসবে এ অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়-“রাষ্ট্র”

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজনে সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য;

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ১৯৯৭-২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, ২০০৩-২০১১ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০১১-২০১৮ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বর্তমানে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদি চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন কেবল জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশ বিভিন্ন অঙ্গীকারনামায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন, সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ সিডও (CEDAW), মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ২০৩০ প্রভৃতিতে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মপরিকল্পনাতে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বায়নের যুগে উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নব নব ধ্যানধারণা যেমন, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ, একীভূত শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তি, যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে বিগত চার দশকে প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোগত ও সংখ্যার বিবেচনায় এগিয়ে গেলেও এর গুণগত মান এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছায়নি।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬ শত ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৮,৪০৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫,৭১৬টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০,৬০১টি কিন্ডার গার্টেন, ১২,৭৬৭টি ব্র্যাক পরিচালিত, ৬,৪৯৩টি রক্ষ প্রকল্প পরিচালিত আনন্দ স্কুল, ৩,২০২টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা, ৬,০৭০টি উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা, ১২৪টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২,২৯৪টি নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৭টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ১২৩টি কমিউনিটি বিদ্যালয় এবং ১৮৫টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত স্কুল আছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ২ হাজার ৯ শত ৮৮ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনো করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০.৪% বালিকা। শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার দুইশত এক জন এবং এর মধ্যে নারী শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার চারশত তিন জন (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৭)।

সহশ্রাব্ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করেছে। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এএসপিআর (২০১৭) এর তথ্য মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ৮৭.৫%। প্রাথমিক স্তরের গ্রোস ইনরোলমেন্ট রেট ১.০৫ এবং নেট ইনরোলমেন্ট রেট ১.০২। আর শিক্ষা স্তর সমাপনীর হার ৮১%।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে শিক্ষার গুণগত অর্জনের দিক থেকে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের পেশাগত মানের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানোসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌতসুবিধা, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিক্ষক-শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন ও বিভিন্ন ধরনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন প্রচলন, একাডেমিক সুপারভিশন ও পরিবীক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজ সক্রিয়, শিশুকেন্দ্রিক এবং মিথস্ক্রিয়াধর্মী হচ্ছে।

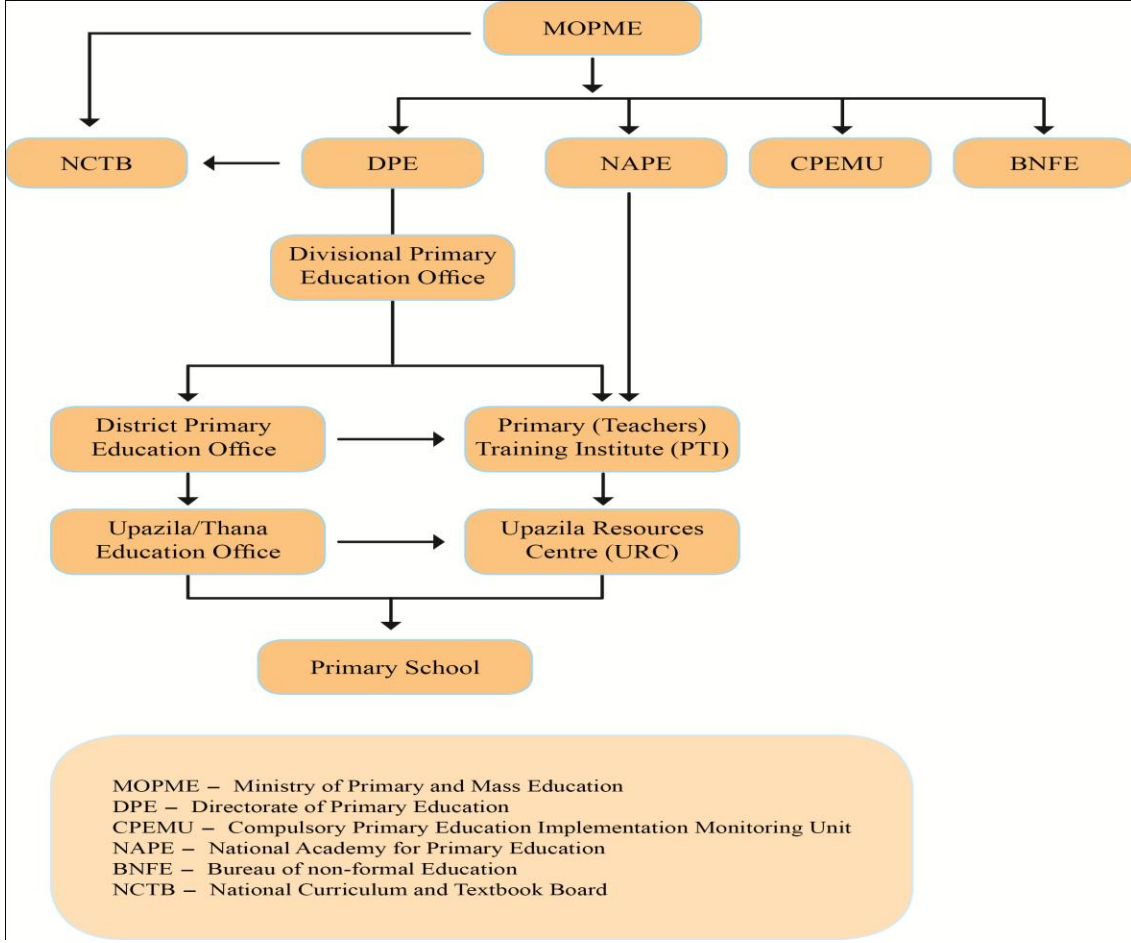
৪.৩ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। কিছু সহযোগী সংস্থার সাথে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫৭.৪৬% আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়কে পরিচালনা করে। নিম্নে সংক্ষেপে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো তুলে ধরা হলো:

৪.৩.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Primary and Mass Education, MoPME)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসনিক ও অন্যান্য যাবতীয় দিক সম্পন্ন করে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ক্ষমতা ও দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের। নিচে এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাজ করে থাকে–

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় খাতভিত্তিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের প্রশাসনের প্রতি নজর রাখা;
- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ গণশিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পাঠ্যবই প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ;
- প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার নীতি-নির্দেশনা প্রদান এবং
- শিক্ষা সংস্কার কমিশনের বিষয়াদির ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করে।

৪.৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৯টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৫০৫টি উপজেলা/ থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই, উপজেলা/ থানা সদরে উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা/ থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন/ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকারী শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ৭টি বিভাগ, যথা- প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পলিসি ও অপারেশন, প্রোগ্রাম, অর্থ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ৭ জন পরিচালকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়:

- বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/ থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান;
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর উন্নয়ন;
- প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত কার্যাবলী; এবং
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (আইএমডি) নামে একটি ডিভিশন রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও কম্পিউটারাইজড করা এবং তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা ডিভিশনের কাজ। এর প্রধান হচ্ছেন পরিচালক, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট। মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এবং একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

৪.৩.৩ বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা জন্য দেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক বিভাগ সমূহের প্রতিটিতে বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং এর দায়িত্বে থাকেন এক জন উপ-পরিচালক। অধীনস্থ পিটিআই, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, রিসোর্স সেন্টার, ক্লাস্টার এবং বিদ্যালয়সমূহ তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় উপ-পরিচালক নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করেন :

- বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- জেলা পর্যায়ের অফিস ও পিটিআই সমূহের সাথে সমন্বয় ও নির্দেশনা প্রদান ;
- বিভাগীয় পর্যায়ে বদলি, পাঠ্যবই সংক্রান্ত কার্যক্রম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই পরিদর্শন, EMIS এর কার্যক্রমসহ সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন;
- অধীনস্থ অফিস সমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- অধীনস্থ পিটিআই সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৪.৩.৪ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান এবং সংস্থাপন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়াও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব ও কর্মপরিধির মধ্যে আছে বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষক নিয়োগ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত নির্দেশ ও বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন। এ ছাড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে :

- জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- শিক্ষক নিয়োগ ও বদলী, দাপ্তরিক কার্যক্রম, পাঠ্য বই সংক্রান্ত কার্যক্রম, উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন, EMIS এর কাজ তদারকিসহ সকল আয়ন-ব্যয়ন ও প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন;

- জেলা সমন্বয় সভাতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন;
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাৎসরিক ভাবে পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- URC তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান।

৪.৩.৫ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে প্রণীত এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন বা সি-ইন-এড এবং দেড় বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন বা ডিপিএড কোর্স পরিচালনা করে থাকে। একজন সুপারিনটেনডেন্ট এবং দুইজন সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের তত্ত্বাবধানে পিটিআইসমূহ পরিচালিত হয়। এর প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিচালিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং একাডেমিক বিষয় পরিচালিত হয় নেপ কর্তৃক। উপজেলা পর্যায়ে পরিচালিত রিসোর্স সেন্টারসমূহকেও তত্ত্বাবধান করে থাকে পিটিআই। নবসৃষ্ট ১২টি পিটিআইসহ বর্তমানে দেশে মোট পিটিআই এর সংখ্যা ৬৮টি। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে পিটিআই এর কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

- নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ বিহীন শিক্ষকদের সি-ইন-এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান;
- URC তে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের বিভিন্ন চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সহায়তা প্রদান;
- এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাৎসরিকভাবে তা পরিমার্জন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৪.৩.৬ উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিস

উপজেলা/ থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজ উপজেলা শিক্ষা অফিস বাস্তবায়ন করে থাকে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের প্রধান একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার। উপজেলার ২০টি সরকারি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে ক্লাস্টারকে কয়েকটি সাব-ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকেন একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। দেশে ৫০৫টি

প্রশাসনিক উপজেলা ও থানার প্রতিটিতে একটি করে মোট কতটি উপজেলা শিক্ষা অফিস রয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের কাজের ক্ষেত্র নিম্নরূপ :

- শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়কে সহায়তা প্রদান;
- উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- গুণগতমানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সহযোগিতা প্রদানের সাথে সাথে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;
- জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাৎসরিকভাবে পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন;
- বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) প্রণয়ন ও এর আর্থিক অনুদান যথাযথ ব্যবহারে প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের একাডেমিক সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ পরিচালনা;
- ইউআরসি'র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- চাকুরীকালীন চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।

৪.৩.৭ উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি)

নব্বই দশকের সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নোরাড, আইডিএ, ডিএফআইডি (এসটিম) এবং ইউনিসেফ (আইডিয়েল) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপিত হয়। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বীকৃত অবকাঠামোগত সংযোজন। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান-উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিটি উপজেলা/থানায় ইউআরসি স্থাপিত হয়েছে। মূলত যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষসাধনই ইউআরসি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণ, বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কাজের ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

- শিখনফল অনুধাবনে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান;
- শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজন ও বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল পরিবীক্ষণ;

- উপজেলার অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ এবং এ ধরনের কাজের একাডেমিক তত্ত্বাবধান;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় ও সম্পর্ক স্থাপন;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানোর মান উন্নয়ন;
- বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মৌলিক শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

৪.৩.৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম অনুসরণে শিশুর কাজক্ষিত বিকাশের জন্য যে প্রতিষ্ঠান শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করে তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা হয়। শিক্ষক ও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট যেমন শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি একটি বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। এসব ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রত্যাশিত ভূমিকা নিম্নরূপ:

প্রধান শিক্ষক

সকল শিশুর শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান ও সহায়তা প্রদানসহ প্রধান শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ:

- প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণি পাঠ পরিচালনা;
- শিক্ষকদের সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষকদের মাধ্যমে ফলপ্রসূ শিখন কৌশল ও যথাযথ মূল্যায়ন দ্বারা শিশুর শিখন অগ্রগতি ও শিখনফল অর্জন নিশ্চিতকরণ;
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে সকল শিক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ প্রদান;
- শিখন-শেখানোতে সহায়তা প্রদান;

- আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত বিদ্যালয় পরিবেশ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবেন;
- বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা করা;
- SMC & PTA গঠন ও কার্যকর করা;
- নিয়মিত একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ (RPD);
- সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পরীক্ষা পরিচালনা;
- বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিত সরকারি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন।

শিক্ষক

- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষণবিজ্ঞান, শিখন মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসহ পেশা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অবিরতভাবে অনুশীলন করবেন।
- পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত ও ব্যবহার করবেন।
- পাঠ-উপযোগী ও পাঠ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক নির্দেশিকা, সহায়িকাসহ অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করবেন।
- শিশু-বান্ধব ও সক্রিয়-শিখন পদ্ধতিনির্ভর শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীর কাজ প্রদর্শন করবেন।
- সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করবেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC)

- বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, বাৎসরিকভাবে পরিমার্জন;
- স্থানীয় মানুষদের উদ্বুদ্ধকরণ, উপস্থিতি বাড়ানে, সহপাঠক্রমিক কর্মসূচি আয়োজন।

শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (PTA)

- যে সকল শিশু ভালো করতে পারছেনো তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে বিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য সহায়তা করবে।

- শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে।
- সকল পেশার মানুষের সমন্বয়ে বিদ্যালয়কে শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকবে।
- উপস্থিতির হার বৃদ্ধি ও ঝরেপড়া রোধে SMC কে সহায়তা করবে।
- SLIP বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে।

৪.৩.৯ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সুপারভিশন এবং মনিটরিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। নেপ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ভূমিকা নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ডিপিএড/ সি-ইন-এড এর পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিমার্জন;
- সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা পরিচালনা;
- পিটিআই এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং কোর্সের পাঠ্যক্রম পরিমার্জন;
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা জোরদারকরণ সহ:
 - অভীক্ষাপদ প্রণয়ন
 - নমুনা যাচায়ের জন্য অভীক্ষা পরিচালনা
 - অভীক্ষাপদ যাচাই, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন
 - অভীক্ষাপদের যাচাই ও বিশ্লেষণ
 - প্রতিবেদন প্রণয়ন
 - নতুন ধরনের অভীক্ষাপদ ও ফলাফল নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

৪.৩.১০ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB):

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন, সম্পাদনা ও প্রকাশনাসহ এ সংক্রান্ত গবেষণামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪.৩.১১ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরীক্ষা ইউনিট (CPEIMU)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হওয়া এই ইউনিটের উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন সময়ে শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ করা।

৪.৩.১২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE)

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত শিশু, যুবা আর বয়স্ক মানুষের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, উৎপাদনশীল ও জীবন-দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। ন্যায় আর সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৪.৩.১৩ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED)

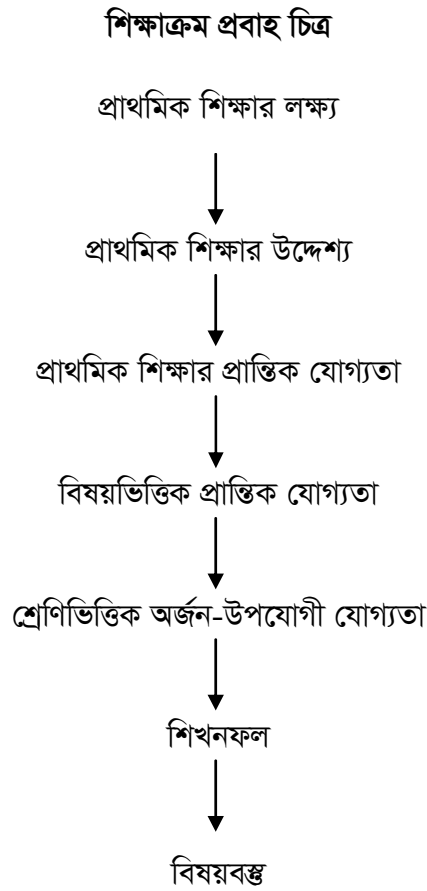
- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামোগত নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা প্রদান।

৪.৪ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান সোপান। এই প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রণয়ন করা হয় শিক্ষাক্রম। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য কয়েকবারই এর পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। শুরুতে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৫ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৬ সালে এই উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে। মূলত শিক্ষা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে তা ঠিক করার পূর্বে কেন শিখবে সেই বিষয়ে ভাবনা থেকেই উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সূচনা। কিন্তু এই শিক্ষাক্রম ছিল প্রধানত শিক্ষককেন্দ্রিক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ছিল না। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে তা সুচিহ্নিত ছিল না। ফলে শিক্ষকগণ সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের অর্জনসমূহ বা শিখনফল পরিমাপ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। তাছাড়া দেশ ও সমাজের চাহিদা পূরণ এবং নতুন জ্ঞান সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশে

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯২ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ হয়। এখানে মূলত শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধানুযায়ী অর্জন উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি ধারাবাহিক ও পরস্পর বিন্যস্ত প্রক্রিয়া। নিচে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রবাহ চিত্র দেখানো হলো:



8.8.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের দেশাত্ববোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.৪.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

১. আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তিতে শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনা-শক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিকবোধের উন্মেষে সহায়তা করা।
৩. বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।
৫. গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
৬. সামাজিক ও সুনামগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।
৭. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।
৮. অন্যকে অধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।
৯. প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।
১০. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।
১১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
১২. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেতন করা।
১৩. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।

৪.৪.৩ যোগ্যতা

সাধারণভাবে যোগ্যতার অর্থ কিছু করতে পারার সামর্থ্য। যদি বলি শিশুটি কী পারে? তার উত্তর বহু রকম হতে পারে। যেমন-হাঁটতে পারে, খেলতে পারে, কথা বলতে পারে। এ সবই কিন্তু শিশুটির যোগ্যতা বোঝায়। সুতরাং সাধারণ অর্থে যোগ্যতা হলো কোনো কিছু করতে পারা।

একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সে যে গুণাবলি অর্জন করবে বলে আশা করা হয় তা অর্জন করাকে যোগ্যতা বোঝায়। ধরা যাক-সে পড়তে পারে, অঙ্ক করতে পারে ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর এই পড়তে পারা, অঙ্ক করতে পারাকে গতানুগতিকভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করেছে বা যোগ্যতা অর্জন করেছে বলা যায়।

কিন্তু কেবল পড়তে পারা, শিখতে পারা, হিসাব করতে পারার মধ্যে আজকাল আর শিক্ষা সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারবে, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তার আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন হবে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে ইত্যাদি সবই শিক্ষার কাজক্ষিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এদিক থেকে যোগ্যতাকে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন বোঝায়।

তাই বলা যায় যে, কোনো একটি পাঠের শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কোনো জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পর শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময় তা কাজে লাগাতে পারলে, সেই জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে যোগ্যতা বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ

- বাংলা বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শুদ্ধভাবে ও স্পষ্টস্বরে কথা বলতে পারার দক্ষতা আয়ত্ত করার পর শিশু যদি তার পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশে শুদ্ধ ভাষায় ও স্পষ্টস্বরে কথা বলতে পারে তবে সেটি তার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
- একইভাবে সমাজ পাঠ বিষয়ের পঠন পাঠন ও বিদ্যালয়ে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গঠন করে কোনো শিশু তার গৃহপরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে অনুপ্রাণিত হলে শিশুর এই বাঞ্ছিত আচরণ একটি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

শিক্ষার্থীদের জন্য অর্জন উপযোগী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা বা পারদর্শিতাকে ভিত্তি করে যে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয় তাকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলা হয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে এর শিক্ষাক্রম প্রণীত। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো কোনো শ্রেণিতে কোনো কোনো প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু অর্জন করবে তার জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীরা

একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেমন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৫ বছরে যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে এবং তাদের মধ্যে যে ধরনের আচরণিক পরিবর্তন আসবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে এ শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে বলেই এ শিক্ষাক্রমকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলে। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম শিশুর কাজিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

- এ ধরনের শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরে এবং মেয়াদকালে কী কী যোগ্যতা এবং কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করবে তা শ্রেণিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করা থাকে। অর্থাৎ যোগ্যতার পরিসর ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকালে প্রতিটি যোগ্যতার পরিসর অনুসারে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
- যোগ্যতাসমূহ চিহ্নিত করার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ক্ষমতা ও চাহিদার ওপর দৃষ্টি রাখা হয়।
- নির্ধারিত যোগ্যতার জটিলতা অনুসারে শ্রেণিভিত্তিক বিন্যাস করা হয়। সহজ থেকে কঠিন এইভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়।
- যোগ্যতাসমূহ প্রণয়নের সময় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণিক পরিবর্তন— এ তিনের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। শিখন অভীক্ষার ক্ষেত্রে একমুখী নির্বাচনকে বাদ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীর ধীরে ধীরে জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তার শিখন সম্পূর্ণতা লাভে গুরুত্ব দেয়া হয়।
- যোগ্যতার প্রকৃতি অনুযায়ী শিখন পদ্ধতি ও কার্যাবলি নির্ধারণ করা যায়। শিখনক্রমে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার সংমিশ্রণ রয়েছে বলে শিখন কার্যাবলিতে বৈচিত্র্য ঘটানো সম্ভব। ফলে শিখন শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও আনন্দায়ক হয়।
- শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে এর প্রকৃতি অনুসারে উপযুক্ত অভীক্ষা (Test) ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা যায়। কাজিত যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অগ্রগতি যাচাই করা যায় এবং পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল শিশুর বয়স, সামর্থ্য ও চাহিদার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলো নির্বাচন করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। এ

যোগ্যতাগুলো প্রাথমিক স্তরের ১২টি বিষয়ের শিখনক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে। শিক্ষকগণ প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য জেনে শিশুদের যোগ্যতাগুলো পুরোপুরি অর্জনে সহায়তা করতে পারবেন।

৪.৪.৪ প্রান্তিক যোগ্যতা

প্রাথমিক স্তর শেষে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে তার সমষ্টিই হলো প্রান্তিক যোগ্যতা। যেমন: পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিশু সঠিক রীতিতে সঠিক উচ্চারণে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারবে। বাংলা বিষয়ের এটি একটি প্রান্তিক যোগ্যতা। অন্যভাবে বলা যায় যে- ১ম শ্রেণি থেকে শুরু করে ৫ম শ্রেণি শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই প্রান্তিক যোগ্যতা। প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা ২৯টি। প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত ১২টি বিষয়ের মধ্যদিয়ে এই ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে (আবশ্যিকীয় শিখনক্রম, এনসিটিবি)।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়াল্লা/ সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।
২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।
৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া।
৫. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিক বোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ্য অর্জন করা।
৬. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা।
৭. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা।
৮. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
৯. বাংলা ভাষায় মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
১০. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।

১১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।
১২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।
১৩. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
১৪. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।
১৫. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
১৬. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সূষ্ঠা ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
১৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।
১৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।
১৯. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
২০. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবিলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।
২১. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেয়া।
২২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
২৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া।
২৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
২৫. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।
২৬. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করা।
২৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
২৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২৯. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

৪.৪.৫ বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা

শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করে প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। এ শিক্ষাক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা একরকম নয়। আবার শিক্ষার্থীরা একবারে বা একসঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে না। ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতার অংশ বিশেষ অর্জনের মাধ্যমে একটি প্রান্তিক যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হবে। প্রান্তিক যোগ্যতাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত করে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা তথা শিখনক্রম প্রণীত হয়েছে যা শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত ১২টি বিষয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা নিম্নরূপ:

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার তালিকা

বিষয়	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা
বাংলা	১৪
ইংরেজি	৩১
গণিত	৩০
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১৬
প্রাথমিক বিজ্ঞান	১৮
ধর্ম (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান)	৪৭ (ইসলাম-৫, হিন্দু-৯, বৌদ্ধ-১৫, খ্রিস্টান-১৮)
শারীরিক শিক্ষা	১০
চারু ও কারুকলা	১৫
সঙ্গীত	০৯

কোনো কোনো প্রান্তিকযোগ্যতা অর্জন ১ম শ্রেণি বা অন্য যে কোনো শ্রেণি থেকে শুরু করে ৫ম বা অন্য যে কোনো শ্রেণিতে সমাপ্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, পূর্বে উল্লিখিত বিষয় ও প্রান্তিকযোগ্যতার তালিকায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতার সংখ্যাও একরকম নয়।

নিচে উদাহরণ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম (২০১২) থেকে বাংলা, গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ের প্রাস্তিকযোগ্যতা উল্লেখ করা হলো:

বিষয়ভিত্তিক প্রাস্তিক যোগ্যতা: বাংলা ভাষা

শোনা :

১. বাংলা ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য সাহিত্য শুনে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।
৩. কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য বিষয় শুনে বুঝতে পারা।

বলা :

১. বাংলা ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা প্রয়োগ করে কথা বলতে পারা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বুঝে বলতে পারা।
৩. সহপাঠী ও অন্যদের সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারা।
৪. বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।

পড়া :

১. স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা।
৩. হাতের লেখা ও মুদ্রিত লেখা পড়তে পারা।

লেখা :

১. স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝে লিখতে পারা।
৩. সাধারণ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারা এবং ফরম পূরণ করতে পারা।

বিষয়ভিত্তিক প্রাস্তিক যোগ্যতা : গণিত

১. বাস্তব উপকরণের সাহায্যে গাণিতিক ধারণা লাভ করা।

২. উপকরণ গণনা করতে পারা।
৩. কোটি পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারা।
৪. ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীকগুলো চিনতে পারা।
৫. কোটি পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারা।
৬. কোটি পর্যন্ত সংখ্যায় ব্যবহৃত অংকের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে পারা।
৭. কোটি পর্যন্ত সংখ্যার তুলনা করতে ও মানের ক্রমানুসারে সাজাতে পারা।
৮. বিশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যা পড়তে, লিখতে ও ব্যবহার করতে পারা।
৯. দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ ও এতদসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা (হাতে না রেখে ও রেখে)।
১০. একটি সংখ্যা থেকে আর একটি সংখ্যা বিয়োগ করতে পারা (হাতে না রেখে ও রেখে)।
১১. যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারা।
১২. একটি সংখ্যাকে আর একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারা (গুণ্য অনূর্ধ্ব চার অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এবং গুণক অনূর্ধ্ব তিন অংক বিশিষ্ট সংখ্যা)।
১৩. একটি সংখ্যাকে আর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে পারা (ভাজ্য অনূর্ধ্ব পাঁচ অংক বিশিষ্ট এবং ভাজক অনূর্ধ্ব তিন অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হবে)।
১৪. যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারা (কার্যবিধির যে কোনো পর্যায়ে চার অংক বিশিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বড় সংখ্যা ব্যবহৃত হবে না)।
১৫. বাংলাদেশী মুদ্রা ও টাকা চিনতে এবং দৈনন্দিন লেনদেনে ব্যবহার করতে পারা।
১৬. গড়ের ধারণা লাভ করা এবং এতদসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা।
১৭. গ.সা.গু ও ল.সা.গু'র ধারণা লাভ করা এবং সহজ সমস্যা সমাধানে এসব ধারণা প্রয়োগ করতে পারা।
১৮. প্রতীক ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারা।
১৯. সাধারণ ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করা (হর অনূর্ধ্ব দুই অংকের সংখ্যা) এবং বিভিন্ন প্রকারের ভগ্নাংশ চেনা ও ব্যবহার করতে পারা।
২০. সাধারণ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা (ভগ্নাংশের হর অনূর্ধ্ব দুই অংকের সংখ্যা)।

২১. দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা লাভ করা ও ব্যবহার করতে পারা।
২২. দশমিক ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারা এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারা।
২৩. শতকরা ধারণা লাভ করা এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারা।
২৪. দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন ও ভূমির পরিমাপের বিভিন্ন একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা।
২৫. সময়ের পরিমাপের একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা।
২৬. পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করতে পারা এবং জনসংখ্যা ভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা।
২৭. পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
২৮. তল, রেখা ও বিন্দু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা।
২৯. সমতলীয় জ্যামিতিক আকৃতির শ্রেণিবিন্যাস ও নামকরণ করতে পারা (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত) এবং চিত্র আঁকতে পারা।
৩০. ক্যালকুলেটরের ব্যবহার কৌশল জানা ও হিসাব নিকাশে প্রয়োগ করতে পারা এবং কম্পিউটার সম্পর্কে জানা।

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা : ইংরেজি

Listening:

1. To recognize basic English sound differences, stress and intonation.
2. To understand simple commands, instructions, requests and carry them out.
3. To understand simple questions and statements.
4. To listen to, understand and enjoy simple rhymes, poems and stories.

Speaking:

1. To use English sounds, stress, intonation appropriately.
2. To exchange greetings and farewells and to make introductions.

- 3.To ask and answer questions.
- 4.To recite rhymes and poems.
- 5.To say the names of the days of the week and the months, and to tell the time.
- 6.To talk about simple things and actions.
- 7.To give instructions, commands and to make requests.
- 8.To take part in conversations on topics related to students daily life.

Reading:

- 1.To read aloud texts with proper pronunciation, stress and intonation.
- 2.To recognize and read both cardinal and ordinal numbers.
- 3.To read the names of the days of the week, the months and the time.
- 4.To read aloud poems with proper stress and intonation.
- 5.To read silently with understanding paragraphs, stories and other text materials.
- 6.To read instructions and carry them out.
- 7.To recognize punctuation marks and read accordingly.

Writing:

- 1.To write non-cursive and cursive letters both capital and small.
- 2.To write cardinal and ordinal numbers.
- 3.To write words, phrases and sentences using non-cursive and cursive letters both capital and small.
- 4.To write figures for words and word for figures.
- 5.To use punctuation marks.
- 6.To use capital letters.
- 7.To write the names of the days of the week and the months and to write the time.
- 8.To write words, phrases and sentences correctly.

9. To take dictation.
10. To write short and simple compositions.
11. To write simple personal letters.
12. To fill in simple forms.

৪.৪.৬ শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতা একবারে বা একসঙ্গে কোন একটি শ্রেণিতে অর্জন করা যায় না। ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতার অংশ বিশেষ অর্জনের মাধ্যমে পুরো প্রান্তিক যোগ্যতাকে অর্জন করতে হয়। বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক বিভাজিত রূপকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা বলে। এই শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিভাজন করে শিখনফল নির্ধারণ করা করা হয়েছে। সবশেষে যোগ্যতা ও শিখনফলকে ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণির ও বিষয়ের বিষয়বস্তু তথা পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে নিচে বাংলা বিষয়ে শোনার দক্ষতা কীভাবে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় বিভাজন করা হয়েছে তা দেখানো হলো:

বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
ভাষা দক্ষতা (শোনা)					
১. বাংলা ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	১.১ বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও নির্বাচিত যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	১.১. বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনবে।	১.১ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
	১.২ কারচিহ্নহীন ও কারচিহ্নযুক্ত শব্দ এবং অনুরূপ শব্দযোগে গঠিত বাক্য শুনবে।	১.২ বিভিন্ন শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২ পরিচিত ও পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।
	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।
২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য সাহিত্য শুনে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে আনন্দ লাভ করবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।
	২.২ গল্পকথা শুনে বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে।	২.২ গল্প শুনে বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে।	২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।	২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।

৪.৪.৭ শিখনক্রম

কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক বিভাজিত রূপের বিন্যাসকে শিখনক্রম বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু বা কোন কোন অংশ শিক্ষার্থীরা কোন শ্রেণিতে অর্জন করবে তার ধারাবাহিক এবং ক্রমবর্ধমান বিন্যাসিত রূপই হলো শিখনক্রম। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিভাজন করে শিখনফল নির্ধারণ করা করা হয়েছে।

আবশ্যিকীয় শিখনক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুই সামর্থ্য ও চাহিদা অনুযায়ী ১২টি বিষয়ের জন্য প্রণীত শিখনক্রমের মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাবে। এ শিখনক্রম প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিকীয় বলেই একে আবশ্যিকীয় শিখনক্রম বলা হয়।

যে কোনো দেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হলো শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থাপনা, শিখন-শেখানো কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশের লক্ষ্যে কখন, কী ও কতটুকু শেখাতে হবে, কোন কোন বিষয় শিখবে, কারা শেখাবে, কীভাবে শিখন অর্জন মূল্যায়ন করা হবে তা শিক্ষাক্রমই বলে দেয়। তাই একজন শিক্ষককে শিখন-শেখানোর গুরুদায়িত্ব পালনের পূর্বে শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত হতে হবে।

শিখনফল

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর আচরণের কিছু কাজীকৃত পরিবর্তন আনা। আর এই আচরণগত পরিবর্তন বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বা কী যোগ্যতা অর্জন করবে, যা তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে সে সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবৃতিই হলো শিখনফল। অর্থাৎ যেসব আচরণ দেখে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যাবে যে শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার পূর্বনির্ধারিত লিখিত রূপই হচ্ছে শিখনফল। শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী এগুলো আয়ত্ত করে। আর শিখনের মাধ্যমে হয়ে থাকে বলেই একে বলা হয় শিখনফল। আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জিত হয়ে থাকে বিধায় একে আচরণিক উদ্দেশ্যও বলা হয়। এই আচরণিক উদ্দেশ্যগুলো এমনভাবে লেখা হয়, যেন আচরণগুলো অর্জিত হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করা যায়।

আজকাল আচরণিক উদ্দেশ্য শব্দটি ব্যবহার করা হয় না, বরং শিখনফল অধিকতর গ্রহণযোগ্য (এহসান, ১৯৯৭)।

শিখনফলের গুরুত্ব

- শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয় প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু।
- পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারলেই শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।
- শিখন শেখানো কার্যাবলি শিখনফলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে।
- পাঠ পরিচালনায় প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি পাঠের শিখনফল লিখতে হবে।
- পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করানোর জন্যই শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালিত হবে।

শিখনফলের বৈশিষ্ট্য

- সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে।
- পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হবে।
- শিখন উদ্দেশ্যের তিনটি ক্ষেত্র, যেমন-জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়ক হবে।
- শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।
- শিখনফল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করতে হয়। যেমন-শিক্ষার্থীরা দুই অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে তিন অঙ্কের সংখ্যা যোগ করতে পারবে।

শিখনফল লেখার নিয়মাবলি

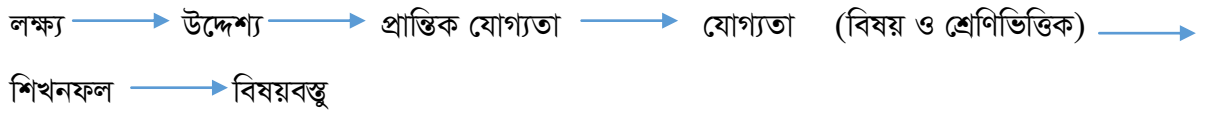
- শিখনফলে সাধারণত শিক্ষার্থীর একটি আচরণের উল্লেখ থাকবে।
- শিখন উদ্দেশ্যের তিনটি ক্ষেত্র-জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিখনফল শনাক্ত করতে হবে।
- শিখনফল ক্রিয়াবাচক শব্দে লিখতে হবে।
- একটিমাত্র বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে।
- শিখনফল সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে।

শিখনফল লেখার ক্রিয়াপদ

বলা, বর্ণনা করা, লেখা, পার্থক্য করা, বিবৃত করা, বিশ্লেষণ করা, পর্যবেক্ষণ করা, পরিমাপ করা, শনাক্ত করা, অঙ্কন করা, প্রদর্শন করা ইত্যাদি (এহসান, ১৯৯৭)।

যোগ্যতা ও শিখনফলের সাথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক

বিষয়সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের কোনো নির্দিষ্ট পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে তা পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয়। এগুলো নির্ধারণ করা হয় বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে। শিখনফল সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরূপ :



উদাহরণ

প্রান্তিক যোগ্যতা: ২৫. সময়ের পরিমাপের একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা। এনসিটিবি (২০১১) অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : বিষয় গণিত (তৃতীয় শ্রেণি)

২৫.১ ঘড়ি দেখে ঘণ্টা ও মিনিটে সময় বলতে পারবে।

২৫.২ সময়ের এককসমূহ ব্যবহার করে ছোট ছোট যোগ-বিয়োগ করতে পারবে।

শিখনফল

- ঘড়িতে ঘণ্টা নির্দেশক সংখ্যাগুলো চিনতে ও পড়তে পারবে।
- ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা শনাক্ত করতে পারবে।
- ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারবে।
- দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের সম্পর্ক জানবে ও বলতে পারবে।
- বছর, মাস ও দিনের সম্পর্ক জানবে ও বলতে পারবে।
- হাতে না রেখে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে।
- সময়ের যোগ ও বিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

- সময় পরিমাপ, সময় পরিমাপের যোগ ও বিয়োগঃ প্রাথমিক গণিত, তৃতীয় শ্রেণি

নিচে প্রান্তিক যোগ্যতা, যোগ্যতা ও শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তুর সম্পর্কের উদাহরণ দেয়া হলো-

প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শ্রেণি ও বিষয়
২৫. সময়ের পরিমাপের একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা	২৫.১ ঘড়ি দেখে ঘণ্টা ও মিনিটে সময় বলতে পারবে।	২৫.১.১ ঘড়িতে ঘণ্টা নির্দেশক সংখ্যাগুলো চিনতে ও পড়তে পারবে।	সময় পরিমাপ	প্রাথমিক গণিত, তৃতীয় শ্রেণি
		২৫.১.২ ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা শনাক্ত করতে পারবে।		
		২৫.১.৩ ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারবে।		
		২৫.১.৪ দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের সম্পর্ক জানবে ও বলতে পারবে।		
		২৫.১.৫ বছর, মাস ও দিনের সম্পর্ক জানবে ও বলতে পারবে।		
	২৫.২ সময়ের এককসমূহ ব্যবহার করে ছোট ছোট যোগ-বিয়োগ করতে পারবে।	২৫.২.১ হাতে না রেখে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে।	সময় পরিমাপের যোগ ও বিয়োগ	
		২৫.২.২ সময়ের যোগ ও বিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে পারবে।		

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সঠিক বাস্তবায়ন নির্ভর করে যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিতকরণের ওপর। এ যোগ্যতা অর্জনের কার্যকর কৌশল হলো যথাযথ শিখনফল নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা। ওপরে বর্ণিত বিষয়াবলি শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিতকরণে সহায়তা দেবে।

অধ্যায় ৫

একীভূত শিক্ষা

৫.১ একীভূত শিক্ষার ধারণা - দর্শন ও যৌক্তিকতা

সকল শিশুর শিখন চাহিদা পূরনের একটি টেকসই মাধ্যম হল একীভূত শিক্ষা। একীভূত শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেকেই একীভূত শিক্ষাকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের একটি পদ্ধতি বা উপায় মনে করে থাকেন। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে একীভূত শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা দর্শন যার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যদল নেই, যে কোনো শিশুই শিক্ষাব্যবস্থার যে কোনো প্রেক্ষিতে (যেমন: ভর্তি, অংশগ্রহণ, অর্জন ইত্যাদি) বৈষম্যের স্বীকার হলেই তারা একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল হিসেবে বিবেচিত হয়। ইউনেস্কোর (২০০৯) নির্দেশনা অনুযায়ী একীভূত শিক্ষা হলো :

একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হলো সকল বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেখানে বৈচিত্র্য/ভিন্নতা, ভিন্ন চাহিদা ও সামর্থ্য এবং শিক্ষার্থী ও সমাজের শিখন প্রত্যাশাকে সম্মান দেখানো হয়।

একীভূত শিক্ষার সাম্প্রতিক বিশ্লেষণগুলোতে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি, অংশগ্রহণ কিংবা অর্জন-ই যথেষ্ট নয়; বরং শিক্ষা সমাপ্তির পরবর্তী বিষয়গুলোকেও একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যের আওতায় আনা হচ্ছে। যেমন: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, ২০১২) এর বিবেচনায় একীভূত শিক্ষা হলো:

সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, একটি নির্দিষ্ট শিক্ষান্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করা এবং শিক্ষা শেষে একটি গ্রহণযোগ্য কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে কাজ করা

একীভূত শিক্ষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, শারীরিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সকল শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করা যায়। একীভূত শিক্ষা-দর্শনের মূল ভিত্তিগুলো হলো:

(ক) প্রতিটি শিশুর শিক্ষা অর্জনের

অধিকার আছে

(খ) প্রতিটি শিশুই আলাদা

(গ) সকল শিশুই শিখতে পারে

(ঘ) প্রতিটি শিশুর নিকটস্থ বিদ্যালয়ে

ভর্তি হওয়ার অধিকার আছে

একীভূত শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

(ক) প্রতিটি শিশুর শিক্ষা অর্জনের অধিকার আছে। শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র ও তার সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন/প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

(খ) প্রতিটি শিশুই আলাদা। জন্মগতভাবেই একটি শিশু অন্যটি হতে কোনো না কোনোভাবে আলাদা হবেই। ফলে তাদের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহ, আবেগ-অনুভূতি, প্রত্যক্ষণ, শিখন প্রভৃতিতে ভিন্নতা বিরাজমান। এই ভিন্নতা কোন সমস্যা নয়; এটি মানবজাতির সৌন্দর্য।

(গ) সকল শিশুই শিখতে পারে। শিশুদের শিখন কৌশলে ভিন্নতা রয়েছে তবে কোন শিশুই শিখন ক্ষমতার বাইরে নয়। কেউ দ্রুত শেখে, কারো শিখন হয় কিছুটা মন্থর। শিশুরা শেখে তাদের চাহিদা অনুযায়ী। শিশুর শিখন ক্ষমতার পরিবর্তন নয়; বরং শেখানোর ব্যবস্থার পরিবর্তন মূখ্য।

(ঘ) প্রতিটি শিশুর নিকটস্থ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অধিকার আছে। শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক বিদ্যালয় নির্ধারণ করা সার্বজনীন মানবাধিকার লংঘনের শামিল। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিদ্যালয়কে এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যেন বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়ে সকল শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে।

৫.১.১ একীভূত শিক্ষা কীভাবে সামগ্রীক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে?

একীভূত শিক্ষার সঠিক বাস্তবায়নের ফলে নানাভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সুফল লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যেমন: একীভূত শিক্ষা ঝরে পড়া রোধ করে, শিক্ষকের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং বিদ্যালয়ের সাথে অবিভাবকদেরনিবীর সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে। একীভূত শিক্ষা সকল শিক্ষার্থীরজন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সব ধরনের শিক্ষার্থী অতি সহজে তাদের শিখনফল অর্জন করতে সামর্থ্য হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কমে আসে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

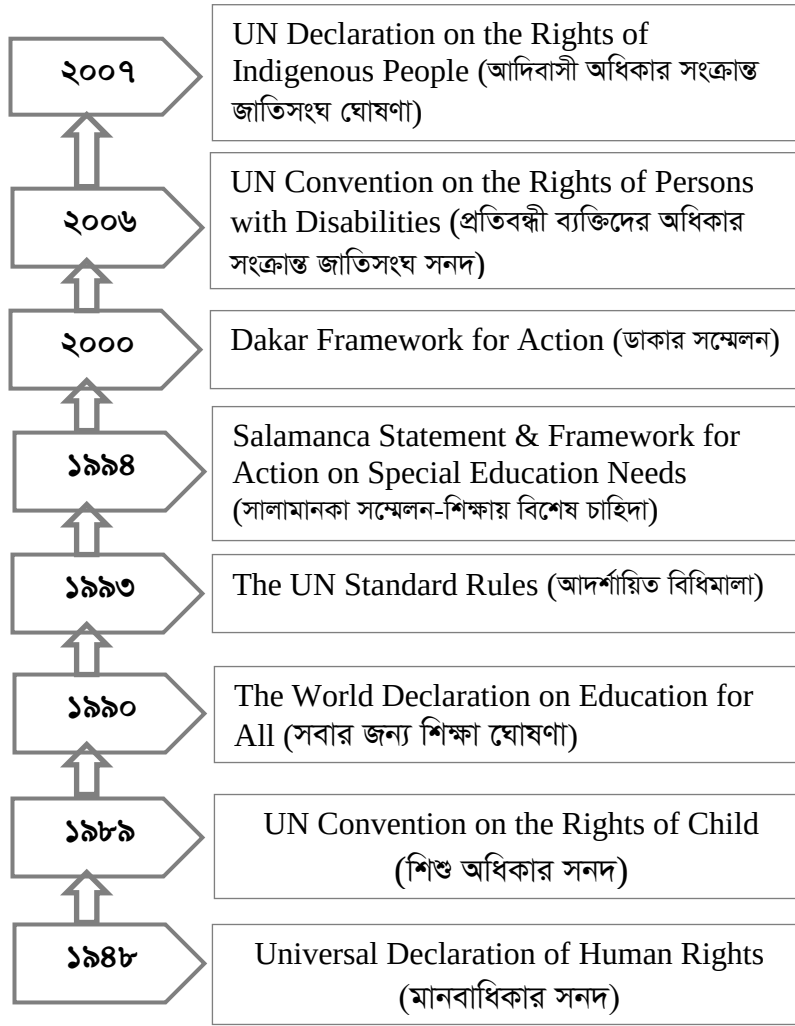
একীভূত শিক্ষা সকল শিক্ষার্থীর মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন বৈচিত্র্যময় সহপাঠীদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তারা সহপাঠীদের প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করে এবং তাদের বৈচিত্র্যময় ক্ষমতার প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। একীভূত শিখনবান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতে সাহায্য করে। অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার মাধ্যমে তাদের নিজেদের প্রতিও

আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। সকল শিক্ষার্থী বৈচিত্র্যকে বুঝতে সক্ষম হয়। একীভূত শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীদেরকে শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষকগণ অনেক নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে এবং তাদেরকে শেখানোর বিশেষ বিশেষ কৌশলগুলো কী তা জানতে পারেন। সকল শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা পূরণের জন্য হতে হয় অনেক বেশি সৃজনশীল। সাম্প্রতিক গবেষণায় (Nishimura, 2014) দেখা যায় যে, একীভূত শিক্ষা শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁরা অবিভাবক, সমাজ ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে অধিক পরিমাণ সহযোগিতা পেতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে শিক্ষকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বৈচিত্র্যময় শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এতে শিক্ষকের সন্তুষ্টি বেড়ে যায় ও শ্রেণি কার্যক্রম হয়ে ওঠে আনন্দময় এবং সকল শিক্ষার্থীর মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বেড়ে যায়।

বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষক ও অবিভাবকের মধ্যে এক ধরনের চলমান যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একটি শিশুর সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন তার অভিভাবক তথা তার মাতা-পিতা। একীভূত শ্রেণিকক্ষে কোন বিশেষ বৈচিত্র্য বা চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকলে বিদ্যালয় কিংবা শ্রেণি শিক্ষকের সর্বপ্রথম যা করা প্রয়োজন তা হলো ওই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে বিশদ ধারণা রাখা। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও অভিভাবক নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে একে অন্যকে সহযোগিতা করে থাকে। ফলে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা বেড়ে যায় এবং সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। একীভূত শিক্ষায় বিদ্যালয় ও অভিভাবকের মধ্যকার সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণায় (যেমন: Flores-Vance, 2013; Pfiffner, Villodas, Kaiser, Rooney & McBurnett, 2013), শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিখন পারদর্শিতার অন্যতম মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.২ একীভূত শিক্ষার বিকাশ

‘একীভূত শিক্ষা’ ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে নতুন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ভিত্তি রচিত হয় ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ‘মানবাধিকার সনদ’ এর মাধ্যমে। এ সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, সকলের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে এবং এ অধিকার সবার জন্য সমান। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ প্রণয়নের চার দশক পর, অর্থাৎ ৯০’র দশকে একীভূত শিক্ষা ধারণাটির প্রকৃত প্রসার শুরু হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও ঘোষণা প্রণীত হতে থাকে (চিত্র ১)।



চিত্র : একীভূত শিক্ষার আন্তর্জাতিক ভিত্তি

একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন ঘোষণায় বিভিন্ন ধরনের সময়/কাল নির্ধারণ করা হয়। যেমন: ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জুনিয়রনে প্রণীত 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণায় (ইউনেস্কো, ১৯৯০) অঙ্গীকার করা হয় যে, ২০০০ সনের মধ্যে সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। তবে বলা বাহুল্য যে, ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদেও সকল শিশুর জন্য বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-অধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ একধরনের আদর্শায়িত বিধিমালা প্রণয়ন করে যা স্ট্যান্ডার্ড রুলস (Standard Rules) নামে অধিক পরিচিত। স্ট্যান্ডার্ড রুলস এর মাধ্যমে সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের সমন্বিত কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় (জাতিসংঘ, ১৯৯৩)। তবে একীভূত শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামানকায় ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত 'শিক্ষায় বিশেষ চাহিদা' বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে। এ সম্মেলনে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একীভূত শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ২০০০ সালে সেনেগালে অনুষ্ঠিত ডাকার সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা দেয়া হয়। একই সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (Millennium Development Goal) ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হলেও প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে তা সন্তোষজনক হয়নি। এমতাবস্থায় ২০০৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদে (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006) প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে একীভূত করার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয় (জাতিসংঘ, ২০০৬)।

এছাড়াও বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশুরা যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ ২০০৭ সালে আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘোষণা (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People) প্রণয়ন করে। সর্বোপরি, বর্তমানে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (Sustainable Development Goal) এবং ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষায় অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য একীভূত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৫.২.১ জাতীয় শিক্ষানীতিতে একীভূত শিক্ষা

বাংলাদেশ সরকার একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের নিমিত্তে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণা ও সনদে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার সকল শিশুর জন্য একীভূত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং শিক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া) একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিশেষ করে শিক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া) এ একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া) মূলত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে তৈরি।

বাংলাদেশ সরকার ‘সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা’ ও ‘সকলের জন্য শিক্ষা’ কর্মসূচির মাধ্যমে ভর্তি বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশেরকৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। সমবেত প্রচেষ্টার ফলে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন উল্লেখ করার মত। যদিও কাক্ষিত লক্ষ্য পূরণে আমাদের আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

একীভূত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বর্ণিত আইন ও বাংলাদেশ কর্তৃক করা অঙ্গীকার সমূহের আলোকে প্রণীত শিক্ষানীতি ২০১০-এবং এরই আলোকে বর্ণিত নির্দেশনা সমূহের কয়েকটি হলো—

- ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে সারা দেশে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা
- ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান করা
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া
- মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা
- পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা
- দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো
- সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, শৌচাগার ব্যবহারসহ তাদের চলাচলের সুযোগ নিশ্চিত করা
- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা
- পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো
- ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা
- শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা
- পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা
- পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া
- হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকা
- শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করা।

৫.৩ একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয়েছে এমন প্রতিটি সাধারণ শিশুই তার বাড়ির পাশে অবস্থিত বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এই অর্থে একীভূত শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যদল হলো সাধারণ শিশুরা। তবে সাধারণ শিশুরা যেহেতু অনায়াসে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে বাঁধাহীনভাবে শ্রেণির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সে কারণে একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল হিসেবে যে ধরনের শিশুরা বার বার আলোচনায় আসে তারা হলো: ঝুঁকিগ্রস্ত শিশু, নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু; অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু; শারীরিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশু, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু এবং শিখন সামর্থ্যের ভিন্নতার ভিত্তিতে অতি অগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শিশুরা।



চিত্র: একীভূত শ্রেণিকক্ষ

৫.৩.১ ঝুঁকিগ্রস্ত শিশু

আমাদের সমাজে বসবাসকারী এমন কিছু শিশু আছে, যারা ভৌগোলিক ও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রান্তিক শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণে বৈষম্যের স্বীকার হয়। বিশেষত ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বা দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী শিশু, জেলে আটক শিশু, পরিবারবিচ্ছিন্ন শিশু, পরিত্যক্ত শিশু, এইচআইভি আক্রান্ত এমন সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণে বিশেষভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত। উপযুক্ত শিখন পরিবেশ না পেলে এধরনের শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণত যেসকল বাঁধার সম্মুখীন হয় তা হলো :

১. বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা না পাওয়া
২. নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিতি থাকতে না পারা

৩. শ্রেণিতে কাজিত আচরণ প্রদর্শনে বাঁধা
৪. সহপাঠীদের সাথে মেশার ক্ষেত্রে বাঁধা
৫. শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাঁধা

ঝুঁকিগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট বাঁধাগুলো অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় কার্যক্রমে নমনীয়তার চর্চা করা এবং চারপাশের মানুষের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা। সর্বোপরি, এধরনের শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থা করলে তাদের অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূরণ করা সম্ভব হয়।

৫.৩.২ নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু

সমগ্র বিশ্বে তথাকথিত স্বাভাবিক জনপদের বাইরেও বেশ কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা পরিবারগুচ্ছ আছে, যাদের স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশে চাকমা, মগ, মুরং, কুকী, সাঁওতাল, লুসাই, টিপরা, রাখাইন, গারো প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অসংখ্য মানুষ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রোকোনা, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বসবাস করে। তাছাড়া দেশের অন্য অনেক জেলাতেও তাদের বসবাস রয়েছে। এধরনের পরিবার থেকে আসা শিশুরা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে যেসকল বাঁধার সম্মুখীন হয় তা হলো:

১. বিদ্যালয়ে প্রচলিত বাংলা ভাষা ব্যবহারে বাঁধা
২. শ্রেণিতে শিক্ষকের মৌখিক নির্দেশনা অনুসরণে বাঁধা
৩. পাঠ্যপুস্তকে নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার ব্যবহার না থাকায় পঠনে ও লিখনে বাঁধা।

এসব শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট বাঁধাগুলো অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন প্রারম্ভিক স্তরগুলোতে মাতৃভাষায় পড়ালেখার ব্যবস্থা করা এবং নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করা। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কিছুটা নমনীয়তা আনতে পারলে এসব শিশুরা অনায়াসে তাদের শিখন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

৫.৩.৩ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু

আমাদের চারপাশে অনেক শিশু রয়েছে যারা পরিবারের দারিদ্রতা বা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসরতার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণে বৈষম্যের স্বীকার হয়। উদাহরণস্বরূপ পথশিশু, কর্মজীবী শিশু এবং বস্তিবাসী শিশুদের কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণে নানামুখী বাঁধার সম্মুখীন হয়। যেমন:

১. বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাঁধা
২. নিয়মিত শ্রেণি উপস্থিতিতে বাঁধা
৩. শ্রেণিতে কাজিত আচরণ প্রদর্শনে বাঁধা
৪. সহপাঠীদের সাথে মেশার ক্ষেত্রে বাঁধা
৫. শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাঁধা

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় কার্যক্রমে নমনীয়তার চর্চা করা, চারপাশের মানুষের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ও স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৫.৩.৪ শারীরিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের সমাজে তথাকথিত স্বাভাবিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বসবাস করে যারা প্রতিবন্ধী হিসেবে অধিক পরিচিত। প্রতিবন্ধী শব্দটির মাধ্যমে কিছুটা নেতিবাচক ভাব প্রকাশিত হয় বলে অনেকেই ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটির স্থলে ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ পরিভাষা ব্যবহার করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শিশুরা তাদের প্রাপ্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হতে পারে। কারণ ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ একটি অস্পষ্ট পরিভাষা; প্রতিবন্ধিতা না থাকলেও একজন সাধারণ মানুষের কোন বিশেষ চাহিদা (যেমন: বাঁহাতি হওয়ার কারণে ডান হাত দিয়ে লিখতে না পারা অথবা এক চোখ দৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু অন্যটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন) থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রদেয় সুযোগ দাবী করতে পারেন। যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা সরকারি চাকুরিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এছাড়াও নানাবিধ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব মতামত অনুযায়ী ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ না বলে ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটি ব্যবহার করাই সমীচীন বলে পরামর্শ দেয়া হয় (জাতিসংঘ, ২০০৬)। প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক পরিভাষা নয়, বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রকৃত কর্মক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে জানাতে পারলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সহজেই আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, যে কোনো দেশের শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী (WHO, ২০১১)। সে হিসেবে বাংলাদেশে দেড় কোটিরও অধিক মানুষের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সমঅধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের আওতায় আনা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যদিও এখনো প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি বড় অংশ শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা

অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশু ভর্তির সংখ্যা প্রতিবছর দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০১৩)।

প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা এক রকম নয়। প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী তাদের শিখন চাহিদায় রয়েছে অনেক ভিন্নতা। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা আলোচনা করা হলো:

৫.৩.৫ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু

ধরন দেখেই বোঝা যায় যে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা কানে কম শোনে। শ্রবণে সমস্যা থাকায় এ ধরনের শিশুদের কথা বলায় নানা রকমের বিঘ্নতা দেখা দেয়। সে কারণে এরা কথা বলার পাশাপাশি ইশারাভাষা নামক একটি বৈচিত্র্যময় ভাব বিনিময় পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ করতে পারে। সঠিক সময়ে শ্রবণ সমস্যা শনাক্ত করা ও শ্রবণ যন্ত্র বা হিয়ারিং এইড দেয়া হলে এরা যে কোনো ভাষাতেই মৌখিক ভাববিনিময় করার দক্ষতা অর্জন করার যোগ্যতা রাখে। ইশারাভাষায় পারদর্শি হওয়ায় অতিরিক্ত কলাহলপূর্ণ স্থানেও এ শিক্ষার্থীরা অনায়াসে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। এদের দৃষ্টিজনিত ও শারীরিক কোনো সমস্যা নেই। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের সাধারণত বুদ্ধি বিকাশে কোনো রকমের বাঁধা নেই। বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এদের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হলে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক জীবনে একীভূত হওয়ার দক্ষতা ও সুযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর কথন, পঠন বা শিখনে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়-

১. শব্দের উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুটা অস্পষ্ট হয়
২. ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে কথা বলে ও লিখে
৩. শব্দ ভাঙার অতি সাধারণ
৪. বিশেষ কিছু বর্ণ (যেমন- খ, হ, প্রভৃতি) উচ্চারণকালে যথেষ্ট সমস্যা হয়
৫. যুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করার সময় সেগুলোকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে। যেমন, ‘পরীক্ষা’ শব্দের উচ্চারণ হয়ে যায় ‘পরীখা’
৬. অনেক সময় বাক্যের গঠন ঠিক থাকেনা (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সমস্যা হয়)।
৭. কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান শব্দগুলো ওপর জোর দেয়। তাদের প্রবনতা থাকে পূর্ণবাক্য না বলে মূল শব্দগুলো ব্যবহার করে শ্রোতাকে বোঝানো। নিম্নের উদাহরণটি একজন ১০ বছর বয়সী শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর-

“গতকাল অনেক রাত। বাবা নাই। সবাই চিন্তা করে। মা কানছে। রাত ১২টা বাবা ফোন করলো। বন্ধুর বাসায়। দেরী হবে।” সঠিক বাক্য ব্যবহার করলে ঘটনাটি দাঁড়ায়- “গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত বাবা বাসায় ফিরে নাই। সবাই দুঃচিন্তা করছিল। মা কাঁদছিলো। রাত ১২ টায় বাবা ফোন করে বললো সে তার এক বন্ধুর বাসায় আছে। ফিরতে দেরী হবে।”

উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের অন্যান্য সহপাঠীদের মতো শিক্ষা অর্জনে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর যোগ্যতা রাখে।

৫.৩.৬ বাক প্রতিবন্ধী শিশু

বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের বুদ্ধি বিকাশে বা শ্রবণ, দৃষ্টিজনিত ও শারীরিক কোনো সমস্যা নেই। বাক-প্রতিবন্ধী মানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী নয়। তবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু সময়মতো প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পেলে বাক প্রতিবন্ধী হতে পারে। বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক জীবনে একীভূত হওয়ার দক্ষতা ও সুযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। একজন বাক প্রতিবন্ধী শিশুর যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো:

১. শব্দ তৈরি ও উচ্চারণে সমস্যা থাকে;
২. কথা বলার সময় শব্দ গুছিয়ে বলতে সমস্যা হতে পারে;
৩. দীর্ঘ কথোপকথনে বাঁধাহীনভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে;

শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে বাক প্রতিবন্ধী শিশুরা অনায়াসে তাদের শিক্ষাকার্যক্রম সম্পন্ন করার যোগ্যতা রাখে।

৫.৩.৭ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা দুই ধরনের হতে পারে- ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বড় ছাপার অক্ষরে প্রস্তুতকৃত বই বা শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে পড়ালেখা করতে পারে। অপরদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীরা পারদর্শী হয় ব্রেইলে তৈরি শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বড় গুণ হলো এরা তাদের শ্রবণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে যা অনেক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বেলায় সম্ভব হয় না। যেমন: শ্রেণিতে নতুন কোন সহপাঠীর সাথে শুধুমাত্র একবার কথা হলেই দীর্ঘ দিন পর হলেও তার কণ্ঠস্বর শুনে তাকে চিনতে পারে। আর ব্রেইলে পারদর্শী হওয়ায় এরা অন্ধকারেও তাদের পড়ালেখা ও অন্যান্য কার্যক্রম বিনা বাধায় চালিয়ে যেতে পারে। এদের শ্রবণজনিত,

বুদ্ধি বিকাশে ও শারীরিক কোনো সমস্যা থাকে না। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রধান বাঁধা হলো ব্ল্যাকবোর্ড অনুসরণ করতে না পারা। শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক জীবনে একীভূত হওয়ার দক্ষতা ও সুযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

৫.৩.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক গঠন অন্যান্য শিশুদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি বিকাশে কোনো রকমের বাঁধা নেই। শারীরিক গঠনে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকার পরও অনেক শিক্ষার্থীর মাঝে মুখ, বাহু, পা ব্যবহার করে তাদের লেখাপড়া ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। এদের দৃষ্টি এবং মৌখিক ভাষার বিকাশে কোনো বাঁধা নেই। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রধান বাঁধা হলো:

১. লিখতে সমস্যা হয়, কারণ অনেককেই হাতের পরিবর্তে মুখ অথবা পা ব্যবহার করে লিখতে হয়
২. শ্রেণিতে ব্যবহারিক কাজ (হাতে-কলমে কাজ) করতে প্রতিবন্ধকতা থাকে

বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অনায়াসে সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে।

৫.৩.৯ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশের ধারা অন্য শিশুদের তুলনায় অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনেক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর নাও থাকতে পারে। কিন্তু সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম এবং বিকল্প ভাব বিনিময় দক্ষতা অর্জনে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। সাধারণত এ ধরনের শিশুদের জন্য দৈনন্দিন জীবন দক্ষতা (যেমন-নিজে নিজে টয়লেট ব্যবহার, জামা-জুতো ব্যবহার ইত্যাদি) অর্জনের দিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তবে অনেক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু কারিগরি শিক্ষায় পারদর্শী হতে পারে। কারিগরি শিক্ষা অর্জনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এদেরকে মূলধারার কর্মক্ষেত্রে একীভূত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া যায়।

৫.৩.১০ অতি মেধাবী শিশু

অতি মেধাবী বা অতিঅগ্রসর শিশুরা তাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অসমন্বিত (Asynchronous) বিকাশ প্রদর্শন করে। এ শিশুরা জ্ঞানমূলক ক্ষমতায় (cognitive ability) অন্যান্য শিশুদের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে এগিয়ে থাকে। এদের IQ সাধারণত ১৪০ এর অধিক হয়ে থাকে এবং উচ্চ মাত্রার অতি মেধাবী শিশুদের IQ ১৭০ পর্যন্ত হতে পারে। এরা খুব দ্রুত শিখতে পারে এবং এদের স্মৃতিশক্তি হয় অতি প্রখর। সৃজনশিলতা, কল্পনা শক্তি ও সমস্যা-সমাধানের দক্ষতায় সমবয়সীদের তুলনায় লক্ষ্যণীয়ভাবে এগিয়ে থাকে। সাধারণত এরা সমবয়সীদের চেয়ে বড়দের সাথে মিশতে বেশি পছন্দ করে। অতি মেধাবী হওয়ার কারণে এদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার ও আবেগ-অনুভূতি সাধারণ সহপাঠীদের তুলনায় বেশ আলাদা হয়ে থাকে। মোটকথা এ শিশুরা তাদের নিজস্ব পন্থায় পৃথিবীকে দেখতে চায়, যা গতানুগতিকের অনেক উর্ধ্বে। অনেক সময় কোন বিষয় সম্পর্কে এত উচ্চমানের প্রশ্ন বা মতামত প্রদর্শন করে যে সাধারণ মানুষের কাছে তা বোধগম্য হয়না। কাজেই অতিমেধাবী শিশুদের অসাধারণ মেধা ও ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে না পেরে অনেক সময় সাধারণ মানুষ ভুলক্রমে তাদেরকে অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু মনে করতে পারে। এদের অসাধারণ মেধাকে প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দেয়া না গেলে এ শিশুদের যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা হলো:

১. অসংলগ্ন আচরণ প্রদর্শন করতে পারে;
২. শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের সাথে মেশার আগ্রহ থাকে না; একাকী থাকার চেষ্টা করে;
৩. পড়া-লেখা বিরক্তিকর মনে হতে পারে ফলে পাঠে আগ্রহ থাকে না;
৪. ঝগড়া করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সাধারণ শিক্ষাক্রমের মধ্যে উচ্চ মাত্রার শিখন সমস্যা (challenge) তৈরি করে দিতে পারলে অতি মেধাবী শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হয়।

৫.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একীভূত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একীভূত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক সহ বিভিন্ন অংশীজন বিশেষ করে অবিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির (এসএমসি) সদস্য এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক ও এস এম সি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে (Ahmmed, Sharma & Deppeler, 2013; Ahsan, 2014; Malak, 2013)। নিম্নোক্ত কেইস স্টাডি থেকে একীভূত শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন অংশীজনের কেমন ভূমিকা পালন করা উচিত তা অনুধাবন করা যায়:

কেইস স্টাডি-১: মীমের স্কুলে ভর্তি

‘মীম’ ৯ বছর বয়সী শ্রবণ প্রতিবন্ধী একটি মেয়ে। মীমের বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তিনি একটি প্রত্যন্ত উপজেলায় ৫ বছর চাকুরি শেষে সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে একটি বিভাগীয় শহরে এসেছেন। মীমের মা পেশায় একজন নৃত্যশিল্পী, মেয়েকে নিয়ে যার স্বপ্নের অন্ত নেই! নতুন জায়গা, নতুন অফিস, নতুন মানুষ সবকিছু ভালোই কাটছিল মীমের পরিবারের। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো যখন একমাত্র মেয়েকে ভর্তি করানোর জন্য মীমের মা শহরের নামকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেন। মীমের কানে হেয়াং এইড (শ্রবণ সহায়ক উপকরণ) দেখে প্রধান শিক্ষক তাকে ভর্তির ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে পার্শ্ববর্তী আরেকটি স্কুলে ভর্তির পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে মীমের মা-বাবার অনেক অনুরোধের পর প্রধান শিক্ষক বলেন যে তিনি কমিটির (এস এম সি) সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। কমিটির একজন ছাড়া সবাই মীমের ভর্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। বিপক্ষে অবস্থানকারী সদস্যরা মনে করেন যে একটি প্রতিবন্ধী মেয়ে অত্র বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে লেখাপড়ায় খাপ খাওয়াতে পারবে না; বরং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হবে। কিন্তু কমিটির একজন অবিভাবক সদস্যের পুনঃপুনঃ অনুরোধে মীমের একটি ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর ব্যাপারে সবাই একমত হোন।

বলা বাহুল্য যে, মীম তার পূর্ববর্তী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তো এবং তার রোল নম্বর ছিল চার। অত্র স্কুলেও সে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন করে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্পন্ন হয় মীমের ভর্তি পরীক্ষা যা ছিল দুইটি অংশে বিভক্ত: লিখিত- ২০ এবং মৌখিক-৫। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে প্রধান শিক্ষক বেশ খুশি। তিনি সব শিক্ষককে ডেকে বলেন মেয়েটি ২০ এর মধ্যে ১৪ পেয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার জন্য শিক্ষকদের সবাইকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মৌখিক পরীক্ষায় মীম ৫টি প্রশ্নের মধ্যে মাত্র ১ টির সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হয়। মীমের কথা যেন শিক্ষকরা বুঝতেই পারছিলেন না! এতে অধিকাংশ শিক্ষক তাকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। মীমের পরিবার পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করলে তিনি জনান সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী মীম অবশ্যই ভর্তি হতে পারবে, তবে শিক্ষকরা যদি নেতিবাচক মনোভাব ধারণ করে থাকেন তাহলে মেয়েটির লেখাপড়ায় মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। তাই তিনি প্রধান শিক্ষককে সরাসরি কোন নির্দেশ না দিয়ে পুনরায় মেয়েটির মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেন যেখানে তিনি একজন সদ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (একীভূত শিক্ষায়) শিক্ষককে নিয়ে হাজির হলেন।

শিক্ষকরা নতুন করে ৫ টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। মীম একটি উত্তরও ভালোভাবে দিতে পারলো না। এবার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক প্রশ্নগুলো হাতে নিলেন। তিনি প্রথম প্রশ্নটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন কিছুটা ভিন্নভাবে- ধীরে ও স্পষ্টভাবে। মীম এবার প্রশ্নটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারায় সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হয়। পরের প্রশ্নটির দৈর্ঘ্য বেশ বড় হওয়ায় তিনি তা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন। মীম এবারও সঠিক উত্তর দিলো। অতঃপর যে প্রশ্নটি এল এর উত্তরে একটি মাত্র শব্দ যাতে দুইটি যুক্তবর্ণ রয়েছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যুক্ত বর্ণবিশিষ্ট শব্দগুলো উচ্চারণ করলে উচ্চারণ ত্রুটির কারণে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দে পরিণত হয়। একারণে তিনি মীমকে ব্ল্যাকবোর্ডে পাঠিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরটি লিখতে বললেন। শিক্ষকরা এবার সত্যই অবাক হলেন এই ভেবে যে মেয়েটি মুখে ভুল বললেও উত্তরটি লিখলো সঠিক... .. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষা অফিসারের সহায়তায় একীভূত শিক্ষার আলোকে ব্যবহৃত তার কয়েকটি কৌশল শিক্ষকদের মাঝে বিশ্লেষণ করলেন। শিক্ষকরা একীভূত শিক্ষা বিয়য়ে আরো প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং খুশি মনে মীমের ভর্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

৫.৫ শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে একীভূত শিক্ষার আলোকে অভিযোজন

শ্রেণিকক্ষে একীভূত শিক্ষার আদলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় সাধারণত শিক্ষকদের মাঝে দুই ধরনের আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, এক ধরনের শিক্ষক আছেন যারা মনে করেন একীভূত শিক্ষায় সুবিধা বঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাই মুখ্য। কাজেই তাদের মনোযোগ থাকে সুবিধা বঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী শিশুদের দিকে। এতে তারা শিখন-শেখানো কার্যক্রম এমনভাবে সাজিয়ে থাকেন যাতে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিখন নিশ্চিত হলেও সাধারণ শিশুরা শ্রেণিতে বিরক্তিকর সময় কাটায় এবং তারা শিখনে তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, আরেক ধরনের শিক্ষক রয়েছেন যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সুবিধা বঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী শিশুরা কখনোই সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়ার কিংবা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা রাখে না। ফলে তাদের শ্রেণিতে পরিচালিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিই একীভূত শিক্ষা দর্শনের পরিপন্থী।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তা সব ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী হয়। অনেক শিক্ষক এমনকি বিশেষজ্ঞ পর্যন্ত দেখা যায় যে, সাধারণ শ্রেণিতে সুবিধা বঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী শিশুদের উপস্থিতির বিষয়টিকে অতি মাত্রায় জোর দিতে গিয়ে তা অনর্থক জটিল করে ফেলেন। মূলত একজন সাধারণ শিক্ষক তার সাধারণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্যে সামান্য কিছু কৌশল অবলম্বন করলে সহজে সকল শিশুর শিখন চাহিদা পূরন করতে পারেন। যেমন: বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বিবেচনা করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হলো দলীয় কাজ। দলীয় কাজ প্রদানে প্রদানে কিছুটা কৌশল প্রয়োগ করলে সাধারণ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি সুবিধা বঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরও শিখন নিশ্চিত করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক ও শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হয়। সকলের অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়া থেকে শিশুরা যেমন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং একই সাথে শিক্ষকরাও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীকে শেখানোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই করার সুযোগ পান। শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বাঁধা মোকাবিলায় শিক্ষকরা যখন নতুন নতুন উপায় খোঁজেন তখন তাঁরা শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আরো ইতিবাচক হন এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া হয় আনন্দদায়ক। তাই শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার (শৃঙ্খলা) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু শ্রেণিকাজ পরিচালনার জন্য সময় ৩০-৪০ মিনিট থাকে, তাই শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ পরিচালনায় সময়টা মাথায় রাখা জরুরি। এমনভাবে কাজ নির্ধারণ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনাতেই বেশি সময় চলে না যায়। শিক্ষার্থীরা যাতে দলে কাজ করা ও উপস্থাপনের পর্যাপ্ত সময় পায় সেটি ভাবতে হবে।

এছাড়া যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করলে শিক্ষক তার শ্রেণীতে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারেন তা হলো:

১. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস একীভূত শিক্ষায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের (যেমন: পথ শিশু, পরিবারবিচ্ছিন্ন শিশু) মাঝে অনেক সময় আচরণগত সমস্যা দেখা যেতে পারে যা তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে সৃষ্ট। এ শিশুরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষের পেছনের সাড়িতে বসে অভ্যস্ত। এদেরকে শিক্ষকের চোখের সামনে অর্থাৎ সামনের সারিগুলোতে বসানোর অভ্যাস করলে তারা অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামনের সারিতে বসানো আবশ্যিক। বিশেষ করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রবণ বা দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের একটি ব্যবহার করতে পারে বিধায় অনেক সময় তারা শিক্ষকের পাঠ উপস্থাপনা বুঝতে সমস্যায় পড়ে। এক্ষেত্রে তাদেরকে সামনের সারিতে শ্রেণির প্রথম/ দ্বিতীয় রোলধারী শিক্ষার্থীর পাশে বসালে তাদের কাছ থেকে বেশ সহযোগিতা পেয়ে থাকে।
২. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে শিক্ষকের কথা বোঝার জন্য তার মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অভিব্যক্তি (Facial expression) এবং ঠোঁটের ওঠানামা (Lip reading) গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সে কারণে যতটা সম্ভব শ্রেণিতে তাদের সাথে মুখোমুখি (face to face) যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করা ভালো। তবে শ্রেণিকে স্বরব রাখার জন্য শিক্ষক অবশ্যই কক্ষের বিভিন্ন অবস্থানে হাটা-চলা করবেন এটাই স্বাভাবিক।
৩. একীভূত শিক্ষার প্রাণ হলো একটি ভালো শিক্ষাপোকরণ যা থেকে সকল শিক্ষার্থী লাভবান হয়। ধরা যাক, পাঠের বিষয় বাংলাদেশের মানচিত্র। শিক্ষক একটি পোস্টার পেপারে বাংলাদেশের মানচিত্র একে নিয়ে এসেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপোকরণটি দেখে মুগ্ধ। কিন্তু শ্রেণীর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি মন খারাপ করে বসে আসে। শিক্ষক এবার শিক্ষাপোকরণটি টেবিলের উপর রেখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সামনে এনে তার হাত দুটো উপকরণটির উপর রাখলেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি যেন আনন্দে আত্মহারা! কারণ শিক্ষক উপকরণটি তৈরির সময় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুটির কথা মাথায় রেখে মানচিত্রের বর্ডারগুলোতে আঠা দিয়ে ডালের দানা বসিয়েছেন যা অন্যান্য শিক্ষার্থীর নিকট উপকরণটির সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে এবং একই সাথে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় শিখন চাহিদা পূরণ করেছে।
৪. একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নপত্র অনেক সময় একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের বাঁধা হয়ে দাড়ায়। ধরা যাক, বিজ্ঞানের একটি প্রশ্নপত্রে ১০ টি প্রশ্নের মধ্যে ৭ টির উত্তর দিতে বলা হলো যেখানে ৫টিতে বলা

হয়েছে চিত্র আবশ্যিক। এক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রথমেই খুঁজতে থাকে যেগুলোতে চিত্র চাওয়া হয়নি। তারপরও তাদেরকে ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যেখানে চিত্র আবশ্যিক। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রুতিলেখকের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়। ফলে তাদের পক্ষে চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন ওঠতে পারে যে, তাহলে কি প্রশ্নে চিত্র আবশ্যিক করা যাবে না- অবশ্যই যাবে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের মতো একটি বিষয়েতো অবশ্যই এমন কিছু অধ্যায় আছে যেখানে চিত্রসহ বিষয়গুলো আলোচনা করাটাই মূখ্য। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যেখানে চিত্র অপরিহার্য নয় সেখানে যেন অযথা তা আবশ্যিক না করা হয়। প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ‘অথবা’র মাধ্যমে চিত্রহীন প্রশ্ন সংযোজন করা যেতে পারে।

৫. উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় সাধারণত একেকটি প্রশ্নের উত্তরকে ৩টি ভাগে ভাগ করে নম্বর প্রদান করা হয়। যেমন: একটি গ্রুপ পায় সর্বোচ্চ নম্বর (যেমন: ৮/১০), আরেকটি গ্রুপ মাঝা মাঝি নম্বর (যেমন: ৬-৭/১০) এবং অন্য আরেকটি গ্রুপ থাকে যারা পেয়ে থাকে পাশ নম্বর (যেমন: ৫/১০) অথবা তারা ফেল করে। তৃতীয় গ্রুপের মধ্যে প্রায়ই দেখা শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পড়ে যায়। কারণ একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উত্তর লিখার সময় খুব ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে থাকে। যেমন: ৫ম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা লিখন শুরু করে... “আলোচ্য অংশটুকু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (...) কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে”, যা পরীক্ষকগণ সানন্দে গ্রহণ করেন। কিন্তু একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এই বাক্যটিকে যেভাবে প্রকাশ করে তা হলো: “এ অংশটি (...) কবিতার। এ কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”, যা পরীক্ষকগণ কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না এবং শিক্ষার্থীকে ফেল নম্বর প্রদান করেন। কিন্তু আলোচনার বিষয় হলো বাক্য দুটি দিয়ে কি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, নাকি এদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে বাক্য দুটি দিয়ে একই অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। যদি একই অর্থ প্রকাশ পায় তাহলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটিকে ফেল নম্বর প্রদান করা অন্যায্য। সে নিশ্চয় সর্বোচ্চ নম্বর পাবে না; তবে তাকে পাশ নম্বর তো দেয়াই যায়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়ন কোনো একক ব্যক্তির প্রচেষ্টা নয়, বরং বিদ্যালয়ের সাথে সকল অংশীজন যেমন: শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজপতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের একটি সমন্বিত প্রয়াশের ফল হলো একীভূত শিক্ষা।

অধ্যায় ৬

শিক্ষায় জেন্ডার প্রসঙ্গ



৬.১ জেন্ডার ধারণা

৬.১.১ জেন্ডার কী?

জেন্ডার বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্ব, যার উৎপত্তি হয় পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে। এ ধারণাটি নারী পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আশা-আকঙ্ক্ষা, আচরণে অন্তর্নিহিত আছে যা সমাজ ও অভিজ্ঞতার আলোকে শেখা। সময়ের সাথে সাথে এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে এটা পরিবর্তিত হতে পারে। এই ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি সমাজ কাঠামোয় বিরাজমান নারীদের অধস্তন অবস্থাকে বিশ্লেষণ সহায়তা করে। সমাজে নারীদের এ অধস্তন অবস্থা পরিবর্তন ও নিরসনযোগ্য, কেননা এটি জৈবিকভাবে পূর্ণ নির্ধারিত বা চিরদিনের জন্য নির্ধারিত নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, পরিবার সমাজ বা সংস্কৃতি কর্তৃক সৃষ্ট, বিনির্মিত নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে জেন্ডার নামে চিহ্নিত করা হয়।

৬.১.২ জেন্ডার ও সেক্স এর তুলনা

নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্য (Biological difference) রয়েছে, সেক্স শব্দ দ্বারা তা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেক্স শব্দটি সবার নিকট পরিচিত। এর নানা অর্থ আছে। তবে মূল অর্থটি জীববিজ্ঞান এর সঙ্গে (Biology) জড়িত। জীব বিজ্ঞানের সুত্র অনুসারে নারী পুরুষের মধ্যে কিছু জৈবিক পার্থক্য (Biological) আছে। যেমন নারী সন্তান ধারণ করে, পুরুষ করে না, যৌন মিলনে পুরুষ সক্রিয়, নারী তুলনামূলকভাবে কিছুটা নিষ্ক্রিয়; পুরুষের দাঁড়ি গোঁফ হয়, নারীর হয় না, সন্তান ধারণ ও লালনের জন্য নারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, পুরুষের সেগুলো নেই। নারী ও পুরুষের এ শারীরিক পার্থক্য এটি সামাজিক ভাবে সৃষ্ট নয় বরং জৈবিক। নারী ও পুরুষের এই জৈবিক পার্থক্য বুঝাতেই সেক্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভিন্নতার জন্য

জাতির দুই অংশের একটি পুরুষ অন্যটি নারী। সেক্স অর্থ নারী-পুরুষ জৈবিক ভেদ। জৈবিক কারণে কেউ পুরুষ হয়ে জন্মায়, কেউ নারী হয়ে জন্মায়। নারী ও পুরুষের সেক্স পার্থক্য নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যখন নারী ও পুরুষের এই জৈবিক পার্থক্যের দোহাই দিয়ে পুরুষের মধ্যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সেগুলোকে পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং নারীর মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সেগুলোকে নারীসুলভ (feminine) বৈশিষ্ট্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে Biological বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক বা যোগ নেই; সমাজ এই বিভেদমূলক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে পুরুষত্ব এবং নারীত্বের ধারণার জন্ম দিয়েছে। পুরুষও নারীর সেক্স ভেদাভেদকে ভিত্তি করে সমাজ নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সমাজে কর্তৃক সৃষ্ট, সমাজ নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কেই জেভার বলা হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের পার্থক্য হলো জৈবিক পার্থক্য অর্থাৎ সেক্স পার্থক্য। অপরপক্ষে পুরুষত্ব এবং নারীত্ব সমাজ বিনির্মিত গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, আচরণ, সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা ভূমিকার পার্থক্যই হলো সেক্স পার্থক্য। জেভার নারী-পুরুষের কাজের মাঝে কোন পার্থক্য করে না কিন্তু সেক্স নারী-পুরুষের কাজের মাঝে পার্থক্য করে।

জেভার প্রত্যয়টি নারী শব্দের চেয়ে ব্যাপক ও অধিকতর বস্ত্তধর্মী। কারণ জেভার শুধু নারীকে নয়, নারী ও পুরুষ উভয়কে বোঝায়। লিঙ্গ নিরপেক্ষ জেভার নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বা ক্ষমতার কমবেশী সম্পর্কে ইঙ্গিত করে না। ফলে জেভার বস্ত্তনিষ্ঠ। জেভার নারী ও পুরুষের জৈবিক ও সামাজিক পার্থক্যকে যুক্তি সহকারে চিহ্নিত করে। নারী ও পুরুষের জৈবিক ভূমিকার সঙ্গে সামাজিক ভূমিকার প্রভেদ তুলে ধরে নারী ও পুরুষের মধ্যে বস্ত্তনিষ্ঠ ও ইতিবাচক সম্পর্কগুলোকে সামনে নিয়ে আসে এবং সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনগুলো জীববিজ্ঞানের সূত্রদ্বারা নির্ধারিত এবং কোনগুলো সামাজিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিদান করে। এভাবে জেভার প্রত্যয় জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে নারীকে পুরুষের অধিনতাপাশে আবদ্ধ করার সামাজিক প্রক্রিয়ার অসারতা প্রমাণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সেক্স ভূমিকা ও জেভার ভূমিকার তফাৎ বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। নারী সন্তান ধারণ করে, এই নারীর ভূমিকা সেক্স ভূমিকা। জীববিজ্ঞানের নিয়মে একমাত্র নারী সন্তান ধারণে সক্ষম, পুরুষ এখানে অক্ষম। অপরপক্ষে সমাজ সন্তান পালনের দায়িত্ব এককভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে এই যুক্তিতে যে সন্তান নারীর জৈবিক ভূমিকা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়, পুরুষ ইচ্ছা করলে সন্তান পালন করতে পারে। সন্তান প্রতিপালনের কর্মকাণ্ডে পুরুষের উপর জৈবিক কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সন্তান প্রতিপালনের নারীর উপর জীববিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই সন্তান প্রতিপালন নারীর সেক্স ভূমিকা নয়। এই ভূমিকা নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া সমাজসৃষ্ট ভূমিকা অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালন নারীর জেভার ভূমিকা। নারী গৃহে ঘর-গৃহস্থলীর কাজ করবে। পুরুষ অফিস, কলকারখানা কিংবা ক্ষেত-খামারে কাজ করে। নারীর গৃহ কর্মেও বিনিময়ে কোনো আর্থিক সুবিধা নেই, পুরুষ অফিস, কলকারখানা কিংবা ক্ষেত-খামারে কাজের বিনিময়ে আছে আর্থিক রোজগার। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই কর্মবিভাজন এর কোনো জৈবিক ভিত্তি নেই। জীববিজ্ঞানের এমন কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই যে, পুরুষকে অফিসে কাজ করতে হবে এবং নারীকে গৃহকর্ম করতে হবে। এই কর্মবিভাজন সমাজ সৃষ্টি করেছে। সমাজ বিনির্মিত নারী-পুরুষ কর্ম বিভাজন হলো জেভার কর্ম বিভাজন, সেক্স কর্ম বিভাজন নয়। ইচ্ছা করলেই এই কর্ম বিভাজন বদলে দেখা যায়। পুরুষকে যদি ঘরের রান্না-বান্না কাজে নারীকে যদি অফিস-কলকারখানায় কিংবা ক্ষেত-খামারের অর্থকারী কাজে নিয়োগ করা হয়, তাহলে জীববিজ্ঞানের নিয়মে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে

না। নারী-পুরুষের সেক্স ভূমিকা প্রকৃতির অমোঘ বিধান দ্বারা নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়; অপরপক্ষে জেভার ভূমিকা সমাজ সৃষ্ট এবং পরিবর্তনীয়। জেভার ভূমিকা নারী নির্যাতন, অধস্তন অবস্থা এবং পুরুষের প্রাধান্যের কারণ ও বহিঃপ্রকাশ। তাই নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা আনয়নের লক্ষ্যে, নারী নির্যাতন নির্মূল করতে এবং নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে এ ধরনের জেভার ভূমিকায় পরিবর্তন আনা দরকার। যেমন: মহিলারা সন্তান লালন পালনকারীর পরিবর্তে আয় উপার্জনকারী হতে পারে এবং পুরুষেরা আয় উপার্জনকারী পরিবর্তে সন্তান লালন পালনকারী হতে পারে। এটা নির্ভর করবে নারী-পুরুষের যোগ্যতা তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার ওপর।

কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশে নারীর পেশা বলতে বোঝাতো গতানুগতিক দুটি পেশা শিক্ষকতা ও নার্সিং যা সমাজ প্রদত্ত চিরাচারিত নারীর সেবামূলক ভূমিকার বর্ধিত সংরক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ শিশুদের দেখাশুনা করা আর রোগীদের সেবা করা। নির্দেশক একটি অনুশীলন পত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো। আপনি চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন এর মাঝে কোনগুলো জেভার এর সাথে সম্পর্কযুক্ত (সামাজিক/ সাংস্কৃতিক) এবং কোনগুলো সেক্স বা লিঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত (দৈহিক বা শারীরিক পার্থক্য)

৬.১.৩ সেক্স ও জেভারের মধ্যে পার্থক্য

সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ	জেভার বা সামাজিক লিঙ্গ
জৈবিক লিঙ্গ নারী ও পুরুষের জৈবিক বিশেষত্ব।	জেভার সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে নির্ধারিত।
প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত যা ব্যক্তি জন্মগতভাবে লাভ করে।	বিভিন্ন সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, যেমন-পরিবার, সরকার, জনগোষ্ঠী, স্কুল, মিডিয়া ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে জেভার সৃষ্টি করে।
জৈবিক লিঙ্গ স্থান-কাল নির্বিশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	জেভার সামাজিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার ফলে সংস্কৃতি ভেদে ও সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটে।

৬.২ জেভার সমতা

জেভার ইকুয়ালিটি বা জেভার সমতা বলতে সমাজে নারী-পুরুষের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য এবং তাদের সম্পাদিত সঠিক ভূমিকা ও সমস্যা মূল্যায়নকে বোঝায়। অর্থাৎ সমাজের নারী-পুরুষ বা ছেলে মেয়ে এর চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে পারিবারিক সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমস্যা মূল্যায়নের প্রবণতাকে বোঝায়। জেভার সমতা বা সমঅধিকার পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে এবং সুবিধা ভোগে নারী-পুরুষের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ও তাদের সম্পাদিত ভূমিকার সমস্যা মূল্যায়ন করে। এটি তাদের পরিবারে এবং সমাজে সম-অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল। মূলত জেভার সমঅধিকার শুরু হয় ছেলে-মেয়ে সম মূল্যায়নের মাধ্যমে। সমাজে জেভার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন নারী ও পুরুষ নিজেদের সম্ভবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। জেভার সমতা মানে হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যে অথবা বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সমান সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা। এ ব্যপারে বাংলাদেশের সংবিধানে ২৮ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে।

“কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না”। আবার বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারীগণ পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন। অধিকার বলতে বোঝায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও আইন সংক্রান্ত অধিকার লাভ, যেমন- পুরুষের মত নারী জমির মালিক হতে পারবেন ও ব্যবস্থাপনার ভার নিতে হবে। নারী ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন ও চলাফেরার সমান সুযোগ পাবেন।

উৎপাদনমূলক সম্পদ, যেমন-শিক্ষা, ভূমি, তথ্য ও আর্থিক সম্পদের উপর নারী পুরুষের সমান কর্তৃত্ব থাকবে। পরিবার, সমাজ, এবং জাতীয় পর্যায়ে সম্পদ বিনিয়োগ ও বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার অধিকার নারী অর্জন করবে। জেভার ইকুয়ালিটি বা নারী-পুরুষের সম মর্যাদা বা নারী-পুরুষ উভয়ই বাধাধরা সনাতন অভিমতের ভিত্তিতে আরোপিত বিধি নিষেধ ডিঙ্গিয়ে অনমনীয় ও কঠোর সনাতন নারী-পুরুষ সম্পর্ক এবং স্বেচ্ছায় কোন কিছু নির্বাচন করতে পারবে। নারী-পুরুষের সাম্য বলতে বোঝায় যে নারী-পুরুষের ভিন্নরূপ আচরণ আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদাগুলো সমভাবে বিবেচিত হবে, মূল্যায়িত হবে এবং সহায়তা পাবে। এর অর্থ এই নয় যে, নারী পুরুষকে একই রূপে হতে হবে। কিন্তু নারী বা পুরুষরূপে জন্মলাভের উপর তাদের অধিকার কর্তব্য এবং সুযোগ পাওয়া নির্ভর করবে না।

জেভার ইকুইটি বা জেভার সাম্য দ্বারা জেভার ন্যায়পরায়ণতা বা নিরপেক্ষতা বোঝায়। জেভার সাম্য হচ্ছে নারী ও পুরুষকে ন্যায় এর দৃষ্টিতে দেখার একটি প্রক্রিয়া। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের সুফল এবং দায়িত্ব প্রদান ও বন্টনের ক্ষেত্রে একটি ন্যায়ভিত্তিক আংশীদারিত্ব প্রদান করা। এর মানে হচ্ছে যাদের চাহিদার তুলনায় সম্পদ বা প্রাপ্যতার সুযোগ কম আছে তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সম্পদের ভাগ দেয়া। অর্থাৎ বিশেষভাবে বঞ্চিত কোন গোষ্ঠিকে সম্পদ, সুযোগ ও অধিকার প্রদান করা এবং প্রয়োজনে বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করা। সমাজের প্রচলিত বঞ্চনা ও অসম ব্যবস্থার প্রভাবে নারী-পুরুষ সমাজে সমভাবে ভূমিকা পালনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, মনে রাখতে হবে, জেভার সাম্য হচ্ছে জেভার সমতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। জেভার সাম্য এর অর্থ নারী ও পুরুষের চাহিদা অনুযায়ী অধিকার সুযোগ সুবিধা ও দায়িত্বগত দিক থেকে সমতুল্য সুযোগ যা নারী ও পুরুষদের একই ধরনের কাজে ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ দূরে করে পরিপূরকমূলক স্বচ্ছ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অর্থাৎ জেভার ইকুয়ালিটি বা সমতা বলতে সমাজে নারী পুরুষের চাহিদা অধিকার সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়ে সমতুল্য করে তোলার চেষ্টাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারী-পুরুষের জেভার ভিত্তিক কাজে সৃষ্ট অসুবিধাগুলো দূর করে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে জেভার ন্যায় পরায়ণতা স্বচ্ছ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়।

অতএব, আমরা বলতে পারি, জেভার ইকুইটি বা জেভার সাম্য হচ্ছে সমাজে নারী-পুরুষের এমন একটি সমবস্থান যা কিনা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিপূর্ণ মানবাধিকার নিশ্চিত করণে ও তার ফল ভোগে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ কম। এই পরিস্থিতি পরিবর্তে লক্ষ্যে সরকারী সেক্টরে নারীর সংখ্যা বাড়ানো জন্য বাংলাদেশের সরকার নারীদের জন্য সংরক্ষিত পদসৃষ্টি করে

কোটা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। জেল্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠায় এই সরকারী উদ্যোগের ফলে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বেড়েছে।

৬.৩ জেল্ডার সংবেদনশীলতা

যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ একই স্থানে অবস্থান থেকে একই কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করবে, একই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিনিময়ে একই মর্যাদা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এটাই সবার নিকট প্রত্যাশিত। এ বিষয়টি অনুধাবন করে গুরুত্ব সহকারে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিটি কাজে পুরুষ ও মহিলার সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে জেল্ডার সংবেদনশীলতা বলা হয়।

তবে নানা কারণে কার্যত এ বিষয়টির মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। বর্তমানে দেখা যায় মহিলারা বহুক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীর সংখ্যার দিক থেকে, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে, মর্যাদা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে, নেতৃত্ব প্রদানের দিক থেকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদানের ইত্যাদি সকল দিক থেকেই মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছেন। অথচ উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এ অবস্থা মোটেও কাম্য নয়। তাই একটি প্রতিষ্ঠানের জনবল নিয়োগে, কর্মবন্টনে, দায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রদানে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, যথাসম্ভব সমান গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এটাই ঐ প্রতিষ্ঠানের জেল্ডার সংবেদনশীলতা।

৬.৪ জেল্ডার সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন জেল্ডার সংবেদনশীল হয়, তখন সেখানে বেশ কিছু সুবিধা উপভোগ করা যায়-

- ১) শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে
- ২) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের আত্মবিশ্বাস বাড়ে
- ৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগ্রত হয়
- ৪) শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়
- ৫) শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান বৃদ্ধি পায়
- ৬) শিক্ষালাভের পরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়ে
- ৭) দারিদ্র দূরীকরণ অনেকাংশে বেড়ে যায়
- ৮) মা ও শিশু উভয়ই সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়
- ৯) বংশ পরম্পরায় শিক্ষার ধারা বজায় থাকে
- ১০) সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়

৬.৪.১ শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রমে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়ের চাহিদা ও জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে কি না - তা অনুধাবন করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, শাখা (বিজ্ঞান/ মানবিক/ বানিজ্য) ও বিষয় পছন্দের ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়েরই নিজস্ব মতামতের ভূমিকা থাকে কি-না। বিজ্ঞান/গণিত ও সাহিত্য/ইতিহাস- এ ধরনের বিষয়ে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সমতার ভিত্তিতে হয় কি না এবং এ ধরনের বিষয়ে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের সুযোগ তুলনামূলক কেমন- তাও যথেষ্ট বিবেচনার বিষয়।

অধিকমুখ, প্রতিবন্ধিতা, জাতি (নৃ-গোষ্ঠী), ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে কি না- তাও গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত সহ-শিক্ষাক্রমিক ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে কি না- তা মূল্যায়নের মাধ্যমেও জেভার-নিরপেক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

৬.৪.২ শিখন শেখানো পরিবেশ

শ্রেণি কক্ষের শিখন শেখানো পরিবেশে শিক্ষক অনিচ্ছাকৃতভাবেই জেভার পক্ষপাতমূলক আচরণ করতে পারেন। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে এমন একটি আবহ তৈরি করতে হবে যাতে করে সকল শিক্ষার্থী নিজেদের সমান ভাবে পাবে। নিচে এ সমস্যা দূর করার জন্য বেশ কিছু কৌশল তুলে ধরা হলো-

❖ নিয়ম নীতি নির্ধারণ

একজন শিক্ষক একদম শুরু থেকেই বেশ কিছু নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে দিবেন যাতে করে শ্রেণিকক্ষে সমতা উন্নীত হয়। এর একটি কার্যকরী উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সাথে মিলে শ্রেণির নিয়মকানুন তৈরি করা। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন একটি সমতা এবং সকলের জন্য সম্মানজনক শ্রেণিকক্ষ তৈরিতে তাদের কোনো মতামত রয়েছে কিনা, তাদের বলা কথাগুলো শুনুন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরি করুন ও সেগুলো মেনে চলার দিক নির্দেশনা প্রস্তুত করুন।

এটি শিক্ষককে এমন কিছু নিয়ম প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে যেগুলো সকল শিক্ষার্থীরা মিলে প্রস্তুত করেছে। খেয়াল রাখতে হবে যে, এ সকল নিয়মগুলো যেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য সম্মানজনক হয় এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

❖ সকলের সমান অংশগ্রহণমূলক আসন ব্যবস্থা

যদি শ্রেণিকক্ষে এমন কোন শিক্ষার্থী খুজে পাওয়া যায়, সে ছেলে বা মেয়ে যা-ই হউক, যে কিনা শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে না- সেক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের আসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ, যারা পিছনের সারিতে বসে চুপ করে থাকে, তাদের শ্রেণিকক্ষের সামনের সারিতে বসিয়ে দিন।

শিক্ষকেরা সাধারণত সামনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীদের সাথে বেশি মিথস্ক্রিয়া করে থাকেন। সুতরাং যদি সম্ভব হয় তাহলে সকল শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে সামনে বসার সুযোগ করে দিতে হবে।

❖ সকল শিক্ষার্থীদের নিকট হতে সমান একাডেমিক এবং আচরণগত প্রত্যাশা

কোনো শিক্ষার্থী শুধুমাত্র ছেলে বা মেয়ে বলে তার জন্য কোনো পাঠ সহজ করা যাবে না অথবা তাদের জন্য দেয়া কোনো কাজ নিজে করে দেয়া যাবে না। এমন করলে ঐ শিক্ষার্থীদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি হবে যার ফলে তারা নিজেদের আর সবার সমান মনে করবে না।

❖ দলীয় কাজ করানো

সাধারণত শ্রেণিকক্ষে এমন কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা শ্রেণিকক্ষের সকলের সামনে কথা বলতে পারে না, কিন্তু ছোট ছোট দলে অংশগ্রহণ করতে পারে। একটি শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাই এমন বিভিন্ন দলে ভাগ করে কাজ করতে দেয়া উচিত।

৬.৪.৩ শিখন শেখানো কার্যক্রম

একটি শ্রেণিকক্ষ সমতার আলোকে সংগঠিত করার পর এর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে খেয়াল করতে হবে।

❖ সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান দৃষ্টি দেয়া

শ্রেণিকক্ষে ছেলে এবং মেয়ে উভয় ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রতি জোর দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষের কোন কাজে অংশগ্রহণের জন্য শুধুমাত্র ছেলেদের নিলেই হবে না, বরং যোগ্যতা অনুযায়ী মেয়ে শিক্ষার্থীদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

❖ উত্তর প্রদানে যথেষ্ট সময় দেয়া

ছেলে বা মেয়ে যে-ই হউক না কেন, কোন কোন শিক্ষার্থীর উত্তর দিতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ৫-৬ সেকেন্ড বেশি সময় দিলে সব ধরনের শিক্ষার্থীর-ই শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাবে।

❖ জেভার পক্ষপাতহীন ভাষার ব্যবহার

অনেক সময় আমরা সবাইকে বুঝাতে শুধুমাত্র 'ছাত্র' ব্যবহার করে থাকি যা আসলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝায় না। এক্ষেত্রে এরকম শব্দ প্রয়োগ হতে বিরত থাকতে হবে। অন্য দিকে, 'সবাই' অথবা 'সকল' শব্দ প্রয়োগ সব ধরনের শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে থাকে।

❖ শারীরিক ভাষা

শিক্ষকদের বুঝতে হবে যে, ছেলে এবং মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের করা শারীরিক আচরণ একই রকম হবে না। যখনই কোন ছেলে বা মেয়ে শিক্ষার্থী কথা বলবে, তখন তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে হবে এবং তাকে হঠাৎ করে থামিয়ে দেয়া যাবে না।

❖ শৃঙ্খলা

যখন কোনো ছেলে শিক্ষার্থী মেয়ে শিক্ষার্থীকে অথবা কোন মেয়ে শিক্ষার্থী ছেলে শিক্ষার্থীকে কটুক্তি করে তখন শিক্ষককে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। যদি এই কটুক্তি জেভারের কারণে হয়, তাহলে ঐ শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভীত থাকবে। এমন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অপরাধকারীদের সনাক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে করে ছেলে বা মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীরাই বুঝবে যে তারা নিজেরাও অন্য সবার মত শ্রেণীকক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ছেলে বা মেয়ে যে-ই অপরাধ করবে, তারা একই ধরনের শাস্তি ভোগ করবে।

৬.৪.৪ শিখন-শেখানো সামগ্রীসমূহ বাছাই এবং ব্যবহারে করণীয়

- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর মধ্যে এমন কোন ইলাস্ট্রেশন আছে কি যা ব্যবহারকারীদের কাছে জেভারগতভাবে পক্ষপাতমূলক মনে হতে পারে?
- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর মধ্যে এমন কোন বিষয়বস্তু আছে কি যা মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে?
- জীবন-দক্ষতার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের সামর্থ্য, পারদর্শিতা বা কর্তব্যের জায়গায় কোন পার্থক্য আছে কিনা?
- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর মধ্যে মেয়ে চরিত্রকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে নাকি কোন ছেলে বা পুরুষ চরিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে?
- গৃহস্থালী কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবন-দক্ষতার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েকে কি সমতার ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে?
- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোতে বর্ণিত দলীয় কাজ বা কার্যাবলির ক্ষেত্রে জেভার-সমতা রক্ষা করা হয়েছে কিনা?
- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোতে বর্ণিত উপকরণসমূহ কি জেভার-সমতা/ভারসাম্য নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সহায়ক?
- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোতে এমন কোন বিষয়বস্তু আছে কি যা নারী ক্ষমতায়নকে আরো বেগবান করতে সহায়ক?
- জীবন-দক্ষতা সংক্রান্ত ম্যানুয়ালের মাধ্যমে জেভার ইস্যুগুলোর প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হবে কি?
- জীবন-দক্ষতা সংক্রান্ত ম্যানুয়াল জেভার-সমতা/ ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়ক কিনা?

৬.৪.৫ বিবিধ

গণিত শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়েরই সমান সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, দৈর্ঘ্য/ উচ্চতা ইত্যাদি শেখানোর ক্ষেত্রে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে সামনে ডেকে এনে দুইজনের উচ্চতা পরিমাপ করে দেখানো যেতে পারে।

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত বস্তু (Real Object) স্পর্শকরণের মাধ্যমে বিজ্ঞান, ব্রহ্ম পদ্ধতির মাধ্যমে, অ্যাবাকাস বা টেলর ফ্রেইমের মাধ্যমে গণিতের ধারণা দেওয়ার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করলে শিখনফল অর্জন অনেক সহজ হবে।
- সর্বোপরি, বিদ্যমান শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোতে যেখানে যেখানে জেভার-সংবেদনশীল বিষয়বস্তু রয়েছে- সেগুলো পরিমার্জন করে একটা জেভার-নিরপেক্ষ বা জেভার-বান্ধব বিদ্যালয় বা শিখন-শেখানো পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে জেভার-সমতা আনয়ন করা সম্ভব হবে।

৬.৫ জেভার বৈষম্যের কারণ

বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় আমাদের দেশে জেভার বৈষম্যের কারণগুলো হলোঃ

- গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
- পর্দা ব্যবস্থার অপব্যবস্থা ও ভ্রান্ত ধারণা
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ
- মেয়েদের শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পুরুষের অধিক প্রাধান্য
- নারী শিক্ষার অনগ্রসরতা
- নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব
- নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
- নারী অধিকার আইনের প্রয়োগহীনতা
- ধর্মীয় বিধানের অপব্যবস্থা
- বিভিন্ন ধর্মে নারীর অসম অধিকার
- নারীর প্রতি অমর্যাদা ও অবহেলা
- গণদরিদ্রতা।

গ্রন্থপঞ্জি

অধ্যাপক মুহম্মদ মোকাররম হোসায়েন, রঙ্গলাল রায়, ড. হ্যাপি দাস, মোঃ আব্দুল ওহাব ও মোঃ কামরুজ্জামান, (২০১৫), ডিপিএড মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ময়মনসিংহ: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একডেমী (নেপ)।

অধ্যাপক রীনাত ফাওজিয়া, (২০১৪), শিশুর বিকাশ ও বর্ধন, ঢাকা: জনতা প্রকাশ।

অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম ও মোঃ আব্দুস সালাম, (২০০৩), বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ঢাকা।

আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ, (২০০৯), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ, (২০১৭), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

আবু হামিদ লতিফ, (২০০৭), শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, ঢাকা: অর্ক প্রকাশনী।

আব্দুল খালেক ও নাজমুল হক, (১৯৯৬), আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা: হাসান বুক হাউস।

আবু হামিদ লতিফ, (২০০৭), শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, ঢাকা: অর্ক প্রকাশনী।

এ কে এম সাইফুজ্জামান, জয়নব আকতার ও অন্যান্য, (২০১০), প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, একীভূত শিক্ষা, ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

এম তারিক আহসান, (২০১৪), বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুদেও একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণে প্রাক-সনাক্তকরণ ও প্রাক-প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব: একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, পৃ.২৩-২৯।

এশিয়ান সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন (এসিআইই) ও একশন এইড বাংলাদেশ (এএবি), (২০১৫), একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল, ঢাকা: এসিআইই ও এএবি।

কামরুন্নাহার বেগম ও সালমা আখতার, (২০০০), বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (২০১৮), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), (২০১১), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ঢাকা: এনসিটিবি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), (২০১৭), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকা, ঢাকা: এনসিটিবি।

জিয়াউল হাসান ও অন্যান্য, (২০০৯), সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সহায়ক পুস্তিকা, ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), (১৯৮৮), আবশ্যিকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা), ঢাকা: এনসিটিবি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), (১৯৮৯), আবশ্যিকীয় শিখনক্রমভিত্তিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ঢাকা: এনসিটিবি।

ড. মোঃ আবুল এহসান, (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়ন: নীতি ও পদ্ধতি, ঢাকা: ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২০০৮), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো, ঢাকা: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২০১৭), Annual Sector Performance Report ২০১৭, ঢাকা: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা।

মুহম্মদ নাজমুল হক, মোঃ আহসান হাবীব ও সাইরা হোসেন, (২০১৮), শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন।

মিসেস মেহেরুল্লাহা, গোলাম কিবরিয়া, ড. হ্যাপি দাস, ড. অসীম দাস, এ বি এম আহসান রকিব ও শাহরিয়ার শফিক, (২০১৫), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খণ্ড), ময়মনসিংহ: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)।

মো: আব্দুল আজিজ, মমতাজ জাহান ও নাজমুল হক, (২০০০), সম্পাঃ মোঃ আলী আজম, প্রাথমিক শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তাধারা, ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

মমিনুর রশীদ, আইরিন পারভীন ও মোঃ মাহহারুল হক, (২০০৮), প্রধান শিক্ষকদের বিনিয়াদি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

সুশীল রায়, (২০১৬), শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, কোলকাতা: সোমা বুক এজেন্সী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২০১০), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২০১০), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, (২০১৪), একীভূত শিখন শেখানো বিষয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল, ঢাকা: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

সেলিনা হোসেন ও মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, (২০০৯), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ-১, ঢাকা: সময় প্রকাশন।

হোসেন, মোঃ আলমগীর ও অন্যান্য(২০১৬), পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-তথ্যপুস্তক, ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

Banu S (1992). Bikash Monobigyan Part 1 and 2. Bangla Academy, Dhaka

Rahman, S (1987), Curriculum Process, Bishwa Parichaya, 37 Bangla Bazar, Dhaka.

Jack C. Rechards (2002) Curriculum Development in Language Teaching Place

Hayes, D. (2000), Planning Teaching and Class Management in Primary School, London and Newyork: Falmer Press, P 1-105

Ministry of Women and Children Affairs (MoWCA), (2013), Integrated Early Childhood Care and Development (ECCD) Policy, Dhaka: MoWCA.

Ministry of Primary and Mass Educaton (MoPME), (2013), Country Report on Early Childhood Care and Education in Bangladesh, Dhaka: MoPME.

Papalia, D.E., Olds S.W., and Feldman R.D (2001). Human Development Eighth Edition McGraw Hill Higher Education Company America

Sroufe L.A., Cooper R.G. and DeHart G.B (2000). Child Development. Its nature and course Third Edition McGraw Hill Inc. London.

Sharma, U., Forlin, C., Deppeler, J. & Guang-xue, Y. (2013). Reforming teacher education for inclusion in developing countries in the Asia-Pacific region, *Asian Journal of Inclusive Education*, 1(1), 3-16.

UNESCO, Embracing Diversity: Tool Kit for Creating Inclusive Learning Friendly Environments (2015) Third Edition. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

UNESCO. (2009). Inclusive Education: The Way of the Future. Final Report of the International Conference of Education (48th Session). Paris: UNESCO.

UNESCO. (1990). World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs. Paris: UNESCO.

Dhaka, Zaman S. and Banu S (2006). Manob Bikashe Monobigyan, Bangla Academy

সংযুক্তি-১: শিক্ষকমান

পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
(ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান	১. প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ধারণা কার্যকরভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রদর্শন করতে পারেন।	১.১ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা করতে পারেন।	• বিষয়বস্তু অনুসারে শিখনফল নির্বাচন করা • বিভিন্ন বিষয় পাঠ পরিকল্পনা-কাঠামো সম্পর্কে ধারণা আছে • পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়	
		১.২ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য শৈল্পিকক্ষেত্র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে পারেন।	• প্রাক-প্রাথমিক শৈল্পিকার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ পায়। • প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির প্রতিদিনের কার্যক্রমভিত্তিক সময় বন্টন বিদ্যমান	
		১.৩ শ্রেণিতে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং পরিকল্পনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।	• শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানের সাথে বিষয়ভুক্তক সংশ্লিষ্ট করতে প্রশ্ন সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচন করা আছে • শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন নির্ধারণ করেন • নির্বাচিত প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের ধারণা উন্নয়নের জন্য ‘সহজ থেকে কঠিন’ ক্রমে বিন্যস্ত • পাঠদানকালে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করেন।	
		১.৪ শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যেকোন প্রশ্ন সার্বকভাবে উত্তর দিতে পারেন।	• শৈল্পিকার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার উদাহরণ দিয়ে দেখান। • নির্বাচিত প্রশ্নগুলো সম্ভাব্য উত্তরসমূহ পাঠ-পরিকল্পনায় প্রদান করা আছে	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
		১.৫ বয়স অনুসারে গল্প বলা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, বই পড়া কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে পারেন।	- শিক্ষার্থীরা যখন কোনো বিষয় বুঝতে পারে না বা সমস্যার সমাধান করতে পারে না তখন দৈনন্দিন জীবন অথবা পরিচিত ঘটনা থেকে উদাহরণ দিয়ে উপলব্ধিতে সহায়তা করেন। - শিক্ষার্থীর চাহিদা মোতাবেক গল্প বলা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, বই পড়া এবং খেলাধুলার পরিচালনা পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট - পরিকল্পনায় বিষয়বস্তুভিত্তিক পরিকল্পিত কাজ নির্ধারণ করা আছে। - শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের কাজের নির্দেশনা বিদ্যমান।	
(খ)শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা	২. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল ও শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদান কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	২.১ খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ করতে পারেন।	- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দেন - পরম্পরের মধ্যে আলোচনা করার নির্দেশনা দেন - প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজ প্রদান করেন এবং প্রত্যেকের কাজ করা নিশ্চিত করেন - একটিভিটি সিট দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজ করতে উৎসাহিত করেন - পার্ট চলাকালীন সময় বিভিন্ন শিক্ষাদান কৌশল/কার্যক্রম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। - শিক্ষার্থীরা পার্টে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। - শিক্ষক এবং ছাত্র, ছাত্র এবং ছাত্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
			যাধ্যমে শিক্ষাদান প্রায়ই দেখা যায় - সকল শিক্ষার্থীই পাঠে অথবা পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। - শিখন ত্বরান্বিতিক পাঠদানের ক্ষেত্রে সকল শিখন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন। - শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা আনন্দিত এবং আগ্রহান্বিত বোধ করে।	
(গ) শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা	৩. প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা এবং শিখন ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	৩.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং কার্টামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি রয়েছে।	- শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল অনুসারে পাঠ পরিকল্পনা করে। - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন বিকাশের ক্ষেত্রে ও শিক্ষণক্ষেত্র সম্পর্কে জানান - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কার্টামো সম্পর্কে জানান - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানান - প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন - প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম কীভাবে তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন - প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, জাতীয় দর্শন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন - শিক্ষাক্রম থেকে যোগ্যতা, শিখনফল, আবশ্যকীয় শিখনক্রম, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ইত্যাদি	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
		৩.২ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন ফল এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও শিখন ফল সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি রয়েছে।	- প্রাথমিক জ্ঞানের সকল বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন - প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক জ্ঞানে পাঠ উপস্থাপনের জন্য যে উপরকরণ তৈরি করেন তা শিখনফল অর্জনে সহায়ক। - পরিকল্পিত শিখন ফল সফলভাবে অর্জিত হয়।	
		৩.৩ জাতীয় পরীক্ষাসহ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পরিচিতি।	- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক জ্ঞানের মূল্যায়নের ধারণা ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দক্ষতা প্রদর্শন করেন - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তাদের কাক্সিত শিখন ফল অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দেয়। - প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় তা বলতে পারেন। - প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিভিন্ন সময়ে যে পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য জানান। - প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তাদের কাক্সিত শিখনফল অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দেয়।	
		৩.৪ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের হাতিয়ার সম্পর্কে পরিচিতি।	প্রাক-প্রাথমিক জ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের হাতিয়ার তৈরি করার নিয়ম, পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখেন	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
(ঘ) শিশু সম্পর্কিত ধারণা	৪. শিশুদের শিখন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রাধান্য তত্ত্বগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে শিশুদেরকে ভালোভাবে সহায়তা দেয়া যায় সেসম্পর্কে বাস্তবমুখি সচেতনতা প্রদর্শন করেন।	৪.১ এমনভাবে পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং উপস্থাপন করেন যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়:	নিম্নলিখিত দিক বিবেচনা করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এবং পাঠ-পরিকল্পনা করেন:	
		● শিশুদের শিখনের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং তাদের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা।	● শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি বিবেচনায় নিয়ে শিখন স্তর নির্ণয় করা। ● শিক্ষার্থীর আগ্রহের বিষয় প্রাধান্য দিয়ে পাঠ-দান করেন ● তাদের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষক সাজাগ	
		● ভাষার যথাযথ ব্যবহার এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাধ্যে মিথস্ক্রিয়া।	● শিক্ষার্থীদের কাজে নিয়োজিত রাখা ● পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার করেন ● শিক্ষক ছদ্ম ভাষার কথা বলেন এবং শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেন	
		● বিভিন্ন বয়সি শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপলব্ধি।	● শ্রেণিতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য স্তরভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা করতে পারেন। ● শিক্ষার্থীর বয়স ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ পরিকল্পনায় কৌশল নির্ধারণ করা হয়। ● সবক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের প্রমোডর বা অন্য কাজ দিয়ে যাচাই করার সুযোগ গ্রহণ ● বয়সভেদে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ভিন্ন তা অনুসরণ করে তাদের সাথে কথা বলেন	
		● শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ।	● শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ফিডব্যাক দেন যাতে তারা ভুল উত্তর দিতে ঝিমবোধ করে না ● সব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের যাচাই করার সুযোগ দান।	

		শিক্ষার্থীদের চিত্তাভাবনা করার সুযোগ।	শিক্ষার্থীদের কখনও একাকী কাজ প্রদান আবার প্রয়োজন অনুসারে দলে কাজ দেয়া	
		ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের ধতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক, দৃষ্টিগত, জাতিগত, ভাষাগতাদিক বিবেচনা করা।	- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিচয় নিয়ে সহকর্মীদের সাথে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পেশাজীবীর সাথে আলোচনা করেন। - শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে রেকর্ড রাখেন। - শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন এবং তার ক্রমাধারে উন্নতি অবনতি সম্পর্কে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেন।	
		সকল শিশুদের মত/ধারণা প্রকাশে সমান সুযোগ দান।		
	৫. প্রত্যেক শিশুকে ভালভাবে জানেন।	৫.১ প্রত্যেক শিশুর অগ্রহ অতিজ্ঞতা, দক্ষতা, পূর্ব সাফল্য, পারিবারিক অবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক কৃষ্টিগত প্রভাব সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং তার শিখনের সাথে এসব কিছুর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন।	শিক্ষার্থীর সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে থাকেন। বিশেষ করে যখন	

শিখনের ক্ষেত্রে	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
(ঙ) আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণা	৬. প্রচলিত আইন কানুন ও বিধিগত, বাধ্যবাধকতা এবং এর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি প্রদর্শন করেন।	৬.১ চাকুরির বিভিন্ন শর্ত এবং বিধি সম্পর্কে ভালোভাবে পরিচিত এবং সব ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কিত আইনগুলো মেনে চলেন।	- সামগ্রিক সময়ে প্রচলিত চাকুরিবিধি সহ অন্যান্য আইন-কানুন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করেন। - ছুটিবিধি মেনে চলেন - নিয়মিত সকল কাজে উপস্থিত থাকেন - পূর্ব অনুমোদনকৃত ছুটি ভোগ করেন - সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি মেনে চলেন - সরকারী কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ে বিশেষ অধ্যাদেশ সম্পর্কে জানেন - বিভিন্ন আর্থিক প্রাপ্তি বিষয়ে জানেন এবং কীভাবে তা অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে ধারণা রাখেন - বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে পারেন - বিভিন্ন ধরনের সরকারী ও মার্ট পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তা মেনে চলেন	
		৬.২ সহকর্মীদের সাথে চাকুরি বিধি এবং অন্যান্য আইন-কানুন পালন সম্পর্কে আলোচনা করেন।	সহকর্মীদের সাথে চাকুরিবিধি এবং অন্যান্য আইন-কানুন পালন সম্পর্কে আলোচনা করেন	

পেশাগত অনুশীলন

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন	৭. শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখন লাভ করতে পারে এমনভাবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ধরে রাখা ও সক্রিয় করার কৌশলযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।	৭.১ নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে এমন পাঠ-পরিকল্পনা করেন যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রকাশ পায়:	- নির্ধারিত বিষয়ে নিয়মিত পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করেন - সময় অনুযায়ী ধাপগুলো বিন্যস্ত করতে সক্ষম	
		যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য শিখনফলকে প্রাধান্য প্রদান।	- পাঠ উপস্থাপনের শুরুতে এমন কৌশল নির্বাচন করেন যেন শিক্ষার্থীরা ইন্দিগের মাধ্যমে পাঠ অনুধাবনের পথে অগ্রসর হয় - কর্মকেন্দ্রিক কৌশল নির্ধারণ করেন - শিখনফলভিত্তিক সুস্পষ্ট মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করেন - ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন কৌশলের পরিকল্পনা আছে - শিখন ফল, পার্যাহা, শিখন-শেখানো কাজ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত।	
		- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার। (এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তন এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে) - কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল মূল্যায়ন।	- শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে শিখন ফল নির্ধারণ করেন - এককী, জোড়ায় এবং দলীয়ভাবে কাজ দিয়ে পাঠদান - পূর্বের মূল্যায়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রেখে শিখন ফল এবং কার্যক্রম নির্ধারণ।	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
		শিক্ষার্থীদের কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সকল ছাত্রের শিখন চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি।	- শিখন শেখানো কাজ পাঠ-কাঠামো এবং বিষয় যথাযথ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ (যেমন শিখন শেখানো কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রেণিভিত্তিক প্রদ্রোক্তর, ব্যবহারিক কাজ ছোট দলে অথবা জোড়ায় পড়া এবং লেখার কাজ ইত্যাদি। - শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রাধান্য দান এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে উৎসাহ দেয়।	
		শিখন ফল চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।	- প্রধান প্রধান শিখনফল সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন ও মূল্যায়ন করেন - পরিকল্পিত শিখন শেখানো কাজ একটি সমন্বিত শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। - পরিকল্পনায় সব ধরনের উপকরণের ব্যবহার সহ অন্যান্য দিকগুলো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আছে। - মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ (যেমন মৌখিক প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ ইত্যাদি)। - সকল ধর্মের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত করে।	
	৮. সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক উচ্চশা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকে চাহিদা এবং কৃষ্টিগত ইতিহাসকে সম্মান করেন ও মূল্য দিয়ে থাকেন।	৮.১ সকল শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে, এমন বিশ্বাস পোষণ করে। ৮.২ যেকোনো সামাজিক অথবা কৃষ্টিগত পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উপর গভীর আস্থা এবং উচ্চশা প্রকাশ করে থাকে।	- সকল শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করে যেকোন কঠিন সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেন। - শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতার দিকগুলো সঠিকভাবে শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়।	
(খ) প্রত্যাশা		৯.১ শিক্ষার্থীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে বয়সকে বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট এবং সযত্নে নির্দেশনা প্রদান করেন।	শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে থাকে।	
(গ) যোগাযোগ দক্ষতা	৯. শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।	৯.২ শ্রবণযোগ্য এবং সঠিকভাবে কণ্ঠস্বর	শ্রেণিকক্ষের পিছনে বসে শিক্ষকের কথা ভালভাবে শোনা যায়।	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
		ব্যবহার করে থাকেন।	শিক্ষক শিখন শেখানো কাজের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তাঁর নির্দেশনা অনুসারে বিভিন্ন কাজ করে থাকে।	
	১০. শিখনে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার দক্ষতা প্রদর্শন করেন	১০.১ পাঠ এবং শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রশ্ন করাকে গুরুত্ব দেন। ১০.২ সাধারণভাবে পুরো ক্লাসকে প্রশ্ন না করে একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেন। ১০.৩ কোনো বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন, প্রশ্ন আহ্বান করেন এবং উত্তর দিয়ে থাকেন। ১০.৪ শিক্ষার্থীদের ভুল উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন। ১০.৫ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।	- পাঠ-পরিকল্পনায় প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে এবং প্রশ্নের উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়। - প্রধানত একজন শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়। - শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কথা প্রাধান্য দেয় এবং প্রসংসা করে। - শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন এবং শিক্ষার্থীদের কাজ থেকে উত্তর নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভাবার সুযোগ দেন। - সকল শিক্ষার্থীদের কথা বলা/প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়। - শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তরেও শিক্ষক উত্তেজিত না হয়ে সঠিক উত্তর বলে দেয়। - কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। - শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধাযিত হয় না। - শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে এবং উত্তর প্রদান করা হয় যথেষ্ট সমীচ করে। - শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।	
	১১. সকল শিক্ষার্থীর	১১.১ শ্রেণিকক্ষসহ শ্রেণিকক্ষের আসাবাপত্র,	শ্রেণিকক্ষের আসাবাপত্র, বুক কর্নার ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে-	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
(ঘ) শ্রৌণিকক্ষেত্র পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা	অংশগ্রহণে সহায়ক, উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইতিবাচক, নিরাপদ এবং সমতার ভিত্তিতে শিখন পরিবেশ বজায় রাখেন।	লাইব্রেরি কর্ণার/বুক কর্ণার শিখন পরিবেশ উপযোগী করে সাজানো থাকে।	• যেন তা সকল ছাত্রের চাহিদা পূরণ করে বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকল চাহিদা বিবেচনা করা হয়। • সহজেই চলাফেরা করতে পারে • সকল ছাত্র স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে। • সকল ছাত্রের লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং সুবিধা থাকে। • সকল শিক্ষার্থী শিক্ষককে স্পর্শমুঠভাবে শুনতে এবং দেখতে পারে। • কোনো শিক্ষার্থী যখন একা একা কাজ করে তখন শিক্ষক যেন তাকে সাহায্য করতে পারেন। • সকল শিক্ষার্থীর কাজ বিশেষ করে তাদের আঁকা ছবি শ্রৌণিকক্ষেত্র সকল সময় অথবা বিভিন্ন সময় প্রদর্শিত হয়ে থাকে	
		১১.২ শিখন শেখানোর কাজে চাহিদার শ্রৌণিতে কখনো কখনো আসাবাবপত্র পুনর্সজ্জিত করেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে)।	• শিক্ষার্থীরা সহজেই দল গঠন করতে পারে। • শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, যে কোন লেখা শ্রৌণিকক্ষেত্র প্রদর্শন করা হয়। • জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার শ্রৌণির উপকরণ প্রয়োজন মত ব্যবস্থাকরেন • সঠিকভাবে এবং পরিষ্কারভাবে দর্শনযোগ্য উপকরণ (যেমন ছবি, যেকোনো লেখা, মানচিত্র, শব্দ, বর্ণচিত্র ইত্যাদি) প্রদর্শিত হয়ে থাকে।	
		১১.৩ শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা, শিখন এবং সৃষ্টিশীলতা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নানা কাজ যেমন আঁকা ছবি, লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি শ্রৌণিকক্ষেত্র প্রদর্শিত হয়।	• বুক কর্ণারে গিয়ে বই পড়তে পারে। • সকল শিক্ষার্থীর কাজ বিশেষ করে তাদের আঁকা ছবি শ্রৌণিকক্ষেত্র সকল সময় অথবা বিভিন্ন সময় প্রদর্শিত হয়ে থাকে।	
১২. শ্রৌণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদা, সামর্থ্য		১২.১ শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিবেচনা করে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করা হয়।	• বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সহজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিন কাজে নিয়োজিত করা হয়, যাতে তাদের সামর্থ্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। • শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের সামর্থ্যকে পরীক্ষা করে	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
	এবং সমতা অগ্রাধিকার পায়।		এমন শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যাপৃত করেন।	
			শিক্ষক শিক্ষার্থীকে একক কাজ, দলীয় কাজ, জোড়ায় কাজ দেয়া হয়।	
		১২.২ শিক্ষার্থীরা সমস্ত সময় শিখন শেখানো কাজে ব্যস্ত থাকেন।	প্রায় সমস্ত সময় ধরে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কাজে ব্যস্ত রাখেন।	
		১২.৩ সময়ের কার্যকর ব্যবহার করা হয় যাতে শৈথিকক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সময় পরিস্পূর্ণভাবে ব্যবহার হয়।	যখন যেমন প্রয়োজন হয় তেমনভাবে শিক্ষার্থীদের একাকী, দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণিগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ ভাগ করে দেন।	
		১২.৪ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে, প্রশ্ন ও উত্তরদানের ক্ষেত্রে এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমতা বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।	প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রচুর সুযোগ দেয়া হয় এবং কোনো কিছু পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হয়।	
		১২.৫ শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা, গান আবৃত্তি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখে।	কার্যকরভাবে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি এবং উপকরণ ব্যবহার করেন।	
	১২.৬ বাংলা, গণিত, বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ে বিভিন্ন গেমস খেলাতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন।		শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত এবং দলীয় উপকরণে যেমন খেলাধুলা, ওয়াকশিট, ওয়াকবুক, পাঠের জন্য বই ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন লাভ করেন।	
		১৩.১ পিটিআই শিক্ষার্থী নিজে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করেন এবং শ্রেণি শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।	শিক্ষার্থীদের তাদের ভালো কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকেন।	
		১৩.২ শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসী এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।	- শিক্ষার্থী মধ্যে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করেন। - শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ শ্রেণিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।	
	১৩. শিক্ষার্থীদের সাথে ইতিবাচক এবং সম্মানসূচক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশলের ব্যবহার প্রদর্শন করে	১৩.২ শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসী এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।	শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
	থাকেন।		- শিক্ষার্থীদের সাথে হেসে কথা বলেন। - শিক্ষার্থীদের সাথে সকল বিষয় খোলা মেলা আলোচনা করে। - শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকেন। - যোগ্য ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রশংসা করা হয় (যেমন, কোনো কাজে শুধু একটি দিকের জন্য অথবা কঠিন সময়্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে)।	
		১৩.৩ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান করেন।		
(চ) উপকরণ ব্যবহার	১৪. যথাযথ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার করেন।	১৪.১ নিম্নলিখিত উপকরণগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করেন : ✓ পার্ট-পুস্তক ✓ পোস্টার, মানচিত্র এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপকরণ ✓ সব ধরনের পত্রার বই ✓ খেলাধুলার উপকরণ ✓ অ্যাকাবাসহ গণনার জন্য অন্যান্য উপকরণ	- শিখন উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ এবং স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। - কোনো একটি নির্দিষ্ট শিখন শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে উপকরণ তৈরি করে থাকেন। - সকল উপকরণ শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। - শিক্ষা উপকরণ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হয়। - শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখন উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন।	
		১৪.২ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলার পুতুল, বিভিন্ন ধরনের ব্লক, সংখ্যা, বর্ণ চিহ্নিত ব্লক এবং অন্যান্য শ্রেণির উপযুক্ত সহ-পাঠ্যক্রমিক উপকরণ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	শিক্ষার্থীদের চিন্তা/কল্পনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।	
	১৫. শিক্ষক সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষা উপকরণ	১৫.১ সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির সাহায্যে নিম্নলিখিত সাধারণ উপকরণগুলো তৈরি বা সংগ্রহ করেন-		

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
	নিজেই তৈরি করেন।	✓ গণনার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যেমন তেতুলবীজ, মার্বেল, ছোলা ✓ শিক্ষার্থী, শিক্ষকের আঁকা ছবি অথবা পত্রিকা, ম্যাগাজিন অথবা বইয়ে আঁকা ছবি, ফটোকপি করা ✓ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত গল্পের/পড়ার বই	• কোনো একটি নির্দিষ্ট শিখন শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে উপকরণ তৈরি করে থাকেন। • শিক্ষার্থীদের চিত্র/কল্পনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।	
	১৬. শিখনকে সহায়তা দেয়ার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি (যেমন মোবাইল ফোন) যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়।	১৬.১ ই-রেজি ও বাংলা বিষয়ে ভাষা দক্ষতা অনুশীলনের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন কার্যকরভাবে ব্যবহার করে	• কার্যকরভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। • শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় (যেমন কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে অথবা তার কোনো ধারণা উপস্থাপন করতে পারে)। • শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং তা থেকে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়।	
		১৬.২ বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক কাজে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন।	• বিজ্ঞানে ব্যবহারিক কাজে অথবা কোনো প্রজেক্টের কাজে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদর্শন করেন।	
	১৭. যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পনা ও ব্যবহার করেন।	১৭.১ পাঠ পরিকল্পনায় এবং শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত শিখন ফল কার্যকরভাবে মূল্যায়নের জন্য যথাযথ কৌশল চিহ্নিত করে থাকেন।	• প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনার সাথে বিবৃত শিখন ফল অনুসারে মূল্যায়ন কৌশল উল্লিখিত থাকে।	
(হ) মূল্যায়ন	১৭.২ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজন		• পাঠ-পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এবং সাময়িক মূল্যায়ন	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
		অনুসারে বিভিন্ন ধরনের গাঠনিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করেন।	পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়।	
	১৮. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে মৌখিক এবং লিখিত ফিডব্যাক প্রদান করেন।	১৮.১ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকেন (এজন্য শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে অথবা তার কাজ মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন)	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের কাজ পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং গঠনমূলকভাবে তাদের ফিডব্যাক প্রদান করেন।	
		১৮.২ শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি নির্ণয়ের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা করেন এবং সুযোগমতো তা ব্যবহার করেন।	শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শিক্ষক একাকী, দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণিকে প্রশ্ন করে।	
		১৮.৩ শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে বিভিন্ন লিখিত কাজ দিয়ে অথবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকেন।	শিক্ষার্থীর কাজে অথবা কথা বলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করে।	
		১৮.৪ শিখন কাজে শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা সহজভাবে নিয়ে পরিপূর্ণ শিখনের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নকে ব্যবহার করে থাকেন।	- শিখনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও আশান্য দিয়ে শিক্ষক মূল্যায়নের হেডিং প্রদান করেন। - শিক্ষার্থীর লিখিত কাজে শিক্ষকের মন্তব্য তাকে আরো চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।	
	১৯. মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আহরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীর শিখন	১৯.১ সঠিক সময়ে গাঠনিক মূল্যায়ন পরিকল্পিত এবং অনুষ্টিত হয়।	সামষ্টিক পরীক্ষা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, বরং তা বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন স্বাধীনভাবে লিখতে দেয়া, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিভিত্তিক আলোচনা, মৌখিক প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সমন্বয়ে গৃহীত হয়।	
		১৯.২ মূল্যায়নের কাজগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর 'পুনরাব	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিষ্কার এবং স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।	

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
	উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেন।	মনে করার বিষয়টি পরীক্ষিত হয় না বরং তার সৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশক্তিকে ও পরীক্ষা করা হয়।		
		১৯.৩ সমগ্র শ্রেণিভিত্তিক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন রেকর্ডসহ শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি এবং চাহিদার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।	পাঠ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে বিবেচনায় নেয়া হয়।	

পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষকমান	যোগ্যতা	সূচক	প্রমাণ
	২০. প্রত্যেক শিখন মধ্য নিহিত সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকারসহ একীভূত শিক্ষা, অটীজম, ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকার শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।	২০.১ প্রত্যেক শিখন জ্ঞান, দক্ষতা, অগ্রহ এবং সক্রিয়তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ২০.২ লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, ভাষা, বর্ণ, নৈহিক অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিখন চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণ করেন।	- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে মেলোমেশা করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন। - প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জেনেন এবং সে জ্ঞান শিখনের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। - সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ থাকে। - সামাজিক, কৃষ্টিগত, নৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং আর্থিক অবস্থান	

(ক) সমতার প্রতি
অঙ্গীকার

			নির্বিশেষে সকল শিশু সামাজিকভাবে এবং তাদের শিখন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। - শিক্ষার্থীদের যেকোনো ধরনের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং তাদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা ও শিখন শেখানো কাজে নির্ধারিত কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন। - প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের পোশা উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। - অ্যাকশন রিসার্চ বা লেসন স্টাডি করে থাকেন - সহকর্মী শিক্ষকের যেকোনো ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন। - শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। - শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। - প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। - শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা-	
	২১. সমগ্র শিক্ষকতার জীবনে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি এবং সক্রিয়ভাবে চিন্তন অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করেন।	২১.১ শিক্ষাদান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং তা সময় সময় আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ২১.২ শিক্ষকতা পোশা উন্নয়নের জন্য অ্যাকশন রিসার্চ বা লেসন স্টাডি ব্যবহার করে থাকেন। ২১.৩ শিক্ষাদানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সহকর্মী এবং পেশাজীবীদের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে থাকেন।	- অ্যাকশন রিসার্চ বা লেসন স্টাডি করে থাকেন - সহকর্মী শিক্ষকের যেকোনো ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন।	
(খ) চিন্তন অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন		২২. মা-বাবা, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের সাথে কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ।	- শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। - শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। - প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। - শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা-	
(গ) স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ		২২.১ বিদ্যালয় এবং স্থানীয় জনগণ সকলের সাথে ইতিবাচক এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয় হয়ে থাকেন এবং সকলকে সমানভাবে বিচার করেন।	- শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। - শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। - প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। - শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা-	

			বাবার সাথে তাদের সন্তান সম্পর্কে যোগাযোগ করে থাকেন। - শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীর গৃহ পরিদর্শন করেন। - পাঠ পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণ অথবা পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।	
(ঘ) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা	২৩. দলীয় সদস্য হিসেবে সহকর্মীদের সাথে কাজ করে থাকেন।	২৩.১ বিদ্যালয়ের সকল সহকর্মীর কাজে প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।	সহকর্মীদের সাথে চমৎকার সম্পর্ক উপভোগ করে থাকেন।	
		২৩.২ সহকর্মী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।	যেকোনো ধরনের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন এবং এরূপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করেন।	
		২৩.৩ শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করে ইতিবাচক ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।	আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের শিক্ষাদান, দক্ষতায় উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকেন।	

সংযুক্তি-২: শিশু বিকাশের মাইল ফলক

১. মাইল ফলক: বুদ্ধি ও বিকাশ

ক্ষেত্র	০-১২ মাস	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-৬ বছর
বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ যুক্তি ও চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ	চোখের সামনে থেকে কোন জিনিস বা বস্তু সরিয়ে নিলে খোজার চেষ্টা করে। (৫-৬ মাসে)	অনেক সময় ধরে কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না।	কি, তে, কখন, কোথায়, কীভাবে ইত্যাদি নিয়ে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে।	একটু জটিল পাজেল মেলানার দক্ষতা বাড়ে।
		কোনবস্তুর একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করতে পারে, যেমন: আপেলের রং লালবা আপেল গোল।	- সহজ পাজেল মেলানার দক্ষতা বাড়ে। ৩টি সংখ্যা পর্যন্ত পনরাবৃত্তি করতে পারে।	৪টি সংখ্যা পর্যন্ত পনরাবৃত্তি করতে পারে। - দৃশ্যমান ৬টি বস্তুর নাম এক সাথে স্মরণ রাখতে পারে।
			- দৃশ্যমান ৪ টি বস্তুর নাম এক সাথে স্মরণ রাখতে পারে। - বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করতে পারে।	- একটু জটিল ধারণা গঠন করতে পারে। - কিছু অক্ষর চিনতে পারে।
			১০ পর্যন্ত সংখ্যা গননা করতে পারে। - শরীরের দশটি অঙ্গ চিনতে পারে।	- কিছু সংখ্যা চিনতে পারে। - নিজের শরীর এবং অন্যের শরীরের কিছু অঙ্গ দেখাতে পারে।
			- দিন, রাত, সকাল, দুপুর বুঝতে পারে। - তবে মাস ও বছর বুঝতে পারে না।	
	কারাপরিচিত ও কারা অপরিচিত তা বুঝার চেষ্টা করে	- সহজ পাজেল মেলাতে পারে। - রঙ চিনতে শুরু করে। - পরিচিত বস্তু চিনতে পারে।	- কম-বেশী বুঝতে পারে। তবে গ্রাম, লিটার, মিটার বুঝতে পারে না। - কোন বস্তুর বহুমুখী বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে। যেমন: আপেলের রং লাল এবং আপেল গোল।	- সময় বুঝতে পারে। - পরিমাপ বুঝতে পারে - ছোট ছোট ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২.মাইল ফলক: শারীরিক বিকাশ

ক্ষেত্র	০-১২ মাস	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-৬ বছর
শারীরিক বিকাশ (বড় পেশি)	একদিক থেকে অন্যদিকে উল্টে যায়	১ বছর বয়সে শিশুর হাটতে শুরু করে। ২বছরে হাটা সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়	সিড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে পারে। বল ছুড়তে এবং লাগি দিতে পারে।	বল ছুড়তে,ধরতে এবং লাগি দিতে পারে। এক পায়ে লাফ দিতে পারে। সামনে ও পিছনে লাফ দিতে পারে
সাধারণশারীরিক দক্ষতা,যেমন:বসা, হাটা, দৌড়, দৌড়ানো ইত্যাদি।	হামাগুড়ি দেয়,নিজে নিজে বসতে পারে (প্রথমে কিছুর সহায়তায় পরে নিজে নিজে) কিছু ধরে দাড়ায়, জেগে শব্দ হলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।	কোন কিছু ছোড়া, কিছুতে লাগি দেয়া ততটা নিয়ন্ত্রিত নয়,কিছু এবরস থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে।	একপায়ে লাফদেয়ার চেষ্টা করে। নিজে নিজে পোষাক পরতে পারে।	
শারীরিক বিকাশ (সূক্ষ্ম পেশী)	খেলনা ধরতে পারে বসে বসে খেলনা দিয়ে খেলে	হিজি বিজি করে গোল ডিম্বাকার ক্ষেত্র আকতে শুরু করে।	নিজে নিজে খাবার খেতে পারে। হাত ধুতে পারে।	সঠিকভাবে পোশাক ধরতে পারে।পূর্ণ মানুষের আকৃতি আকতে পারে।
	ঝুলঝুলি বাজিয়ে শব্দ করতে পারে।	নিজে নিজে খাবার মুখে তুলতে পারে। হাত নেড়ে বিনায় জানায়।	ছোট কোন বস্তু একটা একটা করে তুলতে পারে।	বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি আকতে পারে যেমন: বৃত্ত, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র ও ত্রিভুজ।
সূক্ষ্ম শারীরিক দক্ষতা (যেমন: লেখা, আঁকা, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো ইত্যাদি)	জিনিস ধরতে পারে।	পুতুল ও বল নিয়ে খেলা করে কখন কখনওবা পুতুলকে পোষাক পরাতে পারে।	মোটামুটিভাবে চেনা যায় এমন মানুষের আকৃতি আকতে পারে	কোন কিছু আকার ক্ষেত্রে কোন বস্তু কতটা জায়গা নেবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারে
		দেখাতে বললে শরীরের হাত পা, চোখ, মাথা দেখাতে পারে।	দেখে দেখে গোল, তিনকোনা,চারকোনা,আকতে পারে।	জুতার ফিতা বাধতে পারে।

৩.মাইল ফলক: ভাষার বিকাশ

স্কেদ্র	০-১২ মাস	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৪-৫বছর
ভাষাবৃত্তীয়	বা	শব্দ বলতে শেখে, ছোট ছোট বাক্য	নাম,বয়স,ঠিকানা বলতে পারে। বিভিন্ন	নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে। জটিল বাক্য
যোগাযোগের ক্ষমতা	মা মা বাবা-বাব(৫/৬মাস) ও বিভিন্ন শব্দ করে,	বলতে পারে (ভাত খাব, বল দাও, দুধ খাব)	বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারে।	ব্যবহার করতে পারে।
ভাষার বোধগম্যতা ও প্রকাশের দক্ষতা	ও এক শব্দ-মা,বাবা বলে।	সহজ ছড়া মেলাতে পারে সহজ গান গাইতে পারে।	স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারে	নিজের পরিবার সম্পর্কে বলতে পারে।
			দুই বাক্যের মাধ্যমেযৌজক ব্যবহার করতে পারে।	গল্প শুনে কিছুটা বানিয়ে বলতে পারে।
			জটিল ছড়া মেলাতে পারে ছন্দ ও সুরের সমন্বয় করতে পারে ছড়া গান গাইতে পারে।	ছড়া গান গাইতে পারে। একসাথেঅনেকে মিলে গান গাইতে পারে।

৪.মাইল ফলক :সামাজিক বিকাশ

স্কেদ্র	০-১২ মাস	১-২বছর	৩-৪বছর	৪-৫বছর
সামাজিক বিকাশ	ঘরের বাইরে যেতে পছন্দ করে।	অনেকের সাথে মিলে খেলার চেষ্টা অন্যের মত করে একা একা খেলতে বা কাজ করতেপছন্দ করে।	বড়দের সহায়তায় দলে কাজ করতে পারে।	অন্যদেরবিশেষ করে সমবয়সীদের সাহযোগিতা করে। সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতা মূলকখেলা খেলতে পারে এবং খেলে।
অন্যের সাথে জড়িত হওয়া	করা পরিচিত, করা অপরিচিত তা বুঝতে পারে।	সমবয়সীদের থেকে নিজের প্রতি মনোযোগ বেশী থাকে।	সমবয়সীদের সাথে সহযোগিতা মূলক খেলা করে।	নিজস্ব উদ্দেশ্যে কাজ করতে দেখা যায়
			স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রবনতাইতৈরী হয়।	পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বস্তু গড়ে ওঠে।

৫.মাইল ফলক: আবেগীয় বিকাশ

স্কেদ	০-১২ মাস	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৪-৫ বছর
আবেগীয় বিকাশ	ধমক দিলে কান্না করে।	সহজ অনুষ্ঠিতের মৌলিক বিষয়গুলি প্রকাশ করতে পারে(হাসি, কান্না, রাগ ও ভয়) কিন্তু বুঝতে পারে না।	সহজ অনুষ্ঠিতগুলো বুঝতে ও চিনতে পারে।	আবেগকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।
অনুষ্ঠিত বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারা।	হাতে তুড়ি দিলে বা মিষ্টি আওয়াজ করলে হাসে।		নিজের আবেগ না না ভাবে প্রকাশ করে।	নিজের আবেগকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৬.মাইল ফলক: আন্তর্বির্ভরশীলতার বিকাশ

স্কেদ	০-১২ মাস	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৪-৫ বছর
আন্তর্বির্ভরশীলতা	মায়ের বুকের দুধ চুষে খায় যা পায় সব মুখে দেয়।	অপরিপক্ক ভাবে নিজেকে গ্লাস ধরে পানি খেতে পারে	নিজের সাধারণ জামা কাপড় খোলে।	গোসল করে, জামাকাপড় পরে।
	শক্ত খাবার চিবাতে শিখে।		সঠিক পদ্ধতিতে বাধরুশ/ পায়খানা, প্রশ্রাব করে।	ছেঁটেখাটো কাজে সাহায্য করে।
	হাত দিয়ে খাবার মুখে দিতে শিখে।			নির্দেশ দিলে নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখে।

৭. মাইল ফলক : খেলাধুলার বিকাশ

ক্ষেত্র	০-১২ মাস	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৪-৫ বছর
খেলাধুলা	মায়ের দুধ এবং হুল নিয়ে খেলে	অনুকরণ করে হাত তালি দেয়। অন্যকে অনুকরণ করে কাজ করতে উদ্যোগী হয়।	অন্যদের শিঙদের সাথে খেলা করতে শুরু করে।	অন্য শিঙর সাথে খেলনা নিয়ে স্বাধীন ভাবে খেলে
	নিজের শরীর নিয়ে খেলে	একা একা খেলে	নিজের ও অন্যের পালা বুঝতে পারে।	খেলার নিয়ম কানুন মেনে খেলাতে শেখে
	রঙিন , আলো ও শব্দপূর্ণ খেলনায় মনোযোগী হয়।			
	খেলা দেখে, ধরতে চায় প্রথম সামাজিক খেলা উপভোগ করে(টুকি)			

সংযুক্তি-৩: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের স্তরসহ মানদণ্ডসমূহের নমুনা

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কোঙ্কিত/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
১. ভৌত অবকাঠামো (Physical Environment)			
স্কুলের অবস্থান	স্কুলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার সাথে যুক্ত অথবা ক্যাচমেন্ট এলাকার মধ্যে	- স্কুলটি শিশুদের ১.৫ কি:মি এর মধ্যে - স্কুলটি শিশুদের জন্য বিপদজনক কিছু স্থান থেকে কম পক্ষে ১৫০ ফুট দূরে অবস্থিত হতে হবে। (স্থানগুলো হলো; পুকুর, বিপদজনক ঢাল, নদী, মহাসড়ক, চামড়াজাত শিল্পকারখানা, রাসায়নিক কারখানা, শব্দযুক্ত এলাকা, বাস স্ট্যান্ড, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ইত্যাদি)।	- স্কুলটি সার্বোচ্চ ১ কি:মি এর মধ্যে অবস্থিত - স্কুলটি শিশুদের জন্য বিপদজনক কিছু স্থান থেকে কম পক্ষে ২০০ ফুট দূরে অবস্থিত হতে হবে। (স্থানগুলো হলো; পুকুর, বিপদজনক ঢাল, নদী, মহাসড়ক, চামড়াজাত শিল্পকারখানা, রাসায়নিক কারখানা, শব্দযুক্ত এলাকা, বাস স্ট্যান্ড, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ইত্যাদি)।
স্কুলের প্রাপ্তন	- স্কুল প্রাপ্তনটি হতে হবে পরিস্কার, সমতল এবং জলাবদ্ধ নয় এমন। - স্কুলটিতে বাহিরের খেলা করার মত যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে। (শিক্ষার্থী প্রতি কমপক্ষে ১৫ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে)। - প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহজ প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। (যেমন: প্রবেশ পথটি হতে হবে সমতল, র‍্যাম্প থাকতে হবে এবং গ্রেশস্থ দরজা থাকতে হবে)।	- প্রাপ্তনটি বেড়া অথবা দেয়াল দিয়ে সংরক্ষিত থাকতে হবে। - স্কুল প্রাপ্তনটি হতে হবে পরিস্কার, সমতল এবং সেখানে জলাবদ্ধতা থাকবে না। - স্কুলটিতে বাহিরের খেলা করার মত যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে। (শিক্ষার্থী প্রতি কমপক্ষে ২০ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে)। - শিশুদের বাহিরে খেলার জন্য নানা রকম খেলার সামগ্রী যেমন; ফুটবল, দড়িলাফ খেলার দড়ি, সামগ্রী	- প্রাপ্তনটি বেড়া অথবা দেয়াল দিয়ে সংরক্ষিত থাকতে হবে। - স্কুল প্রাপ্তনটি হতে হবে পরিস্কার, সমতল এবং সেখানে জলাবদ্ধতা থাকবে না। - স্কুলটিতে বাহিরের খেলা করার মত যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে। (শিক্ষার্থী প্রতি কমপক্ষে ৩৫ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে)। - স্কুলটিতে বাহিরের খেলার সামগ্রী যেমন; দোলনা, ক্লাইমিং ফ্রেইম, লাইড ও যুগ্মদোলক থাকতে হবে।

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিক্রম/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
		- ক্রিকেট ব্যাট-বল ইত্যাদি থাকতে হবে। - স্কুল প্রাঙ্গণে বাগান থাকবে। - প্রতিবর্ষী শিক্ষার্থীদের সহজ প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। (যেমন: প্রবেশ পথটি হতে হবে সমতল, রাস্প দরজা থাকতে হবে)।	- স্কুলটিতে ছায়াদানকারী গাছপালা ও বাগান থাকবে। - প্রতিবর্ষী শিক্ষার্থীদের সহজ প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। (যেমন: প্রবেশ পথটি হতে হবে সমতল, রাস্প থাকতে হবে এবং প্রশস্ত দরজা থাকতে হবে)।
		- শ্রেণিকক্ষটিতে শিশু প্রতি কমপক্ষে ১০ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। - শ্রেণিকক্ষের মেঝে হতে হবে সমতল, শুকনা, পরিষ্কার এবং মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকবে। - শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট পরিমানে আলো এবং তাপস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিশুদেরকে ঝড় ও বৃষ্টিতে যেন সুরক্ষা করতে পারে শ্রেণি কক্ষটি এমন হতে হবে। - শ্রেণিকক্ষে বাতাস প্রবাহের জন্য জানালা থাকতে হবে। - শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে শিশুদের কাজগুলো প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে।	- শ্রেণিকক্ষটিতে শিশু প্রতি কমপক্ষে ১৭ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। - শ্রেণিকক্ষের মেঝে হতে হবে সমতল, শুকনা, পরিষ্কার এবং মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকবে। - শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট পরিমানে আলো এবং তাপস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিশুদেরকে ঝড় ও বৃষ্টিতে যেন সুরক্ষা করতে পারে শ্রেণি কক্ষটি এমন হতে হবে। - দরজা এবং জানালগুলো যেন শ্রেণি কক্ষের মোট দেয়ালের ১/৭ ভাগ স্থান জুড়ে থাকে। - শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে শিশুদের কাজগুলো প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে।
শ্রেণী কক্ষের পরিবেশ	৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে ২৫০ বর্গফুটের শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সেবা প্রদান কর্মকৌশল অনুসারে)। - শ্রেণিকক্ষের মেঝে হতে হবে সমতল, শুকনা, পরিষ্কার এবং মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকবে। - শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট পরিমানে আলো এবং তাপস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিশুদেরকে ঝড় ও বৃষ্টিতে যেন সুরক্ষা করতে পারে শ্রেণিকক্ষটি এমন হতে হবে। - শিশুদের সৃজনশীল কাজগুলো প্রদর্শনের জন্য দেয়ালে যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে।		

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান		মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
		স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিক্রম/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী		● মেঝের জন্য মাদুর থাকতে হবে। ● শিশুদের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো ঢক বোর্ড থাকতে হবে। ● শিক্ষকের জন্য মোড়, চেয়ার বা টুল থাকবে। ● মালামাল রাখার জন্য একটা ট্রাস্ক থাকবে। ● বাডু ও ময়লা ফেলার ঝুড়ি থাকবে।	● মেঝের জন্য মাদুর থাকতে হবে। ● শিশুদের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো ঢক বোর্ড থাকতে হবে। ● শিক্ষকের জন্য মোড়, চেয়ার বা টুল থাকবে। ● শিশুদের কাজ প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শন বোর্ড থাকবে। ● মালামাল রাখার জন্য একটা ট্রাস্ক থাকবে। ● বাডু ও ময়লা ফেলার ঝুড়ি থাকবে। ● প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।	● মেঝের জন্য রঙিন মাদুর থাকতে হবে। ● শিশুদের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো ঢক বোর্ড থাকতে হবে। ● শিক্ষকের জন্য মোড়, চেয়ার বা টুল থাকবে। ● শিশুদের কাজের জন্য প্রদর্শন বোর্ড থাকবে। ● র‍্যাক এবং কাবার্ড থাকবে মালামাল রাখার জন্য যা শিশুদের নাগালের মধ্যে তাদের চোখ সমান/ সোজা / বরাবর থাকতে হবে। ● মালামাল রাখার জন্য একটা ট্রাস্ক থাকবে। ● বাডু ও ময়লা ফেলার ঝুড়ি থাকবে। ● প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা		● শ্রেণিকক্ষে পানি খাওয়ার জন্য জগ, গ্লাস সহ যথেষ্ট পরিমাণে পানির জল থাকতে হবে। ● স্বাস্থ্য- সম্মত পায়খানার সুবিধাসহ পায়খানায় প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা করতে হবে অথবা একটি বড় জলাধারে পানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● পানি ও সাবানসহ একটি সাধারণ স্থানে হাত	● শ্রেণিকক্ষে পানি খাওয়ার জন্য জগ, গ্লাস সহ যথেষ্ট পরিমাণে পানির জল থাকতে হবে। ● স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানার সুবিধাসহ পায়খানায় প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা করতে হবে অথবা একটি বড় জলাধারে পানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● পানি ও সাবানসহ একটি সাধারণ স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।	● স্কুলে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● শ্রেণিকক্ষে পানি খাওয়ার জন্য জগ, গ্লাস সহ যথেষ্ট পরিমাণে পানির জল থাকতে হবে। ● প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী স্বাস্থ্য- সম্মত পায়খানার সুবিধাসহ প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● পায়খানায় হাত ধোয়ার জন্য সাবান থাকবে।

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিকত/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
	ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● পায়খানা পরিস্কার করার জন্য ব্রাশ বা ঝাড়ু থাকতে হবে।	● পায়খানা পরিস্কার করার জন্য ব্রাশ বা ঝাড়ু থাকতে হবে।	● পানি ও সাবানসহ একটি সাধারণ স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● পায়খানা পরিস্কার করার জন্য ডিটারজেন্ট, ব্রাশ বা ঝাড়ু থাকতে হবে।
নিরাপত্তা	● শ্রেণিকক্ষটি থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিপদমুক্ত (যেমন; ভাঙ্গা খেলনা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সুবিধা, খোলা ইলেক্ট্রিকের তার বা অন্যান্য সামগ্রী)। ● ফর্সিট এইড কিট বক্স শ্রেণি কক্ষে নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। ● তুলনামূলকভাবে নিরাপদ শ্রেণি কক্ষটি প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। ● শিশুদের ফুলে আসা যাওয়ার পথটি নিরাপদ হতে হবে। (যেমন; স্পীড ব্রেকার, রাস্তা পারাপারে বড়দের সাহায্য ইত্যাদি)	● শ্রেণিকক্ষটি থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিপদমুক্ত (যেমন; ভাঙ্গা খেলনা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সুবিধা, খোলা ইলেক্ট্রিকের তার বা অন্যান্য সামগ্রী)। ● ফর্সিট এইড কিট বক্স শ্রেণি কক্ষে নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। ● জরুরী প্রয়োজনে শিশুদের সরানোর ব্যবস্থাটি দৃশ্যমান থাকতে হবে। ● শিশুদের ফুলে আসা যাওয়ার পথটি নিরাপদ হতে হবে। (যেমন; স্পীড ব্রেকার, রাস্তা পারাপারে বড়দের সাহায্য ইত্যাদি)।	● শ্রেণিকক্ষটি থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিপদমুক্ত (যেমন; ভাঙ্গা খেলনা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সুবিধা, খোলা ইলেক্ট্রিকের তার বা অন্যান্য সামগ্রী) ● ফর্সিট এইড কিট বক্স শ্রেণি কক্ষে নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। ● জরুরী প্রয়োজনে শিশুদের সরানোর ব্যবস্থাটি দৃশ্যমান থাকতে হবে। ● শিশুদের ফুলে আসা যাওয়ার পথটি নিরাপদ হতে হবে। (যেমন; স্পীড ব্রেকার, রাস্তা পারাপারে বড়দের সাহায্য ইত্যাদি)।
২.১. শিশু - শেখানো পরিবেশ (Learning Environment)			
শ্রেণিকক্ষ সংগঠন	● শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য	● শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য	● শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোডাক্ট		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিকত/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
	অনুসারে রঙিন ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে শ্রেণি কক্ষটি সাজাতে হবে যাতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়। - শিশুদের সৃজনশীলকাজ শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শিত হতে হবে। - শিশুদের চোখ সোজা সকল কিছু দেয়ালে প্রদর্শন করতে হবে। - কম পক্ষে চারটি কর্ণারের আয়োজন করে মার্কিং করতে হবে। সেগুলো হলো; খেলার কর্ণার, বই কর্ণার, ব্লক কর্ণার, কল্পনার কর্ণার ও পানি বালির কর্ণার ইত্যাদি। - বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে জেভার সংবেদনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং একিভূত (মিশ্র) এবং প্রয়োজন অনুসারে বসার ব্যবস্থা।	অনুসারে রঙিন ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে শ্রেণি কক্ষটি সাজাতে হবে যাতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়। - শিশুদের সৃজনশীলকাজ শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শিত হতে হবে। - শিশুদের চোখ সোজাসুজি / বরাবর সকল কিছু দেয়ালে প্রদর্শন করতে হবে - কম পক্ষে চারটি কর্ণারের আয়োজন করে মার্কিং করতে হবে। সেগুলো হলো; খেলার কর্ণার, বই কর্ণার, ব্লক কর্ণার, কল্পনার কর্ণার ও পানি বালির কর্ণার ইত্যাদি। - বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে জেভার সংবেদনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং একিভূত (মিশ্র) এবং প্রয়োজন অনুসারে বসার ব্যবস্থা)	রঙিন ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে শ্রেণি কক্ষটি সাজাতে হবে যাতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়। - শিশুদের সৃজনশীলকাজ শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শিত হতে হবে। - শিশুদের চোখ সোজাসুজি/ বরাবর সকল কিছু দেয়ালে প্রদর্শন করতে হবে - কম পক্ষে চারটি কর্ণারের আয়োজন করে মার্কিং করতে হবে। সেগুলো হলো; খেলার কর্ণার, বই কর্ণার, ব্লক কর্ণার, কল্পনার কর্ণার ও পানি বালির কর্ণার ইত্যাদি) - বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে জেভার সংবেদনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং একিভূত (মিশ্র) এবং প্রয়োজন অনুসারে বসার ব্যবস্থা)।
শিখণ-শেখানো উপকরণ	জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে সব মূল উপকরণ শ্রেণি কক্ষে থাকতে হবে।	জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে সকল মূল ও সহায়ক উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকতে হবে।	জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে সকল মূল ও সহায়ক উপকরণ শ্রেণি কক্ষে থাকতে হবে।

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোডাক্ট/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিত/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
	- উপকরণ হতে হবে শিশুতোষ, নন টক্সিক, এবং নিরাপদ (কোন ধারালো কোণা থাকবে না) - উপকরণ হবে রঙিন, যাতে শক্ত, নরম ও হালকা তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। - স্থানীয়ভাবে তৈরি ও ক্রয়করা উপকরণের মিশ্রণ থাকতে হবে। - সকল উপকরণ শিশুদের নাগালের মধ্যে হতে হবে। - উপকরণগুলো যথাপোযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং উপকরণগুলো তালা দিয়ে রাখা যাবে না। - উপকরণগুলো সঠিকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে।	- উপকরণ হতে হবে শিশুতোষ, নন টক্সিক, এবং নিরাপদ (কোন ধারালো কোণা থাকবে না)। - উপকরণ হবে রঙিন, যাতে শক্ত, নরম ও হালকা তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। - স্থানীয়ভাবে তৈরি ও ক্রয়করা উপকরণের মিশ্রণ থাকতে হবে। - সকল উপকরণ শিশুদের নাগালের মধ্যে হতে হবে। - উপকরণগুলো যথাপোযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং উপকরণগুলো তালা দিয়ে রাখা যাবে না। - উপকরণগুলো সঠিকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। - শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খেলার সামগ্রী থাকতে হবে।	- উপকরণ হতে হবে শিশুতোষ, নন টক্সিক, এবং নিরাপদ (কোন ধারালো কোণা থাকবে না।) উপকরণ হবে রঙিন, যাতে শক্ত, নরম ও হালকা তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। - স্থানীয়ভাবে তৈরি ও ক্রয়করা উপকরণের মিশ্রণ থাকতে হবে - সকল উপকরণ শিশুদের নাগালের মধ্যে হতে হবে। - উপকরণগুলো যথাপোযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং উপকরণগুলো তালা দিয়ে রাখা যাবে না। - উপকরণগুলো সঠিকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। - শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খেলার সামগ্রী থাকতে হবে।
শিক্ষক - শিক্ষার্থী অনুপাত	১:৩০ (সার্ভিস) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্টামো ও শিখনক্রম অনুসারে)	১:৩০ (সার্ভিস)	১:২৫ (সার্ভিস)

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং		মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
উপাদান	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিক্রত/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)	
স্কুলে সময়সীমা ও দৈনন্দিন রুটিন	- শিখনক্রম অনুসারে দৈনিক সর্বোচ্চ ২.৩০ মি: ক্লাশ রুটিন হবে। - দৈনন্দিন রুটিনে ধারাবাহিকতা থাকবে। এরপরও শিক্ষার্থীদের আশ্রয় ও সতন্ত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে ক্লাশ রুটিনে পরিবর্তন আনতে হবে। - এক কাজ থেকে অন্য কাজে (এ্যাক্টিভিটি) যাওয়াটা সহজতর ও বিষহীন হতে হবে - রুটিন যেন সকলের বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়। - শ্রেনিকক্ষে সব সময় দৈনন্দিন ক্লাশ রুটিনটি প্রদর্শিত অবস্থায় থাকতে হবে।	- শিখনক্রম অনুসারে দৈনিক সর্বোচ্চ ২.৩০ মি: ক্লাশ রুটিন হবে। - দৈনন্দিন রুটিনে ধারাবাহিকতা থাকবে। এরপরও শিক্ষার্থীদের আশ্রয় ও সতন্ত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে ক্লাশ রুটিনে পরিবর্তন আনতে হবে - এক কাজ থেকে অন্য কাজে (এ্যাক্টিভিটি) যাওয়াটা সহজতর ও বিষহীন হতে হবে - রুটিন যেন সকলের বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয় - শ্রেনিকক্ষে সব সময় দৈনন্দিন ক্লাশ রুটিনটি প্রদর্শিত অবস্থায় থাকতে হবে।	- শিখনক্রম অনুসারে দৈনিক সর্বোচ্চ ২.৩০ মি: ক্লাশ রুটিন হবে - দৈনন্দিন রুটিনে ধারাবাহিকতা থাকবে। এরপরও শিক্ষার্থীদের আশ্রয় ও সতন্ত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে ক্লাশ রুটিনে পরিবর্তন আনতে হবে। - এক কাজ থেকে অন্য কাজে (এ্যাক্টিভিটি) যাওয়াটা সহজতর ও বিষহীন হতে হবে - রুটিন যেন সকলের বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়। - শ্রেনিকক্ষে সব সময় দৈনন্দিন ক্লাশ রুটিনটি শিখনোত্তেজকভাবে (ছবি, পোস্টার এবং আকৃতি) প্রদর্শিত অবস্থায় থাকতে হবে।	
২.২. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া/পেডাগজির মানদণ্ড				
শিশুর সাথে যোগাযোগ	শিক্ষক শিশুর সাথে যোগাযোগের সময় তাদের সাথে সাথে চোখে চোখ রাখবেন, নরম সুরে কথা বলবেন, শালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করবেন এবং শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন সম্মান প্রদর্শন করে।	শিক্ষক শিশুর সাথে যোগাযোগের সময় তাদের সাথে সাথে চোখে চোখ রাখবেন, নরম সুরে কথা বলবেন, শালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করবেন এবং শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন। একইসাথে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।	শিক্ষক শিশুর সাথে যোগাযোগের সময় তাদের সাথে সাথে চোখে চোখ রাখবেন, নরম সুরে কথা বলবেন, শালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করবেন এবং শিশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সহজ ভাষায় তার সাথে কথা বলবেন	

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিক্রম/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
অভিভাবন ও উৎসাহদান	- অভিভাবন একটি দৈনন্দিন চর্চার বিষয় হিসেবে দেখা হয় - শিক্ষক শিশুদেরকে কোন উপলক্ষে প্রশংসা করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন।	- অভিভাবন একটি দৈনন্দিন চর্চার বিষয় হিসেবে নেয়া হয় - শিক্ষক শিশুদেরকে প্রায়শঃই কারণ উল্লেখ করে প্রশংসা করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন।	- প্রচলিত নীতি মেনে অভিভাবন একটি দৈনন্দিন চর্চার বিষয় হিসেবে নেয়া হয় - শিশু যখন কেনা কিছু করতে পারে বা শিশুর সাথে মিথাক্রিয়াকালীন বা শিশু যখন কোন কাজে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক তখনই প্রশংসা করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন।
শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক	শিশুরা ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকের সাথে তাদের অনুভূতি, সামান্য, প্রতিবন্ধকতা ও শিখন চাহিদার কথা শেয়ার করে থাকে	শিশুরা প্রায়শঃই শিক্ষকের সাথে তাদের অনুভূতি, সামান্য, প্রতিবন্ধকতা ও শিখন চাহিদার কথা শেয়ার করে থাকে।	শিশুরা সকল ক্ষেত্রে বা যখন তখন শিক্ষকের সাথে তাদের অনুভূতি, সামান্য, প্রতিবন্ধকতা ও শিখন চাহিদার কথা শেয়ার করে থাকে।
কাজের ধরন (টাইপ অব এ্যাক্টিভিটি)	একক, দলীয়, জুটির কাজ গুলো শিখনক্রম/বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বা বার্ষিক কাজ অনুসারে সময়স্বয় করা হয়।	একক, দলীয়, জুটির কাজ গুলো শিখনক্রম/বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বা বার্ষিক কাজ অনুসারে সময়স্বয় করা হয়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকের যথেষ্ট ভূমিকা ও অংশগ্রহণ থাকে।	একক, দলীয়, জুটির কাজ গুলো শিখনক্রম/বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বা বার্ষিক কাজ অনুসারে সময়স্বয় করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজের মতামত ও অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
খেলার ধরন (টাইপ অব গেম)	বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখনক্রম অনুসারে শিশুর শারীরিক, স্থূল ও সূক্ষ্মপেশির সঞ্চালনসহ জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন খেলা নির্ধারণ করতে হবে। খেলা নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনশীল, কল্পনার খেলা ও ইচ্ছামত খেলার	বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখনক্রম অনুসারে শিশুর শারীরিক, স্থূল ও সূক্ষ্মপেশির সঞ্চালনসহ জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন খেলা নির্ধারণ করতে হবে। খেলা নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনশীল, কল্পনার খেলা ও ইচ্ছামত খেলার সময়স্বয় থাকে।	বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখনক্রম অনুসারে শিশুর শারীরিক, স্থূল ও সূক্ষ্মপেশির সঞ্চালনসহ জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন খেলা নির্ধারণ করতে হবে। খেলা নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনশীল, কল্পনার খেলা ও ইচ্ছামত খেলার সময়স্বয় থাকে।

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিক্রম/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
প্রকৃতি এবং বাহিরের এলাকা বা প্রাপ্ততের ব্যবহার	- সাময়ক থাকে। - শিক্ষক নির্দেশনা অনুসারে শিশুদের খেলায় সহায়তা করেন।	শিক্ষক তার উন্নত ধারণা অনুসারে শিশুদের খেলায় সহায়তা করেন এবং সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।	শিক্ষক তার ধারণা থেকে শিশুদের খেলায় সহায়তা দেন একই সাথে তিনি সকল শিশুকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করেন।
প্রকৃতি এবং বাহিরের এলাকা বা প্রাপ্ততের ব্যবহার	শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক কোন উপলক্ষে প্রকৃতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে প্রৈতিকক্ষেত্র চারপাশের প্রাপ্তন ব্যবহার করেন।	শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক মাঝে-মাঝে প্রকৃতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে প্রৈতিকক্ষেত্র চারপাশের প্রাপ্তন ব্যবহার করেন।	শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক যখন তখন প্রকৃতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে প্রৈতিকক্ষেত্র চারপাশের প্রাপ্তন ব্যবহার করেন।
শিখন - শেখানো উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার	শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কোন উপলক্ষে প্রৈতিকক্ষেত্র থাকা উপকরণ/সহায়তা ব্যবহার করেন।	শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মাঝে-মাঝে প্রৈতিকক্ষেত্র থাকা উপকরণ/সহায়তা ব্যবহার করেন।	শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সবসময় প্রৈতিকক্ষেত্র থাকা উপকরণ/সহায়তা ব্যবহার করেন।
সতন্ত্র (একক) শিখন এবং সহায়তা	শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুসারে বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তাগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে কোন সময় পেয়ে থাকে।	শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুসারে বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তাগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে মাঝে-মাঝে/নিয়মিত পেয়ে থাকে।	শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুসারে বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তাগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে নিয়মিত পেয়ে থাকে।
অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া	শিক্ষার্থীরা স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়।	শিক্ষার্থীরা স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ কমিউনিটির লোকজনের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়।	শিক্ষার্থীরা শিখন-শিখন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী শিক্ষক তথা কমিউনিটির লোকজনের সাথে নিয়মানুসারে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়।
শিক্ষার্থীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া	শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে মেলোমেশার নূনতম সুযোগ	শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে নিয়মিত মেলোমেশার সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষক এই ধরনের	শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে মেলোমেশার জন্য যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষক এই ধরনের

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (ন্যূনতম)	স্তর-০২ (কাজিক্রম/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
	পেয়ে থাকে। শিক্ষক এই ধরনের মিথাক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং প্রশংসা করেন।	মিথাক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং প্রশংসা করেন।	মিথাক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং প্রশংসা করেন।
স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার	- শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ন্যূনতম স্থানীয় উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকবে - শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক কোন কোন সময় স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করেন।	- নানা রকম স্থানীয় উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকবে - শিখনক্রম ও সহায়িকা অনুসারে শিক্ষণ - শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক মাঝে-মাঝে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করেন।	- যেখেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় উপকরণ শ্রেণি কক্ষে থাকবে - শিখনক্রম ও সহায়িকা অনুসারে শিক্ষণ - শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক যেকোন সময়ে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করেন।
ব্যায়াম ও বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে বিন্যস্ত উত্তোরণ	শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা ব্যায়াম/শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় শিষ্টা বিক্রাম ও উত্তোরণের সুযোগ পায়	- শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা সমভাবে ব্যায়াম/শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় শিষ্টা বিক্রাম ও উত্তোরণের সুযোগ পায় - শিক্ষার্থীরা জানে এরপর কোন কাজটি হবে	- শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে ব্যায়াম/শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় শিষ্টা বিক্রাম ও উত্তোরণের সুযোগ পায় - শিক্ষার্থীরা জানে এরপর কোন কাজটি হবে
নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং দলীয় কাজ	- শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের নেতৃত্ব দক্ষতা পরিচর্চা করার সুযোগ পায় এবং দলীয় কাজের সময় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ধারণার উন্নয়ন ঘটে। - নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব	- সকল শিক্ষার্থী নেতৃত্ব দক্ষতা পরিচর্চা করার সুযোগ পায় এবং দলীয় কাজের সময় তাদের মধ্যে ধারণার উন্নয়ন ঘটে। - শিক্ষক ন্যূনতম ধারণা থেকে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে থাকেন।	- সকল শিক্ষার্থী নেতৃত্ব দক্ষতা পরিচর্চা করার সুযোগ পায় এবং দলীয় কাজের সময় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ধারণার উন্নয়ন ঘটে। - শিক্ষক পরিষ্কার ধারণা থেকে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে থাকেন।

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের হোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কৌশল/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
	দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে থাকেন।		
শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা	শিক্ষক শুধুমাত্র রপটিনে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের আহ্বাহ ও ইচ্ছা বিবেচনায় রেখে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন।	- শিক্ষক রপটিন অনুসরণ না করে শিক্ষার্থীদের আহ্বাহ অনুসারে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন। - শিক্ষক মাঝে মাঝে তার নুনাভম ধারণা থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় হয়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন।	- শিক্ষক রপটিন অনুসরণ না করে শিক্ষার্থীদের আহ্বাহ অনুসারে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন। - শিক্ষক সব সময় তার পরিস্কার ধারণা থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় হয়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন।
	নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক কোন সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় হয়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনা করেন।		
বৈচিত্র্যতা ও একিভূততা চিহ্নিত করা	- শিক্ষক সাহায্যিকা অনুসারে ক্লাশ পরিচালনা করেন এবং শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করেন। - নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন সময় মাতৃভাষা বা স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন - সামর্থ্য, জেভার, ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুকে ভালভাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রদ্ধা করেন	- স্তর-১ এর নির্দেশ এবং - শিক্ষক নানা উপকরণ, সঠিক স্বর ব্যবহার করেন শিক্ষার্থীদের বিচিত্র চাহিদার কথা বিবেচনা করে। - নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন সময় মাতৃভাষা বা স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন। শিক্ষক শব্দ ও বাক্য শেখার ধারাবাহিক কৌশলের পরিকল্পনা করে একাজটি করেন।	- শিক্ষক সকল সময়ই শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিচিত্র চাহিদার কথা বিবেচনা করে নানা উপকরণ, সঠিক স্বর ব্যবহার করেন - নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক যথেষ্ট পরিমানে মাতৃভাষা বা স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন। শিক্ষক শব্দ ও বাক্য শেখার ধারাবাহিক কৌশলের পরিকল্পনা করে একাজটি করেন। - সামর্থ্য, জেভার, ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে শিক্ষক সকল

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান		মানদণ্ডের গ্রোড/স্তর		
	স্তর- ০১ (ন্যূনতম)	স্তর- ০২ (কাজিকত/মধ্যম)	স্তর- ০৩ (খুবই ভাল/ দৃষ্টান্তমূলক)	
			শিশুকে ভালভাবে গ্রহণ করেন এবং স্বাক্ষা করেন। শিক্ষক সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়ার জন্য এগুলো করে থাকেন	
শিশুদের অংশগ্রহণ	শিক্ষার্থীরা মোট ক্লাশের ৫০%ভাগ সময় নানা কাজে ও কথায় (প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে।	শিক্ষার্থীরা মোট ক্লাশের ৬০%ভাগের বেশি সময় নানা কাজে ও কথায় (প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে।	শিক্ষার্থীরা মোট ক্লাশের ৭০% ভাগের বেশি সময় নানা কাজে ও কথায় (প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে।	
ইতিবাচক নিয়মানুবর্তিতা	শিক্ষক শারীরিক বা মানসিক কোন শাস্তি দিয়ে বা নেতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মতাত্ত্বিকতার মধ্যে আনেন না	শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে কোন কাজে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক সহযোগিতা করে সহজে শিক্ষার্থীদের নিয়মতাত্ত্বিকতার মধ্যে নিয়ে আসেন এবং তাদের মাঝে কোন বিরোধ মিমাংসা করেন।	শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দের সাথে কোন কাজে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক ইতিবাচক নিয়মানুবর্তিতার পরিস্কার ধারণা থেকে সহজে শিক্ষার্থীদের নিয়মতাত্ত্বিকতার মধ্যে নিয়ে আসেন।	
শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন	- সতন্ত্র রেকর্ড রেখে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডোমেইন এর উপর মূল্যায়ন করে থাকেন। - শিক্ষার্থীদের মাসিক সতন্ত্র অগ্রগতি রেকর্ডের জন্য মূল্যায়ন করেন।	- সতন্ত্র পোর্টফোলিও অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডোমেইন এর উপর মূল্যায়ন করে থাকেন। - শিক্ষার্থীদের সতন্ত্র অগ্রগতি রেকর্ডের জন্য মূল্যায়ন করেন।	- বিস্তারিত সতন্ত্র পোর্টফোলিও অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডোমেইন এর উপর মূল্যায়ন করে থাকেন। - শিক্ষার্থীদের সতন্ত্র অগ্রগতি রেকর্ডের জন্য চলমান মূল্যায়ন করেন।	
কর্মী নিয়োগ (নমুনা)				
শিক্ষক	প্রতি শ্রেণিতে একজন শিক্ষক	প্রতি শ্রেণিতে একজন শিক্ষক	প্রতি শ্রেণিতে একজন শিক্ষক	

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং		মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
উপাদান	স্তর- ০১ (মূলতম)	স্তর- ০২ (কাজিক্রম/মধ্যম)	স্তর- ০৩ (খুবই ভাল/ দৃষ্টান্তমূলক)	
	শিক্ষক এসএসসি পাশ হবেন (সরকারী স্কুলের জন্য নতুন নিয়োগ আইনে স্নাতক পাশের কথা বলা হয়েছে)	শিক্ষক এইসএসসি পাশ হবেন (সরকারী স্কুলের জন্য নতুন নিয়োগ আইনে স্নাতক পাশের কথা বলা হয়েছে)	শিক্ষক শিক্ষায় ডিপ্লোমাসহ স্নাতক (সরকারী স্কুলের জন্য নতুন আইনে স্নাতক পাশের কথা বলা হয়েছে)	
মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান (Monitoring and Supervision)				
কখন / কতবার	নির্দিষ্ট এবং প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা একটি স্কুল মাসে একবার পদ্ধতিগতভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়	- নির্দিষ্ট এবং প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা একটি স্কুল মাসে একবার পদ্ধতিগতভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় - নির্দিষ্ট মনিটর কর্তৃক এক কোয়ার্টারে একবার মনিটরিং করা হয়	- নির্দিষ্ট এবং প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা একটি স্কুল মাসে একবার পদ্ধতিগতভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় - নির্দিষ্ট বা ডেডেকেটেড মনিটর কর্তৃক প্রতি দুইমাসে একবার মনিটরিং করা হয়	
প্রক্রিয়া	- বর্তমান কার্টামো অনুসারে মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধান করা হয় - মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য নীতিমালা আছে	- সরকারী বা বেসরকারী কর্মীদের দ্বারা মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধান করা হয় - মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য নীতিমালা আছে - তত্ত্বাবধায়নের ৬০% হবে পেডাগজির উপর	- সরকারী বা বেসরকারী কর্মীদের দ্বারা মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধান করা হয় - মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য নীতিমালা আছে - তত্ত্বাবধায়নের ৮০% হবে পেডাগজির উপর	
টুলস	তত্ত্বাবধায়নের জন্য টুলস ও নীতিমালা আছে	- তত্ত্বাবধায়নের জন্য টুলস ও নীতিমালা আছে - মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য গুণগত মানের অধিকাংশ বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে চেকলিস্ট ও ফরম্যাট থাকবে	স্তর -২ এর নির্দেশক এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিথাক্রিয়া এবং শিক্ষক পিতামাতার মধ্যকার মিথাক্রিয়া দেখার জন্য সহজ সরল টুলস থাকবে	
রিপোর্টিং	দ্বিমুখী রিপোর্ট: শিক্ষকের নিকট রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপকের নিকট রিপোর্ট এর ব্যবস্থা আছে	স্তর-১ এর নির্দেশ এবং কাজের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো উল্লেখ করে ব্যবস্থাপকের	স্তর-১ এর নির্দেশ এবং কাজের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো উল্লেখ করে ব্যবস্থাপকের	

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং		মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
উপাদান	স্তর- ০১ (ন্যূনতম)	স্তর- ০২ (কাজিক্ত/মধ্যম)	স্তর- ০৩ (খুবই ভাল/ দৃষ্টান্তমূলক)	
	- রিপোর্টের জন্য নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকবে - ফলো-আপের জন্য রেকর্ড রাখা হয়	নিকট রিপোর্ট করা হয়	নিকট রিপোর্ট করা হয়	
ফলো-আপ কাজ	ত্রৈমাসিক ফলো আপ ব্যবস্থা বিদ্যমান	ত্রৈমাসিক ফলো আপ ব্যবস্থা বিদ্যমান	ত্রৈমাসিক ফলো আপ ব্যবস্থা আছে	
পিতামাতা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ				
অভিভাবক সভা	মাসিক অভিভাবক সভা বছরে কমপক্ষে ৬টি হবে	মাসিক অভিভাবক সভা কমপক্ষে বছরে ৮টি হবে	প্রতি মাসে অভিভাবক সভা হবে	
প্রশিক্ষণ ও পেশাদার দক্ষতার উন্নয়ন				
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	- কমপক্ষে ৭ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রথম বছর এবং ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দ্বিতীয় বছর থেকে - কমপক্ষে একবার রিফ্রেশার্স	- কমপক্ষে ১০ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রথম বছর এবং ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দ্বিতীয় বছর থেকে - কমপক্ষে দুইদিনের দুইবার রিফ্রেশার্স	- কমপক্ষে ১২ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রথম বছর এবং ৬দিনের প্রশিক্ষণ দ্বিতীয় বছর থেকে - কমপক্ষে তিনদিনের দুইবার রিফ্রেশার্স	
ভুল্লাধায়ক-দের প্রশিক্ষণ	প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ের উপর বছরে কমপক্ষে দুইদিনের প্রশিক্ষণ	প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ের উপর বছরে কমপক্ষে তিনদিনের প্রশিক্ষণ	প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ের উপর বছরে কমপক্ষে চারদিনের প্রশিক্ষণ	
ব্যবস্থাপনা (নমুনা)				
উপকরণ বিতরণ	সকল মূল উপকরণ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলে পৌঁছাবে	সকল মূল উপকরণ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলে পৌঁছাবে	সকল মূল উপকরণসহ সহায়ক উপকরণসমূহ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলে পৌঁছাবে	
প্রশাসনিক				
হাজিরা খাতা	হাজিরা খাতা আপডেট থাকবে	হাজিরা খাতা আপডেট থাকবে	হাজিরা খাতা আপডেট থাকবে	

মানদণ্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদণ্ডের প্রোড/স্তর		
	স্তর-০১ (মূলতম)	স্তর-০২ (কাজিকত/মধ্যম)	স্তর-০৩ (খুবই ভাল/দৃষ্টান্তমূলক)
ডাটাবেজ / তথ্যভান্ডার		গূণগত ও সাংখ্যগত উভয় ধরনের তথ্য সমৃদ্ধ ওয়েব বেইজড প্রি-প্রাইমারী ডাটাবেজ উন্নয়ন এবং পাইলট টেস্টিং	গূণগত ও সাংখ্যগত উভয় ধরনের তথ্য সমৃদ্ধ ওয়েব বেইজড প্রি-প্রাইমারী ডাটা উন্নয়ন। এটা উপজেলা ভিত্তিক নিয়মিত করতে হবে।